বাদশা খান

[illegible]

অশোক প্রকাশন
এ ৬২ কলেজ স্ট্রীট্‌ মার্কেট : কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৫৯

এ ৬২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-১২ হইতে অশোক প্রকাশন-এর পক্ষে শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক প্রকাশিত ও ৯এ বলাই সিংহ লেন কলিকাতা-৭ হইতে অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কসের পক্ষে শ্রীবঙ্কিমবিহারী রায় কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

ইতিহাসের এমনই পরিহাস যে, ফখ্‌র্‌-এ-আফগান গান্ধী-এ-সরহদ্‌ খান্‌ আবতুল গফর খান্‌ আজ স্বগৃহে অতিথি। যিনি আমাদের আত্মারও আত্মীয়, তাঁকে আমরা অতিথিরূপেই বরণ করছি। স্বাধীনতা-সংগ্রামের কালে বাংলা-দেশে তিনি বহুবার এসেছেন। বাংলার দুঃখী মানুষদের সেবায় এই মহান্‌ খুদাই খিদমতগার আত্মনিয়োগ করতে যাচ্ছেন জেনে তৎকালীন বৃটিশ সরকার তাঁকে রাজদ্রোহের অজুহাতে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল। বাংলাকে লর্ড কার্জন ভাগ করে একদিন বাঙ্গালীদের শায়েস্তা করতে চেয়েছিল। দুর্মদ পাঠানদেরও তারা বিভক্ত করে রেখেছিল ঐ একই উদ্দেশ্যে। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী ও পশ্চিম পাকিস্তানের পাঠানরা পাছে হাত মিলিয়ে পাকিস্তানের স্বৈরশাসক ও শোষক শ্রেণীর উচ্ছেদ করে, আজও পাকিস্তানের এই ভয়। তাই তো পশ্চিম পাকিস্তানে এক-ইউনিটের ব্যবস্থা। তাই ঐতিহাসিক সূত্রে বাঙ্গালী ও পাঠানের হৃদয়ের যোগ রয়েছে এক অদৃশ্য স্বর্ণসূত্রে। সেজন্যে এই মানুষটির সঙ্গে নিবিড় যোগের কথা বাঙ্গালী মাত্রেরই উপলব্ধি করা উচিত।

বাদশা খানের সুবিশাল প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের সামান্য মাত্র পরিচয় দেওয়া হয়েছে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে। তাতে কতোখানি সার্থক হয়েছি পাঠকরাই বিচার করবেন। এই পুস্তক রচনার জন্যে আমি ডি. জি. টেণ্ডুলকরের Abdul Gaffar Khan, আবতুল গফর খান্‌-এর My Life and Struggle, পিয়ারেলালের Pilgrimage for Peace ও Thrown to the Wolves ও ইউনুস মহম্মদের Frontier Speaks পুস্তকের ও কিছু সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সাহায্য নিয়েছি। এইসব লেখকদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। পুস্তক ও পত্রিকাগুলি পেতে সাহায্য করেছেন বাণীস্মৃতি পাঠাগারের পরিচালক পরম প্রীতিভাজন শ্রীনবেন্দু কুমার মহাপাত্র। তাঁকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বইখানির প্রচ্ছদপট রচনা করেছেন আমার শিল্পী বন্ধু শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী এবং ক্ষিপ্র প্রকাশনার ব্যবস্থা করেছেন আশোক প্রকাশনের স্নেহাস্পদ শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক। শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ মহাশয় প্রুফগুলি দেখিয়া দিয়া মুদ্রণে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

লেখক

সূচীপত্র

১.

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও পাক্তুন জাতি

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্বতসংকুল। তাই এই অঞ্চল ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রাচীরস্বরূপ। কিন্তু, এই পর্বতমালায় খাইবার গিরিবর্ত্মের মতো কতিপয় গিরিবর্ত্ম থাকায় সেগুলি ভারতবর্ষের তোরণের কাজও করে। এই তোরণপথেই আর্য গ্রীক শক-কুষাণ-হূন, তাতার, মঙ্গোল, সকলেই ভারতে প্রবেশ করেছে এবং ভারতের একদেহে লীন হয়েছে। তাই এই সীমান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজ আমলেও এই সীমান্তের গুরুত্ব বেড়েছিল বই কমে নি। কারণ, জারশাসিত রুশ সাম্রাজ্য ক্রমেই মধ্য-এসিয়ায় প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এবং ভারতের প্রায় দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছেছিল।

এই অঞ্চল প্রাচীন ভারতের ইতিহাসেও একটি গৌরবময় স্থান অধিকার করে ছিল। এই অঞ্চলেই প্রথমে আর্যরা তাঁদের বসতিবিস্তার করেছিলেন এবং ঋগ্বেদের বহু সূক্ত রচনা করেছিলেন। এখানেই ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে ইরানীয়, গ্রীক ও চৈনিক সভ্যতার মিলন ঘটেছিল। কুষাণযুগে এই অঞ্চলই ভারতেতিহাসে সর্বাধিক গৌরবময় স্থান অধিকার করেছিল। এই অঞ্চলই ইতিহাসে গন্ধার নামে পরিচিত ছিল। এই অঞ্চলের আধুনিক পেশোয়ারই ছিল কুষাণরাজ কনিষ্কের রাজধানী পুরুষপুর। এখানেই একদা তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল এবং এসিয়ার বিদ্যাতীর্থে পরিণত হয়েছিল। এই অঞ্চল থেকেই শত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু দেশে দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বহির্গত হয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আজও এখানে ছড়িয়ে রয়েছে। তাই এই অঞ্চল যেমন একদা ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল, তেমনি এখানকার অধিবাসীরাও ছিলো প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। পরবর্তীকালে এখানে ইসলামধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। তাই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, পাখ্‌তুনরা ভারতের সুপ্রাচীন অধিবাসী; এঁরা পরবর্তী কালের আরব, তাতার বা মুঘল জাতীয়

মুসলমানদের মতো বহিরাগত নন। ঋগ্বেদে যে 'পক্ত' জাতির উল্লেখ আছে, তাঁরা এই পাখতুন জাতিরই পূর্বপুরুষ। পাখতুন জাতি যে দুটি ভাষায় কথা বলেন—উত্তর-পূর্বাঞ্চলে 'পাখতু' ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে 'পাশ্‌তু', তাও আর্য-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এঁদের দীর্ঘদেহ, আয়তচক্ষু ও উন্নত-নাসা, সকলই খাঁটি আর্যত্বেরই সাক্ষ্য দেয়। তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন খান্ আবদুল গফর খান্ স্বয়ং।

খান্ আবদুল গফর খান্ তাঁর আত্মজীবনীতে এই সুপ্রাচীন জাতির সুসমৃদ্ধ ঐতিহ্য সম্পর্কে বলেছেন :

> আমাদের দেশ বহু সংস্কৃতিকে আসতে যেতে দেখেছে। এমন এক সময় ছিল যখন এই দেশ ছিল আর্য সভ্যতার শৈশবের লীলাভূমি। তারপর বুদ্ধ এলেন, তাঁর বাণী প্রচার করলেন। যখন বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করছিল, তখন আমাদের দেশ যে অত্যন্ত অগ্রগতি লাভ করেছিল তার প্রমাণ ঐ যুগের ধ্বংসাবশেষগুলিতে দেখা যায়। এমন কি আজও গৌতম বুদ্ধের দুটি অপূর্ব মূর্তি রয়েছে বামিয়েনে। সম্ভবতঃ এ দুটি মূর্তি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বুদ্ধমূর্তি। পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত এবং পর্বতদেহ থেকে ক্ষোদিত এই মূর্তি দুটি ভাস্কর্যশিল্পের ত্রুটিহীন পূর্ণ পরিণতির সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই বিরাট মূর্তিগুলির চারিদিকে গিরিগাত্রে রয়েছে গিরিগুহাসমূহ, যেগুলিতে বৌদ্ধ পুরোহিত, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ গুরু ও তাঁদের শিষ্যরা বাস করতেন।
>
> জালালাবাদের কাছে আডাতে একটি বিশাল বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ও ছিল, তার ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়। তক্ষশিলায় আরও একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। অট্টালিকাসমূহে এবং কাষ্ঠে ও প্রস্তরে ক্ষোদিত মূর্তিসমূহের ধ্বংসাবশেষ তৎকালীন পাঠানদের অত্যুন্নত সংস্কৃতিরই সাক্ষ্য দেয়।…
>
> মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ আমাদের গ্রামের কাছে খননকার্য শুরু করেছিল। তারা একটি বিরাট শহর খুঁড়ে বার করেছে। বলা হচ্ছে, এই শহরটি ছিল গান্ধার শাহী পরিবারের কর্মকেন্দ্র। এবং আমরা যদি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আরও একটু গভীরে খনন করি, তবে দেখব, পাঠানদের এই দেশ—যা তখন আফগানিস্তান বা পাখতুনিস্তান বলে পরিচিত ছিল—ছিল মানবজাতির

অন্যতম বৃহত্তম একটি পরিবারের শৈশবের লীলাভূমি। ঐতিহাসিকরা প্রমাণ পেয়েছেন যে, এই দেশেই আমু নদীর তীরে আর্যরা প্রথম দিবালোক দেখেছিল এবং এই দেশের মাটিতেই তাদের সমুন্নত সংস্কৃতি প্রথম বিকাশলাভ করেছিল।

পরবর্তীকালে যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলো, তখন নূতন নূতন চারণভূমির প্রয়োজন দেখা দিল এবং লোকে ক্রমশঃ অন্যান্য দেশে গিয়ে বসবাস করলো। একদিকে তাদের এই নূতন বাসস্থানের সন্ধান তাদের নিয়ে গেল ইরানের মধ্য দিয়ে ইউরোপে এবং অন্যদিকে হিন্দুস্থানে। এইভাবে তারা বিভিন্ন জাতিতে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গেল। বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে আর্যদের মূল জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তিত হলো এবং নূতন সংস্কৃতি ও নূতন ভাষার উদ্ভব ঘটলো। কিন্তু আর্যজাতি যখন তাদের আদিভূমি 'আর্যনবিজো'তে—যা এখন আফগানিস্তান ও পাখ্‌তুনিস্তান—ছিল, তখন তাদের ভাষা ছিল এক, যে ভাষাকে এখন একটা কাল্পনিক নাম দেওয়া হয়েছে 'আর্যভাষা'। পাখ্‌তু এই আর্য-ভাষার সঙ্গে অতীব ঘনিষ্ঠ।

পাঠানরা এই অত্যুচ্চ ও দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে বাস করতো, তাই তারা বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছিল এবং এই দেশের নাম হয়েছিল 'আর্যনবিজো'।

এখানেই, এই আর্যনবিজোতেই, ইতিহাসের প্রথম পয়গম্বর জরথুস্ত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যতোদূর জানা যায়, তিনি বল্‌খের অধিবাসী ছিলেন এবং পরে ইরানে গিয়েছিলেন।······

এখানেই হিন্দুদের পবিত্র স্তোত্র বেদের গানগুলিও রচিত হয়েছিল।

এই দেশের আর এক মহান্ সন্তান পাণিনি—যিনি সংস্কৃতের ব্যাকরণ লিখেছিলেন এবং এই প্রাচীন ভাষাকে বিশ্বে পরিচিত করিয়েছিলেন। সিন্ধুনদের তীরে এখন যা সোয়াবি তহসিল, পাণিনি ছিলেন তারই অধিবাসী। ভাবতে ভারী কৌতুক লাগে যে একটি নদীর নাম: সিন্ধু; একটি দেশের নাম: সিন্ধ্; একটি জাতির নাম: হিন্দু; সবই এসেছে একটি পাখতু শব্দ সিন্ধ্ থেকে, যে শব্দের অর্থ নদী।

জাতির এই বিশাল পরিবারের অনেকেই দেশত্যাগ করবার পর মাত্র দুটি শাখা অবশিষ্ট রইলো—পাখতুন ও বালুচ। তাদের

হাতেই ঈশ্বর এই দেশের নিরাপত্তা ও অগ্রগতি রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

পরবর্তীকালে এই দেশে এলো ইসলাম। ইসলামের পয়গম্বর আরবদের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক আলো, যে দৈব উদ্দীপনা, যে ধর্মপ্রাণতা ঢেলে দিয়েছিলেন, আবুবক্‌র ও ওমরের মতো মহামানবরা যা প্রচার করেছিলেন, তখন আরবরা তা হারিয়ে ফেলেছিল। আরবরা তাদের সাম্রাজ্যকে সম্প্রসারিত করবার নেশায় পাগল হয়ে উঠেছিল, অন্ধ হয়ে গিয়েছিল অন্যান্য দেশ জয় করবার বাসনায়। তার ফল হয়েছিল এই যে, তারা আমাদের সেই মহান্‌ সংস্কৃতিকে কেড়ে নিয়েছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে ইসলামের সেই অধ্যাত্ম চেতনা আমাদের দেয়নি।···

ইসলামিক যুগেও পাখতুনরা সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে না হলেও ঐহিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠতা অর্জন করেছিল। ভারতে পাঠানরা, বিশেষতঃ পাঠান-বীর শের শাহ্‌ এক সুবিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। আলাউদ্দিন খলজিও পাঠান বলেই পরিচিত ছিলেন। লোদীবংশীয় সুলতানরাও ছিলেন পাঠান। অবশ্য তাঁদের সাম্রাজ্য খোদ পাখতুনিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না। খোদ পাখতুনিস্তানে আমেদ শাহ্‌ আবদালী এক সুবিশাল সম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তিনি সমগ্র পারস্য অধিকার করেছিলেন। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠা শক্তি তাঁর হাতে পর্যুদস্ত হয়েছিল। সমগ্র পাঞ্জাব গিয়েছিল পাখতুনদের হাতে। কিন্তু আমেদ শাহ্‌ আবদালীর বংশধররা ছিলেন দুর্বল। তাঁদের দুর্বলতার সুযোগে পাঞ্জাবকেশরী গড়ে তুলেছেলেন একটি শিখ সাম্রাজ্য। পাখতুনিস্তানের অনেকখানিই রণজিৎ সিংহের অধিকারভুক্ত হয়েছিল। খোদ আফগানিস্তানেও চলছিল অবিরাম অন্তর্দ্বন্দ্ব। এইভাবে পাখতুনরা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর অনতিকাল পরে শিখ সাম্রাজ্যের পতন ঘটলো এবং শিখ-বিজিত পাখতুন অঞ্চল গেল ইংরেজদের হাতে। আফগানিস্তানেও ইংরেজরা তাদের প্রাধান্য বিস্তার করলো। আফগানিস্তান তার সার্বভৌমত্ব হারালো। এইভাবে পাখতুনরা ক্রমেই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়লো।

ইংরেজদের রুশ-ভীতি এই অঞ্চলের উপর তাদের আধিপত্যবিস্তারে ক্রমাগত প্ররোচিত করলো। পরে আফগানিস্তানের আমীর আমানুল্লার সময়ে ইংরেজরা আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিলেও তারা

আফগানিস্তানের উপর 'ডুরাণ্ড লাইন' নামে একটি সীমারেখা চাপিয়ে দিলো। এই সীমারেখা পাখতুনদের দ্বিধাবিভক্ত করলো। একাংশ রইলো আফগানিস্তানে, অপরাংশ রইলো আফগানিস্তানের বাইরে ডুরাণ্ড লাইনের এপারে। ডুরাণ্ড লাইনের এপারে যে পাখতুনরা রইলো, তাদেরও ইংরেজরা তিনভাগে বিভক্ত করে দিলো। এই তিন অংশ হলো—(১) চীফ্ কমিশনার-শাসিত অঞ্চল (২) এজেন্ট-শাসিত পাখতুন অঞ্চল বা এজেন্সি এবং (৩) স্বাধীন পাখতুন উপজাতীয় অঞ্চল। এইভাবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের দুটি সীমা দেখা দিলো—একটি আন্তর্জাতিক সীমা বা ডুরাণ্ড লাইন যা মানচিত্রে বৃটিশ ভারত ও আফগানিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করেছে, অন্যটি প্রশাসনিক সীমা। এই প্রশাসনিক সীমার বাইরে যেসব পাখতুন উপজাতি রইলো, তারা না ঘরকা না ঘাটকা; তারা প্রকৃতপক্ষে আফগানিস্তানেরও নয়, বৃটিশ ভারতেরও নয়। এই অঞ্চলে ইংরেজরা তাদের সামরিক পথঘাট নির্মাণ করলেও বা ঘাঁটি গড়ে তুললেও মনেপ্রাণে এদের আনুগত্য আফগানিস্তানের প্রতিই। এরা বৃটিশের বিরোধিতা না করলে এরা স্বাধীন, কিন্তু বৃটিশের সামান্য বিরোধিতা করলেই এখানে ইংরেজদের বোমা ফেলবার ও গোলাগুলি ছোঁড়ায় হাত পাকাবার অধিকার আছে।

এইভাবে মানচিত্রে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ নামে যে স্থানটি ছিল, তার আয়তন ছিল ৩৮০০০ বর্গমাইল। তা উত্তরে হিন্দুকুশ পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে বালুচিস্তান এবং পূর্বে কাশ্মীর ও পাঞ্জাব থেকে পশ্চিমে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখানে অধিবাসীর সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশ লাখ। ইংরেজ আমলে এখানে শতকরা পাঁচ ভাগ অমুসলমান ছিল; ভারতবিভাগের পর অমুসলমান বলে কিছু নেই।

ভৌগোলিক দিক থেকে সীমান্ত প্রদেশকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) সিন্ধুনদের পূর্বপারে অবস্থিত হাজারা জেলা, (২) সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর থেকে পার্বত্য-অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল—পেশোয়ার, কোহাট, বান্নু, মর্দান ও ডেরা ইসমাইল খাঁ জেলা। এই ছটি জেলা settled district নামে পরিচিত। অর্থাৎ এই ছটি জেলায় ইংরেজের শাসনব্যবস্থা পাকাপাকি ভাবে আছে। এগুলি একজন চীফ কমিশনারের অধীন ছিল। (৩) এই ছটি জেলার পশ্চিমে অবস্থিত পার্বত্য অঞ্চল যা আফগানিস্তানের সীমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পার্বত্য অঞ্চল পাঁচটি Political Agency-তে বিভক্ত।

Political Agency-গুলির নাম মালাকন্দ, কুর্‌রাম, খাইবার, উত্তর ওয়াজিরিস্তান ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান। এই এজেন্সিগুলি এক একজন পলিটিক্যাল এজেণ্টের অধীন ছিল। এই এজেন্সিগুলি হয় ছিল উপজাতীয় অঞ্চলে (Tribal Belt), না হয় ছিল স্বাধীন অঞ্চলে (Independent Territory)। পলিটিক্যাল এজেণ্টরা সরাসরি দিল্লীর অধীন ছিলেন। এই এজেণ্ট-শাসিত অঞ্চল সমগ্র সীমান্ত-প্রদেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ।

সিন্ধুনদের এপারের হাজারা জেলা ভিন্ন অন্যান্য সব জেলা ও এজেন্সির অধিবাসীরা প্রায় সবাই পাঠান বা পাখতুন। পাখতুনরা বহু উপজাতিতে বিভক্ত। উপজাতীয় অঞ্চলে প্রধানতঃ আফ্রিদি, মোহ্‌মন্দ, ওয়াজিরি ও মাশুদ উপজাতি-গুলির বাস। এ ছাড়াও অন্যান্য বহু উপজাতি আছে পাখতুনদের—ওরাকজাই, ইয়ুসুফজাই, মহম্মদজাই, ভিটান্নিস, শিনোয়ারি প্রভৃতি। হাজারা জেলায় পাঞ্জাবী মুসলমান, গোখর প্রভৃতি অপাখতুনদের সংখ্যাই বেশি। রাজনৈতিক আন্দোলনের সময়ে তাই হাজারা জেলায় ইংরেজ ও তাদের দোস্ত মুসলিম লীগের প্রাধান্যই ছিল বেশি। উপজাতিগুলি আবার বহু 'খেল্‌'-এ বিভক্ত। 'খেল্‌'-গুলি কতকটা গোষ্ঠীর (clan) মতো। গোষ্ঠীগুলি কতকগুলি ছোট বড় পরিবার নিয়ে গঠিত। পাখতুন উপজাতিগুলির সমাজ-শাসন গণতান্ত্রিক ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়। তবে কোনও কোনও পরিবার গণমুখের মতো মর্যাদা ভোগ করেন। ওঁরা মালিক, খান্‌ প্রভৃতি নামে পরিচিত।

পাখতুনরা বহু উপজাতিতে বিভক্ত হ'লেও তারা প্রায় সকলেই সুন্নী-সম্প্রদায়ের মুসলমান। কোরান ও হাদিস মেনে চললেও তারা চিরাচরিত প্রথা বা ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলে। ঐসব চিরাচরিত প্রথা ও ঐতিহ্য 'পাখতুনওয়ালি' নামে পরিচিত। পাখতুনরা এই পাখতুনওয়ালি বা সামাজিক আইনকানুন কিভাবে মেনে চলেন, তা বোঝা যায় একটি ব্যাপার দেখে। উপজাতীয় বা স্বাধীন অঞ্চলে আইন-আদালত ও পুলিস না থাকলেও সেখানে ব্যভিচারের ঘটনা শোনাই যায় না। খুন যা ঘটে, তা প্রায়ই সামাজিক আইনকানুন অনুসারেই। এখানে নারীহরণের ঘটনাও বিরল। নারীহরণ করলে তার দণ্ড সুকঠোর। তবে অপহৃতা নারীকে বিবাহ করলে কঠোরতা হ্রাস পায়, তখন অপহরণকারী যে পরিবারের নারীহরণ করেছে, সেই পরিবারে নিজের পরিবারে দুই-তিনটি মেয়ের বিবাহ দিতে বাধ্য থাকে। অপহরণকারী যদি অপহৃতা নারীকে বঞ্চনা বা ত্যাগ করে, তবে অপহরণ-

কারীর মৃত্যু অনিবার্য। সেক্ষেত্রে অপহৃতা নারীর উপজাতি অপহারককে মৃত্যুদণ্ড দানের জন্যে খুঁজে বেড়াবে এবং অপহারকের নিজের উপজাতি এই দুষ্কৃতকারীকে আশ্রয় দেবে না। সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনকারীকে আশ্রয় বা প্রশ্রয় না দেওয়াই উপজাতীয় সামাজের একটি অলঙ্ঘ্য নিয়ম। সামাজিক নিয়মভঙ্গকারী সমাজে সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য, এমন কি তার মৃত্যুর পরেও তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তার বন্ধুরা কেউ আসবে না। পাখতুনওয়ালির প্রধান নীতি হ'লো প্রতিশোধ বা বদলা। এই বদলা নেওয়ার দায়িত্ব কেবল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা পরিবারের নয়, সমগ্র উপজাতির। এই প্রতিশোধ বা বদলার নীতি পাখতুন-জাতির ঐক্যের পক্ষে ছিল প্রধান অন্তরায়। কোনও অপমান বা অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, পরিবারে পরিবারে, খেলে খেলে বিবাদ অনেকক্ষেত্রে পুরুষানুক্রমিক হয়ে দাঁড়ায়। এই বিবাদের অবসান হয় অনেক সময় যখন বিবদমান পরিবারের একটি বা দুইটিই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বল পক্ষ যদি মার্জনা ভিক্ষা করে, তাতেও বিবাদের অবসান ঘটে। সে ক্ষেত্রে ক্ষমাপ্রার্থীর পরিবারের স্ত্রীলোকেরা কোরান মাথায় নিয়ে প্রবল বিপক্ষের কাছে উপস্থিত হয়, এবং ক্ষমাপ্রার্থী কয়েকটি ভেড়া উপঢৌকন দিয়ে মার্জনা লাভ করে। অজ্ঞতা ও অশিক্ষা এই ব্যবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করেছিল। ইংরেজ সরকারও এই অবস্থাকে জিইয়ে রাখবার জন্যে পাখতুনদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের সামান্যতম প্রচেষ্টা থেকে বিরত ছিল। খান্ আবদুল গফর খান্ই সর্বপ্রথম বুঝেছিলেন যে, এই হিংসা ও প্রতিহিংসা-নীতিই পাখতুনজাতিকে অবলুপ্তির পথে নিয়ে চলেছে। তাই শিক্ষার ও অহিংসা-নীতির বিস্তারকেই তিনি পাখতুনজাতির পুনরুজ্জীবনের প্রধান হাতিয়ার রূপে গ্রহণ করেছিলেন।

পাখতুনজাতির আর এক বৈশিষ্ট্য তার অতিথিপরায়ণতা। পাখতুন-ওয়ালির দ্বিতীয় অনুশাসন আতিথ্য। এই অনুশাসন অনুসারে কোনও পাখতুন, তিনি যতোই ধনী ও প্রতাপশালী হন না কেন, তাঁকে তাঁর দরিদ্রতম অতিথির সঙ্গে বসতে ও তাঁকে স্বহস্তে খাদ্য পরিবেশন করতে হয়। পাখতুনদের এই আতিথেয়তার হাতিয়ার হ'লো 'হুজরা' বা অতিথিভবন। হুজরাগুলিতে একখানি বা দুখানি কামরা থাকে। অতিথিরা এলে এই হুজরাতে তাঁদের বাসস্থান ও খাদ্য দেওয়া হয়। প্রত্যেক গ্রামেই এক বা একাধিক হুজরা থাকে। মালিক ও খান্দের অধিকাংশেরই নিজ নিজ হুজরা থাকে। হুজরাগুলি কেবল

আতিথেয়তার জন্যেই ব্যবহৃত হয় না, এগুলিতে গ্রামের লোকে সমবেত হয়ে চা-পান ও ধূম-পানও করেন। গ্রামের অবিবাহিত যুবকরাও এসে হুজরাতে রাত্রিযাপন করে। কারণ অবিবাহিত পাঠান তরুণদের নিজ নিজ গৃহে রাত্রি-যাপন পাখতুনওয়ালিতে নিষিদ্ধ। পাঠানরা এই আতিথেয়তার নিয়ম অত্যন্ত কঠোরভাবে মেনে চলেন। কোন শত্রুও যদি এসে আশ্রয় নেয়, তাকেও পাঠানরা আশ্রয় দেন এবং তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন।

পাখতুনদের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তাদের 'জির্গা' বা বয়োবৃদ্ধদের নিয়ে গঠিত পঞ্চায়েত। যে উপজাতিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যতো ব্যাপক, সেখানে জির্গার প্রাধান্যও ততো বেশি। জির্গাগুলিতে ভোটাভুটির ব্যবস্থা থাকে না। কোনও সিদ্ধান্ত সভার সাধারণ অভিমত অনুসারেই গৃহীত হয়। জির্গাগুলির কাজ মূলতঃ ছিল অপরাধনির্ণয় ও দণ্ডদান নয়, পাখতুন ঐতিহ্য ও প্রথা অনুযায়ী একটি আপোস-মীমাংসায় পৌছা। পরে ইংরেজরা তাঁবেদের ব্যক্তিদের নিয়ে জির্গাগুলিকে পুনর্গঠিত করে এবং তাদের সুবিধামতো দণ্ডদানের ও অত্যাচারের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের অধিকাংশ স্থানই অনাবাদী। এই অঞ্চল ধাতব সম্পদে সমৃদ্ধ। তবে এই অঞ্চলকে অর্থনৈতিক দিক্ থেকে অনগ্রসর ও অনুন্নত রাখবার ইচ্ছাতেই ইংরেজরা এইসব ধাতব সম্পদ ব্যবহারের কোনও ব্যবস্থা করেনি। এই অঞ্চল জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিক্ থেকেও খুবই উপযোগী। এই অঞ্চলে বছরে দু'বার বৃষ্টি হয়। তাই চাষ-আবাদের সুযোগও যথেষ্ট। এখানে বাজরা, যব, গম, ধান, ছোলা, আখ, তুলা ও তামাক যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পেশোয়ার উপত্যকা চাষ-আবাদের দিক থেকে সর্বাধিক উন্নত। এখানে লোকে ভেড়া ও ছাগল পোষে প্রচুর পরিমাণে। এখানকার ভূমি-ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক হওয়ায় কৃষকরা অত্যন্ত গরীব। গ্রামবাসীদের অধিকাংশই খান্‌দের কাছে বা গ্রামের সশস্ত্র বাহিনীতে কাজ করে। গ্রামবাসীরা সাধারণতঃ এককামরার কুটিরেই থাকে। তবে উপজাতীয় গ্রামগুলি সুরক্ষিত। অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ঐসব প্রাচীরের গায়ে বন্দুক থেকে গুলী চালাবার জন্যে ছোট ছোট ফুটো থাকে। পাখতুনরা প্রায়ই আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকে। বন্দুক ও ছোরা তাদের নিত্যসঙ্গী। তারা দুঃখদৈন্যের মধ্যেও হাসে নাচে গায়; জীবন-মৃত্যু তাদের পায়ের ভৃত্য; যে কোনও বিপদকে তারা হেলায় বরণ করে।

খাদ্যবস্ত্রের দিক্ থেকেও পাঠানরা সরল ও অনাড়ম্বর। তারা সাধারণতঃ চাল ডাল ও শাক-সবজি দিয়ে তৈরী খিচুড়ি ও হাতে বানানো রুটি বা 'নান' খায়। মাংসও তাদের প্রিয়। মদ খাওয়া ও আফিম খাওয়াকে তারা ঘৃণার চক্ষে দেখে। তবে চা ও তামাক তাদের নিত্যসঙ্গী। পুরুষরা ঝোলা পায়জামা, লম্বা কামিজ পরে, কোমরে চাদর জড়ায়, রোদের সময় চাদরে মাথা ঢাকে। মেয়েরাও ভেতরে পায়জামা ও উপরে বডিস জাতীয় লম্বা জামা পরে, শাল গায়ে দেয়। স্ত্রীপুরুষ সকলেই চামড়ার বা ঘাসের তৈরী চপ্পল পরে। মেয়েরা চুলে সুন্দর বেণী করে। দক্ষিণ-অঞ্চলের পুরুষরা মাথায় বড় বড় বাবরী চুল রাখে; তারা চোখে সুর্মা লাগায় এবং আগরোট গাছের ছালের রস দিয়ে ঠোঁট রাঙায়।

পাঠানদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য তাদের স্বাধীনতাপ্রিয়তা। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শিখ সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে ইংরেজরা এই অঞ্চলে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আফগান যুদ্ধের পর ইংরেজরা সুলেমান পর্বতমালার উপর দিয়ে আফগানিস্তান ও বৃটিশ ভারতের সীমারেখা রূপে 'ডুরাণ্ড লাইন' সৃষ্টি করে। বহু চেষ্টায় তারা সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরবর্তী পাঁচটি জেলায় তাদের শাসনব্যবস্থা চালু করতে সমর্থ হলেও তার পশ্চিমে অবস্থিত উপজাতীয় অঞ্চলে তারা নামমাত্র আধিপত্য বিস্তার করে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে থেকে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজরা চল্লিশবারেরও বেশি এই অঞ্চলে অভিযান চালায়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তারা আফ্রিদি ও ওয়াকজাই উপজাতিগুলির বিরুদ্ধে চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়োগ করে। আফগান ও রুশ-ভীতি ইংরেজদের মনে অত্যন্ত প্রবল থাকায় তারা এই অঞ্চলে—ভারতের তোরণ-পথে—নিজ আধিপত্য বিস্তারের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ইংরেজরা গোড়ার দিকে কেবল পেশোয়ার ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও শহর-গুলিতে প্রাধান্য বিস্তার করে। তখনও খাইবার সহ অন্যান্য গিরিপথগুলি আফগান উপজাতিগুলির হাতে থাকে এবং ঐসব উপজাতি আফগানিস্তানের আমীরের প্রতিই অনুগত থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জার-শাসিত রাশিয়া মধ্য-এশিয়ায়ও অগ্রসর হতে থাকে, বোখারা, সমরখন্দ, খিবা প্রভৃতি স্থান তাদের করতলগত হয়। ফলে ইংরেজদের রুশভীতি প্রবলতর হয়ে ওঠে। তারা আফগানিস্তানের উপর যেমন তাদের আধিপত্য-বিস্তারে সচেষ্ট হয়, তেমনি উপজাতীয় অঞ্চলে নূতন নূতন দুর্গ ও সামরিক

পথঘাট নির্মাণ করে, সেনানিবাস স্থাপন করে। তথাপি পাঠান উপজাতিগুলিকে বশীভূত করা সম্ভব হয় না। উপজাতিগুলি প্রায়ই এখানে-ওখানে ইংরেজদের বিরোধিতা করতে থাকে, তারা বহু ইংরেজকে হত্যা করে। ইংরেজরাও নৃশংসভাবে প্রতিশোধ নেয়, তারা নির্বিচারে উপজাতীয়দের বহু লোককে হত্যা করে, আন্দামানে নির্বাসিত করে, শস্যক্ষেত্রগুলি পুড়িয়ে দেয়, কূপ নষ্ট করে, ফলকর বৃক্ষগুলি কেটে ফেলে, অবরোধ সৃষ্টি করে, নরনারী ও শিশুদের অনাহারে রেখে মারে। তবু আফগানিস্তান-সংলগ্ন উপজাতীয় অঞ্চলকে তারা সম্পূর্ণ বশে আনতে পারে না। শেষ পর্যন্ত বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০১ সালে চীফ কমিশনারের অধীনে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ নামে একটি নূতন প্রদেশ সৃষ্টি করেন। এতে সিন্ধুতীরবর্তী শাসনব্যবস্থাযুক্ত জেলাগুলি (settled area) থাকে এবং এই প্রদেশ ও আফগানিস্তানের মধ্যে থাকে উপজাতীয় অঞ্চল। এই নবগঠিত প্রদেশ পূর্বে পাঞ্জাবের শাসনাধীন ছিল। এই নূতন প্রদেশের জন্যে কঠোর শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। বছরে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে ছ হাজার পুলিস মোতায়েন রাখা হয় এখানে। এই প্রদেশে বিশেষ আইনকানুনও চালু করা হয়। এগুলির মধ্যে সর্বাধিক কুখ্যাত হলো সীমান্ত অপরাধ আইন (Fontier Crimes Regulation)। এই আইন অনুসারে বিনা বিচারেই কোন ব্যক্তিকে নির্বাসনদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া চলতো। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আইনসম্মত উপায়ে আত্মসমর্থনের কোনও উপায় ছিল না। খুন প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের বিচার হ'তো ইংরেজের তাঁবেদার জমিদার ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে গঠিত বিশেষ আদালতে বা জির্গায়। এই আদালত ইংরেজদের অনুকূলেই রায় দিতো। এই রায়ের বিরুদ্ধে কোনও আপীল চলতো না। চীফ কমিশনার ইচ্ছা করলে দণ্ডের রদবদল করতে পারতেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন মর্লে-মিণ্টো শাসন-সংস্কার বা ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন মণ্ট-ফোর্ড শাসন-সংস্কার সারা বৃটিশ ভারতে প্রবর্তিত হলো, তখনও কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ তার আওতা থেকে বাইরে রইলো। সীমান্ত-প্রদেশের কেউ কোনও প্রকার সংস্কার দাবি করলে সীমান্ত অপরাধ আইনে তার দণ্ড ছিল অনিবার্য। তাই ভারতীয় রাজনৈতিক প্রবাহ থেকে সীমান্ত প্রদেশ ছিল বিচ্ছিন্ন। এই অঞ্চল সর্বশেষে বৃটিশ ভারতের অঙ্গীভূত হয়েছিল, তাই অন্যান্য দিক্ থেকে বৃটিশ ভারতের চেয়ে ছিল স্বতন্ত্র। বৃটিশ ভারতের অন্যান্য অংশের চেয়ে সে অনেক পরে স্বাধীনতা হারিয়েছিল, তাই

স্বাধীনতার স্বাদ সে ভোলেনি। যেদিন সর্বভারতীয় রাজনীতিতে স্বাধীনতার প্রথম ডাক এলো, সেদিন সহজেই সে ডাকে সে সাড়া দিলো। সীমান্ত-প্রদেশের অগণিত মানুষকে সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে যিনি সামিল করলেন, তিনি আমাদের এই কাহিনীর নায়ক খান্ আবদুল গফর খান্। তিনি 'বাদশা খান্,' 'ফখর-এ-আফগান,' 'ফখর-এ-পাঠান' এবং 'গান্ধী-এ-সরহদ' বা সীমান্ত-গান্ধী নামেও পরিচিত।

২.

জন্ম : শৈশব : পঠদ্দশা

পেশোয়ার জেলার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে সোয়াত নদী, ঋগ্বেদে আর্যরা যাকে বলছেন সুবাস্তু। যে সপ্তসিন্ধুর তীরে ভারতীয় আর্য সভ্যতা প্রথম বিকাশ লাভ করেছিল, এই সোয়াত বা সুবাস্তু তাদের একটি বলেই অনেক পণ্ডিতের মত। সোয়াত নদীর তীরবর্তী অঞ্চল যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার একটি কেন্দ্র ছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। হিউয়েন সাং যখন ভারতে এসেছিলেন, তখন এই সোয়াত নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অসংখ্য বৌদ্ধ কীর্তি দেখেছিলেন। তার বহু ধ্বংসাবশেষ সাম্প্রতিক কালেও প্রত্নতাত্ত্বিকরা উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

এই সোয়াত নদীর তীরে হস্তনগর বা হস্তনঘর। হস্তনঘর পেশোয়ার জেলার চরসদ্দা তহসিলে অবস্থিত। চরসদ্দায় দুটি বিরাট স্তূপ রয়েছে, যার বৃহত্তরটি ছিল প্রাচীন গন্ধার রাজ্যের রাজধানী। এই হস্তনঘরে উটমনজ়াই গ্রামে মহম্মদজ়াই পাঠানদের বাস। বেহ্‌রাম খান্ এখানে একজন ধনী জমিদার বা খান্। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বেহ্‌রাম খানের গৃহে তাঁর চতুর্থ সন্তান ও কনিষ্ঠ পুত্র খান্ আবদুল গফর খান্ জন্মগ্রহণ করেন। আবদুল গফরের জন্মের নির্দিষ্ট তারিখ জানা যায় না। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন :

> তখনকার দিনে আমাদের পরিবারে ছেলেমেয়েদের জন্মের সাল তারিখ রাখার প্রথা ছিল না। তাছাড়া, খুব অল্প লোকই লিখতে

দেওয়া হতো না। ইংরেজরা লোকদেখানো শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টায় দু-চারটি বিদ্যালয় স্থাপন করলেও গোপনে তারা পাঠানরা যাতে শিক্ষালাভ না করে সেজন্যে সচেষ্ট ছিল। তারা মোল্লাদের বোঝাতো, পাঠানরা যদি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে, তবে মোল্লাদের রুজি-রোজগার যাবে। তাই মোল্লারা শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রবল প্রচারকার্য চালাতো। তারা বলতো, এইসব স্কুলে যারা ছেলেমেয়েদের পাঠায়, তারা কেবল টাকা রোজগারের লোভেই পাঠায়। এইসব স্কুলের ছেলেমেয়েদের বেহস্তে ঠাঁই হবে না, অনন্তকালের জন্যে তাদের জাহান্নমে যেতে হবে। লোকে মোল্লাদের শ্রদ্ধা সমীহ করতো, তাই তাদের পরামর্শমতো ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতো না। মোল্লারা বলতো, এই শিক্ষা বিধর্মীর শিক্ষা ; পাঠনরা ছেলেমেয়েদের যদি লেখাপড়া শেখাতেই চায়, তবে তারা তাদের মসজিদের মক্তবে পাঠাতে পারে।

মসজিদে মোল্লারা যে লেখাপড়া শেখাতো, তা ছিল নামমাত্র। ইমাম হওয়ার জন্যে ছেলেরা এই শিক্ষা নিতো। যারা তাদের ছেলেদের ইমাম বা পুরোহিতে-বৃত্তির জন্যে প্রস্তুত করতে চাইতো না, তারা ছেলেদের মসজিদের পাঠশালায় পাঠাতো না। তাই পাঠান জনসাধারণের এই শিক্ষার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল না। আবদুল গফর এই অনাগ্রহের কারণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন :

> সাধারণ মানুষ এই ধরনের শিক্ষায় আগ্রহী ছিল না। কারণ ইসলামধর্ম আসবার আগে আমরা হিন্দু ছিলাম এবং "শিক্ষা কেবল ব্রাহ্মণদের জন্যে" এইরকম ভ্রান্ত ধারণা আমাদের মধ্যে চালু ছিল। ফল হয়েছিল এই যে, আমরা এইভাবে নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিলাম, এবং হিন্দুসমাজের জাতিভেদের মতো একটি প্রথা আমাদের মধ্যেও গড়ে উঠেছিল।

বেহ্‌রাম খান্ নিজে বিদ্যালয়ী শিক্ষা লাভ না করলেও ছিলেন জ্ঞানপিপাসু ও বিদ্যোৎসাহী। তাই তিনি তাঁর ছেলেদের শিক্ষা সম্পর্কে খুবই উৎসাহী ছিলেন। যখন আবদুল গফরের বয়স মাত্র পাঁচ বছর, তখন তাঁকে তিনি মসজিদের পাঠশালায় ভর্তি করে দিলেন। যেদিন আবদুল গফরকে মসজিদে মোল্লার কাছে পড়তে পাঠানো হ'লো, সেদিন তাঁর বাবা-মা উৎসব করলেন এবং খাদ্য ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করলেন। কিন্তু মসজিদের মোল্লাসাহেবের নিজের বিদ্যার দৌড় বেশি ছিল না। তিনি লিখতেও পারতেন

না। তিনি কোরান পড়তে পারতেন বটে, তার অর্থ কিছুই বুঝতেন না। তাই তিনি আবদুল গফরের অক্ষর-পরিচয় না করিয়েই তাঁকে কোরান মুখস্থ করাতে লাগলেন। এ ব্যাপারে মোল্লাসাহেব খুবই কঠোর ছিলেন। ছাত্রদের তিনি প্রায়ই বেদম প্রহার করতেন। যাই হক অল্পদিনের মধ্যেই আবদুল গফর তাঁর কোরানপাঠ শেষ করলেন। মা-বাবা ছেলের এই-কীর্তিতে খুবই আনন্দিত হলেন এবং উৎসব করে গরীব-দুঃখীর মধ্যে আবার খাদ্য ও মিষ্টান্ন বিতরণ করলেন, গরীব-দুঃখীকে প্রচুর অর্থাদি দান করলেন এবং মোল্লাকেও তাঁর খুশিমতো পারিশ্রমিক দিলেন।

কিন্তু অন্যান্য পাঠান পিতার মতো বেহ্‌রাম খান্ এখানেই তাঁর পুত্রের শিক্ষা শেষ করলেন না। তিনি মোল্লাদের বিরোধিতা ও অপপ্রচার উপেক্ষা ক'রে পুত্রের আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। ইতিপূর্বে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র খান্ সাহেবের জন্যেও এই ব্যবস্থা করেছিলেন। সারা হস্তনগরে খান্ সাহেবই ইংরেজী বিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম প্রবেশ করেছিলেন। কোরান-শিক্ষা শেষ হলে বেহ্‌রাম খান্ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল গফরকেও আধুনিক শিক্ষালাভের জন্যে পেশোয়ার শহরের মিউনিসিপ্যাল বোর্ড স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। তখন আবদুল গফরের বয়স আট বছর। মোল্লারা বেহ্‌রাম খানের বিরুদ্ধে গোপনে নানা কুৎসা প্রচার করতে থাকলেও তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনও ফতোয়া জারী করতে সাহস পেলো না। কারণ, বেহ্‌রান খান্ ছিলেন গ্রামের একজন জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী খান্। এখানেই আবদুল গফর তাঁর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেন।

আধুনিক উচ্চ শিক্ষার কোনও সুব্যবস্থা ছিল না এই প্রদেশে। এই প্রদেশের নিজস্ব কোনও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। এই প্রদেশে একটি মাত্র কলেজ ছিল, পেশোয়ারে এডোয়ার্ডস্ মিশন কলেজ। তাও অনেক পরে, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে, লাহোরে অবস্থিত পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেয়েছিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে সারা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ম্যাট্রিকুলেটের সংখ্যা ছিল মাত্র পনেরো, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তা বেড়ে হয়েছিল মাত্র ৭১। মাত্র দশ-বারোটি হাই স্কুল ছিল সারা প্রদেশে—সেগুলির মধ্যে দুটি ছিল উল্লেখযোগ্য, একটি পেশোয়ারে ও একটি বান্নুতে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাশেষে আবদুল গফর পেশোয়ারের মেমোরিয়াল মিশন হাইস্কুলে ভর্তি হলেন। ঐ সময়ে তাঁর দাদাও ঐ স্কুলে পড়তেন।

খান্ সাহেব ১৯০৫ সালে ঐ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। আবদুল গফর এই স্কুলে যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়তেন, তখন ১৯০৬ সালে খান্ সাহেব ম্যাট্রিক পাস করে বোম্বাই মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে ভর্তি হন। আবদুল গফর ঐ বিদ্যালয়ে পড়তে থাকেন।

আবদুল গফর স্কুলে পড়াশোনা নিয়েই থাকেন। খেলাধুলো সম্পর্কে তিনি অত্যুৎসাহী না হ'লেও ফুটবল ও ক্রিকেট খেলতেন এবং সহপাঠীদের খেলাধুলো সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। অন্যান্য পাঠান বালকদের মতো বন্দুক নিয়ে তিনি শিকারেও যেতেন, কিন্তু পশুপক্ষী মেরে বিশেষ আনন্দ পেতেন না। এখানে তিনি তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন আবদুল রেহ্মানের সঙ্গে। এই আবদুল রেহ্মান ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কে গিয়েছিলেন এবং তুরস্কের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কামাল আতাতুর্কের একজন বিখ্যাত সহযোগী হয়ে উঠেছিলেন। মেমোরিয়াল মিশন হাই স্কুলের হেড-মাস্টার ছিলেন রেভারেণ্ড ই. এফ. ই. উইগ্র্যাম্। উইগ্র্যাম্ সাহেব ছিলেন উদারমনা ও স্বাধীনচেতা। যেসব ইংরেজ এখানে নিছক সাম্রাজ্যবিস্তার ও শাসনের মনোভাব নিয়ে আসে, তিনি তাদের সগোত্র ছিলেন না। তিনি তাঁর ছাত্রদের মনে উদারনীতিক মনোভাব গড়ে তুলতেন। এঁর সাহচর্যে এসে আবদুল গফর বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আবদুল গফর তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন:

> আমার শিক্ষক ছিলেন একজন বৃটিশ পাদরি মিঃ ই. এফ্. ই. উইগ্র্যাম। তাঁর এক ভাই ছিলেন, তিনি ছিলেন ডাক্তার। লোকে বলতো তাঁরা দুজনে এক বিখ্যাত লোকের দুই আদরের সন্তান ছিলেন এবং তাঁদের বাবা তাঁদের দুজনকেই মিশনের কাজে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন এবং তাঁদের বেতন তিনি নিজের পকেট থেকেই দিতেন। বড় ভাই ছিলেন মিশন হাই স্কুলের হেডমাস্টার, আর ছোট ভাই ছিলেন মিশন হাসপাতালের ডাক্তার। তাঁরা দুজনেই আন্তরিকতা ও ভালবাসা দিয়ে মানুষের সেবা করতেন। এ বিষয়ে আমি নিজেই সাক্ষ্য দিতে পারি। কারণ আমি তখন হোস্টেলে থাকতাম এবং আমাদের হোস্টেল তাঁদের বাংলোর কাছেই ছিল।...আমাদের হেডমাস্টার মিঃ উইগ্র্যাম তাঁর নিজের বেতন থেকে তিন-চার জন গরীব বা অনাথ ছাত্রকে বৃত্তি দিতেন। এইসব ব্যাপার আমার মনে খুবই রেখাপাত করতো। আমি

মনে মনে ভাবতাম, "আমরা মুসলমান পাঠান, আমাদের দেখো, আমাদের গরীব অভাবী ভাইদের সাহায্য বা সেবা করবার মতো সহানুভূতি আমাদের নেই। আর এঁরা বিদেশী, অন্য জাতির ও অন্য ধর্মের লোক, তবু এঁরা আমাদের দেশের লোকের সেবা করবার জন্যে এসেছেন। মানুষের প্রতি এঁদের কতোই না দরদ ও ভালোবাসা!"

বাল্যকালে মিঃ উইগ্র্যামের মতো ইংরেজের সাহচর্যে আসায় আবদুল গফর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘোর বিরোধী হলেও কখনো গোঁড়া ইংরেজবিরোধী হয়ে ওঠেন নি। বাল্যকালে মিঃ উইগ্র্যামের জীবন ও চরিত্র যে তাঁকে জাতির শিক্ষায়, সেবায় ও ত্যাগে নিজেকে নিয়োজিত করতে অনুপ্রাণিত করেছিল তা বলাই বাহুল্য।

আবদুল গফর যখন পেশোয়ারে পড়বার জন্যে ছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে একজন ভৃত্য থাকতেন, নাম বরনি কাকা। বরনি কাকা গল্প বলায় সুপটু ছিলেন। তিনি যুদ্ধের গল্প বলতেন, বীরত্বের বর্ণনায় বালক আবদুল গফরকে চমৎকৃত করে দিতেন। সৈনিকদের সেই গৌরবোজ্জ্বল জীবন, তাদের চমৎকার পোশাক-আশাক অস্ত্রশস্ত্র বালক আবদুল গফরের মনে মায়াজাল বিস্তার করতো। স্কুলে পড়বার সময়েই তরুণ আবদুল গফর সামরিক বৃত্তি অবলম্বন করবেন, স্থির করলেন। তাঁর সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ ও দুর্জয় সাহসদৃপ্ত মন সামরিক বাহিনীর পক্ষে লোভনীয়ই ছিল। আবদুল গফর তাঁর মা-বাবাকে না জানিয়েই সৈন্যবাহিনীতে একটি পদের জন্য ভারতের প্রধান সেনাপতির কাছে আবেদন করে বসলেন। সামরিক দপ্তর থেকে তাঁকে জানানো হলো, যথাসময়ে তাঁকে ফলাফল জানানো হবে। একে পাঠান, তায় খানের পুত্র, তাতে আবার হাই স্কুলের ছাত্র, বিভাগীয় খোঁজখবর নেওয়া চললো। আবেদন করবার পর কিছুদিন কেটে গিয়েছিল, ইতিমধ্যে আবদুল গফর হাই স্কুলে দশম শ্রেণীর পড়া শেষ করে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। অর্ধেক পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছিল, এমন সময় হঠাৎ সৈন্যবাহিনী থেকে ইনটারভিউর তলব এলো—কালই সকাল দশটায় রিক্রুটিং অফিসারের কাছে ইনটারভিউ দিতে হবে। আবদুল গফরের খুশি ধরে না, তিনি অর্ধপথেই পরীক্ষা বন্ধ রেখে ইনটারভিউ দিতে ছুটলেন; তাঁর নাম সরাসরি অফিসার শ্রেণীতে নিয়োগের জন্যে তালিকাভুক্ত হ'লো। তা-ও মর্দান সেনানিবাসে অবস্থিত 'গাইডস' নামে পরিচিত সুবিখ্যাত বাহিনীতে, যাতে ধনী ও প্রভাবশালী

ব্যক্তিদের সন্তানরাও সহজে সামান্য সেপাই রূপেও নিযুক্ত হতে পারে না। এ ধরনের সুযোগ সাধারণত অল্পই ঘটে। তাঁর দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ—ছ ফুট তিন ইঞ্চি—গৌর কান্তি বুদ্ধিদৃপ্ত মুখমণ্ডল, বংশমর্যাদা ও ইংরেজি শিক্ষা সহজেই তাঁকে এই অসামান্য সুযোগ করে দিলো। ম্যাট্রিক পরীক্ষা আর দেওয়া হ'লো না। তাতে কারো কোনও ক্ষোভ রইলো না, আবদুল গফর যা পেয়েছেন তার চেয়ে একজন পাঠান যুবকের উচ্চাশা আর কি হতে পারে? আবদুল গফরের পিতামাতা আত্মীয়স্বজন গ্রামবাসী সকলে খুবই আনন্দিত হলেন।

কিন্তু এই সুখস্বপ্ন শীঘ্রই ভঙ্গ হলো। পেশোয়ারে আবদুল গফরের এক বন্ধু অশ্বারোহী-বাহিনীতে অফিসার ছিলেন। আবদুল গফর এই সুসংবাদ নিয়ে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তাঁরা দুজনে দাঁড়িয়ে আলাপ করছিলেন। এমন সময় একজন ইংরেজ সামরিক অফিসার সেখানে পৌছলেন। আবদুল গফরের বন্ধুর মাথায় টুপি ছিল না; তিনি ইংরেজদের অনুকরণে চুলে তেড়ি বাগিয়েছিলেন। তা দেখেই ইংরেজ অফিসার ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "Well, damn Sardar Saheb, you too aspire to be an Englishman!" (তোমার উচ্চাশা তো কম নয় সর্দার সাহেব, তুমিও ইংরেজ হতে চাও!) আবদুল গফরের বন্ধু বিবর্ণ হয়ে গেলেন, তাঁর মুখ দিয়ে রা সরল না। আবদুল গফরের কাছে ইংরেজবাহিনীতে ভারতীয় সৈন্য ও অফিসারের মর্যাদা কি, তা মুহূর্তে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। তিনি সেই মুহূর্তে স্থির করলেন, এই সামরিক জীবন তাঁর জন্যে নয়। হেলায় এই সৌভাগ্যকে তাঁর তরুণ পুত্র হাতছাড়া করছেন দেখে বেহ্‌রাম খান্ অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। কিন্তু আবদুল গফর তাঁর সিদ্ধান্তে অচল রইলেন। ঐ সময় তাঁর দাদা খান্ সাহেব বোম্বাইয়ে মেডিকেল কলেজে শিক্ষা শেষ করে ইংলণ্ডে গিয়ে ডাক্তারি পড়ছিলেন। আবদুল গফর তাঁকে সমস্ত কিছু জানিয়ে একটি পত্র লিখলেন। খান্ সাহেব কনিষ্ঠের সুযুক্তি বুঝলেন এবং তাঁর প্রতি বাবাকে বিরক্ত না হতে অনুরোধ করলেন।

সামরিক বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করবার পর কিছুদিন ক্যাম্বেলপুরের একটি স্কুলে গিয়ে ভর্তি হলেন। কিন্তু এই গরম জায়গায় তাঁর স্বাস্থ্য ভালো না যাওয়ায় তিনি ঐ স্কুল ছেড়ে এলেন। এই সময় তিনি ধর্মশাস্ত্রের প্রতিও অনুরাগী হয়েছিলেন এবং আরবী ভাষা শিখছিলেন। কাদিয়ানের মৌলবী নুরুদ্দিনের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শুনে তিনি এক বন্ধুর সঙ্গে কিছুদিন কাদিয়ানে গিয়ে

রইলেন। কিন্তু তিনি এক দুঃস্বপ্ন দেখার পর ঐ স্থান ত্যাগ করলেন এবং আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলেন। আলিগড়ে একবৎসর পড়বার পর আবদুল গফর গরমের ছুটিতে বাড়ি ফিরলেন। ইতিমধ্যে তাঁর বাবা তাঁর দাদার কাছ থেকে এই মর্মে এক চিঠি পেলেন যে, তিনি নিজে যেমন ইংলণ্ডে গিয়ে চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চশিক্ষা লাভ করছেন, তেমনি তার ভাইও ইংলণ্ডে এসে ইঞ্জিনিয়ারিংতে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার কারণ হিসাবে তিনি বললেন, আবদুল গফর অঙ্কে ও জ্যামিতিতে ভালো।

শেষ পর্যন্ত তাই স্থির হলো। আবদুল গফর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে বিলাত যাবেন। এই মর্মে ডাঃ খান্ সাহেবকেও জানিয়ে দেওয়া হলো। তিনি ভাইয়ের জন্যে জাহাজে একটি আসনও সংগ্রহ করলেন। বাবা আবদুল গফরকে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হতে তিন হাজার টাকা দিলেন। কিন্তু আবদুল গফর যখন তাঁর মার কাছে বিলাতযাত্রার জন্যে অনুমতি নিতে গেলেন, তখন মা কেঁদে আকুল হলেন। তাঁকে পড়াপড়শিরা বুঝিয়েছিল, লোকে বিলাত গেলে ফেরে না; তারা খ্রীষ্টান হয়, মেম বিয়ে করে; তাঁর বড় ছেলে বিলাত গেছে, এখন যদি ছোটটিও যায়, তবে তাঁর ছেলে বলতে কাছে কেউ থাকবে না। তাছাড়া ঐ সময় তাঁদের পরিবারে দুটি মৃত্যু ঘটায়, তাও সবাই অশুভ লক্ষণ বলে মনে করছিলেন। আবদুল গফর মাকে অনেক করে বোঝালেন। কিন্তু মা কোনমতে সম্মতি দিলেন না। আবদুল গফর মাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন ও ভক্তি করতেন। মার চোখের জলে তাঁর বিলাত যাওয়ার সিদ্ধান্ত ভেসে গেল। এইভাবে বিলাত-গমন ও উচ্চশিক্ষালাভ আর হয়ে উঠলো না।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি ফিরে গেলেন না। নিজের উচ্চশিক্ষা লাভ নয়, সমগ্র পাঠানজাতির মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বিস্তারই এখন তাঁর প্রধান ব্রত হয়ে উঠলো। কারণ শিক্ষার বিস্তার ছাড়া পাঠানজাতির মুক্তি নেই।

৩.

সংসার : শিক্ষাব্রত : দেশব্রত

দেশে শিক্ষাবিস্তারের পথে প্রধান অন্তরায় ছিল মোল্লারা। কারণ, তাদের এই আশঙ্কা ছিল যে, লোকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠলে তাদের ভক্তিশ্রদ্ধা করবে না, তাতে তাদের রুজিরোজগার বন্ধ হবে। তাই তারা ফতোয়ার পর ফতোয়া জারী করে পাঠানদের আধুনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিচ্ছিল। আবদুল গফর মোল্লাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, আধুনিক শিক্ষালাভ ছাড়া পাঠানজাতি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক্ থেকে কখনও উন্নত হতে পারবে না। ইংরেজরা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে উন্নত বলেই তাদের যাজকসম্প্রদায় সুখে-স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করে। আর পাঠানজাতি আজ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক্ থেকে এতো অনুন্নত বলেই তার যাজকশ্রেণী মোল্লাদের দুঃখ-দৈন্যের সীমা নেই। সুতরাং মোল্লাদের নিজেদের অবস্থার উন্নতি করবার জন্যেই আধুনিক শিক্ষাবিস্তারে সহায়ক হওয়া উচিত। তাছাড়া, আবদুল গফর ধর্মশাস্ত্র থেকেও উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, পয়গম্বর মুসলমানদের জ্ঞানলাভের জন্যে চীনদেশে যেতেও বলেছেন। কিন্তু মোল্লারা আবদুল গফরের যুক্তিতে কর্ণপাত করলো না। এখন মোল্লাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও আবদুল গফর ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে শিক্ষাবিস্তারে ব্রতী হলেন।

উটমনজাই গ্রাম থেকে মাইলখানেক দূরে তুরংজাই গ্রাম। তুরংজাই গ্রামের হাজীসাহেব সমাজ-সংসারের হাতিয়াররূপে নিজেই কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। হাজীসাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় আবদুল গফর ও তাঁর সঙ্গীরা "দর্-উল্-উলুম্" নামে একটি সংস্থা গঠন করলেন। এই সংস্থার উদ্দেশ্য হলো পাখতুনদের মধ্যে শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করা। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে আবদুল গফর ও মৌলবী আবদুল আজিজ উটমনজাই গ্রামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। দেখতে দেখতে আবদুল গফর ও তাঁর সহকর্মীদের চেষ্টায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের সর্বত্র বিদ্যালয় স্থাপিত হলো। আবদুল গফর ও তাঁর সহকর্মীরা দেশের অন্যান্য ইসলামিক

শিক্ষা-সংস্থাগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করলেন। আলিগড়ের ইসলামিক শিক্ষা-সংস্থার মতোই দেওবন্দের ইসলামিক শিক্ষা-সংস্থাটিও উল্লেখযোগ্য ছিল। তবে আলিগড়ের সঙ্গে দেওবন্দের একটি গভীর পার্থক্য ছিল। আলিগড় ইসলামিক শিক্ষাসংস্থা বা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ইংরেজ-তোষণের দ্বারা মুসলমানদের জন্যে সুযোগ-সুবিধা আদায়ের পক্ষপাতী। আর দেওবন্ধ ছিল ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামের দ্বারা মুসলমানদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। দেওবন্ধ ইসলামিক সংস্থার অধ্যক্ষ মওলানা মোহামেদুল হাসান ছিলেন যেমন সুপণ্ডিত, তেমনি দেশপ্রেমিক। আবদুল গফরের সহকর্মী মৌলবী ফজল রাবি ও মৌলবী ফজল মহম্মদ মাফকি দেওবন্দেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ফলে মওলানা হাসানের সঙ্গে আবদুল গফর শীঘ্রই পরিচিত হয়ে উঠলেন। এই বৃদ্ধ জ্ঞানতাপসের দেশপ্রেম তাঁকে মুগ্ধ করলো। ওঁর মাধ্যমেই আবদুল গফর মওলানা ওবেইদুল্লাহ্ সিন্ধির সঙ্গে পরিচিত হলেন। মওলানা সিন্ধি দিল্লীর ফতেপুরী মসজিদে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণদের কোরান শিক্ষা দিতেন। তাঁর মত ছিল, ইংরেজীশিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানরা যদি ইসলামের মূল নীতির সঙ্গে পরিচিত হয়, তবে তারা দেশকে ও তার স্বদেশবাসীকে ভালোবাসবে। আবদুল গফর ওঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ইংরেজশাসন থেকে পাঠানজাতির মুক্তির কথাও ভাবতে লাগলেন। গোপনে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা দেওবন্ধে গিয়ে মাঝে মাঝে এইসব দেশপ্রেমিক সংগ্রামীদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

আবদুল গফর সর্বভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কেও খোঁজখবর রাখতে লাগলেন। এই সময়ে পাখতুনদের মাতৃভাষায় কোনও সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র ছিল না। তাই আবদুল গফর উর্দু পত্রিকারই গ্রাহক ছিলেন। তিনি এই সময় উর্দু দৈনিক 'জমিনদার' ও উর্দু সাপ্তাহিক মওলানা আবুল কালাম আজাদ-সম্পাদিত 'আল্-হিলালে'র গ্রাহক ছিলেন। মাওলানা আজাদ আবদুল গফরেরই সমবয়সী ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত আল্ হিলালের প্রথম সংখ্যা যখন ১৯১২ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হলো, তখন তা কেবল উর্দু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই যুগান্তর আনলো না, সারা ভারতীয় মুসলমানসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করলো। আল্ হিলালের জনপ্রিয়তা রাতারাতি এতোই বৃদ্ধি পেলো যে, নূতন গ্রাহকদের পুরো সেট দেওয়ার জন্যে প্রথম তিনটি সংখ্যা আবার ছাপতে হোলো। দু'বছরের মধ্যে আল্ হিলালের গ্রাহকসংখ্যা ২৬,০০০-কেও অতিক্রম করে গেল। তখনকার দিনে উর্দু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও এ ছিল এক বিস্ময়কর

ব্যাপার। আল্ হিলাল পত্রিকা আলিগড়পন্থীদের ইংরেজতোষণের নীতি ত্যাগ করে মুসলমানদের সংগ্রামের পথে ডাক দিলো। আল্ হিলাল পত্রিকার গ্রাহকদের নাম সরকারী গোয়েন্দাবিভাগের পাতায় উঠলো। আবদুল গফর 'আল্ হিলাল' পত্রিকার কেবল নিয়মিত পাঠক হয়ে উঠলেন না। আল্ হিলালের সঙ্গে তিনিও সহজেই একমত হয়ে উঠলেন। ইংরেজতোষণ নয়, ইংরেজেদের সঙ্গে সংগ্রামই মুসলমানদের স্বাধিকার অর্জনের একমাত্র উপায়।

বেহ্‌রাম খান্ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের কার্যকলাপে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, অথচ তার মধ্যে তিনি অন্যায় কিছু দেখতে পেলেন না। পুত্রের মন থেকে এই অশান্ত অস্থিরতা দূর করবার জন্যে তিনি পুত্রকে একটি গ্রামের জোতজমা দেখবার ভার দিলেন এবং পুত্রের নিজের পছন্দমতো একটি কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিলেন। আবদুল গফরের বয়স যখন ২২, তখন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিয়ে হলো। বিয়ের পরবৎসর তাঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্র আবদুল গনির জন্ম হলো। কিন্তু পিতা বেহ্‌রাম খানের আশা পূর্ণ হলো না। জোত-জমি, রূপবতী স্ত্রী, শিশুপুত্র, সংসারের কোনও বন্ধনই আবুদল গফরের অশান্ত চিত্তকে শান্ত করতে পারলো না।

তখনকার দিনে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে সরকারের ভয়ে রাজনৈতিক সভা-সমিতি হতো না। আবদুল গফর সংবাদপত্রে দেখলেন, ১৯১৩ সালের মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন হচ্ছে আগ্রায়। তাতে সভাপতিত্ব করবেন স্যার রহিমতুল্লা এবং ভাষণ দেবেন মওলানা আজাদ ও অন্যান্য অনেকে। আবদুল গফর তাঁর কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে আগ্রা ছুটলেন। আগ্রা থেকে গেলেন দিল্লী। সেখানে কয়েদিন থাকার পর গ্রামে ফিরলেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মওলানা মোহোমেদুল হাসানের অনুরোধে আবদুল গফর ও তার দুই সঙ্গী মৌলবী ফজল মহম্মদ ও মৌলবী ফজল রাবী মওলানা হাসানের সঙ্গে দেওবন্দে গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন। সেখানে দেওবন্দের আরও কয়েকজন মৌলবী উপস্থিত ছিলেন। একটি গোপন বৈঠকে তাঁরা স্থির করলেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের উপজাতীয় এলাকায় তাঁরা একটি গোপন কেন্দ্র খুলবেন। এই কেন্দ্র থেকে বৃটিশ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করবার জন্যে সংগ্রাম চালানো হবে। স্থির হলো, আবদুল গফর ও মৌলবী ফজল মোহম্মদ্ বাজাউরে একটি নিরাপদ স্থান নির্বাচন করবেন এবং সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন ওবেইদুল্লাহ্‌ সিন্ধি।

আবদুল গফর দেওবন্দ থেকে স্বগ্রামে ফিরলেন। তারপর তিনি আজমীরে তীর্থযাত্রা করতে যাচ্ছেন বলে মৌলবী ফজল মোহম্মদের সঙ্গে বাজাউর রওনা হলেন। তাঁরা ট্রেনে করে দরগাই পৌছলেন, সেখান থেকে টোঙ্গায় করে মালাকন্দের সীমানায় গিয়ে পৌছলেন। এখানে সরকারের সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন ছিল। তারা পায়ে হেঁটে বা গাড়িতে করে যে কেউ যাচ্ছিল, তাদের তল্লাসি ও জিজ্ঞাসাবাদ করছিল এবং সামান্যমাত্র সন্দেহ হলেই গ্রেপ্তার করছিল। আবদুল গফর টোঙ্গার পেছনে আসনে চাদরমুড়ি দিয়ে বসেছিলেন; সন্ধ্যার অন্ধকার সেই সবে নেমে এলেও তাঁর লম্বাচওড়া চেহারা লুকানো কঠিন ছিল। তাই আবদুল গফর ভয় পেলেন। একজন সেপাই টোঙ্গার কাছে এসে প্রশ্ন করলে টোঙ্গাওলা বললে, ভেতরে কেউ নেই। মৌলবী ফজল মোহম্মদ সাহেব আগেই নেমে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। আবদুল গফর গুঁড়িসুড়ি দিয়ে চাদরমুড়ি দিয়ে আবছা অন্ধকারে বসেছিলেন। তাই সেপাই তাঁকে দেখতে পেলো না, টোঙ্গাকে এগিয়ে যেতে হুকুম দিলো। তাঁরা আরও কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে টোঙ্গা থেকে নামলেন এবং গ্রামে রাত কাটালেন। পরদিন শেষ রাতেই তাঁরা হাঁটতে শুরু করলেন এবং দিনের শেষে একটি পাহাড়ে নদীর তীরে গিয়ে পৌছলেন। সেটা ছিল শীতকাল; তাই নদীতে জল ছিল না। নদী পার হয়ে তাঁরা ফজল মোহম্মদের গ্রামে গিয়ে পৌছলেন। আবদুল গফর সেখানে সে রাত্রি ও পরদিন বিশ্রাম করলেন। ফজল মহম্মদ মওলানা ওবেইদুল্লাহ্ সিন্ধির প্রতীক্ষায় গ্রামে রয়ে গেলেন এবং তাঁর এক আত্মীয়ের ছেলেকে আবদুল গফরের সঙ্গে দিলেন। ক্রমাগত তিন দিন দুর্গম পথ পায়ে হেঁটে তাঁরা বাজাউর পৌছলেন। বাজাউর একেবারে আফগানিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত। এখানে তাঁরা কয়েকদিন মওলানা ওবেইদুল্লাহ্ সিন্ধির অপেক্ষায় রইলেন। গ্রামের লোক পাছে সন্দেহ করে, সেজন্যে আবদুল গফর মসজিদের একটি কুঠরিতে 'চিল্লা' বা গভীর উপাসনায় মগ্ন রইলেন। কিন্তু কয়েকদিন অপেক্ষা করেও ওবেইদুল্লাহ্ সাহেব কোন কারণে আসতে পারলেন না। তখন তাঁরা বাজাউর থেকে মালাকন্দে ফিরে এলেন। মালাকন্দ থেকে দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করে স্বগ্রামে ফিরে এলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় এই বিপ্লবী কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা কার্যকর হয়ে উঠলো না। যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজবিরোধী বলে পরিচিত মুসলমানদের ইংরেজরা জেলে পুরতে লাগলো। তাই গ্রেপ্তার এড়াবার জন্যে

ওবেইদুল্লাহ্ সিন্ধি আফগানিস্তানে চলে গেলেন। দেওবন্দের মওলানা হাসান হজ যাত্রা করলেন মক্কায়; সেখানে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইংরেজদের হাতে দেওয়া হলো। তুরংজাইয়ের হাজীসাহেব বুনার অঞ্চলে চলে গেলেন। আবদুল গফরের বহু ঘনিষ্ঠ সহযোগীও তাঁর সঙ্গী হলেন। সেখানে তিনি বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইলেন। স্থানীয় জনসাধারণও বেশ সাড়া দিলো। কিন্তু স্থানীয় মোল্লারা তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। হাজীসাহেব এই ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে মোহ্মন্দ অঞ্চলে পালিয়ে গেলেন। তাঁর সমস্ত স্কুলগুলিই ইংরেজ সরকার বন্ধ করে দিলো, ঐসব স্কুলের শিক্ষকদেরও গ্রেপ্তার করলো। আবদুল গফর এইভাবে তাঁর একজন বিচক্ষণ পরামর্শদাতা, পৃষ্ঠপোষক ও সহকর্মীকে হারালেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আবদুল গফরের দ্বিতীয় পুত্র ওয়ালির জন্ম হলো। এর কয়েক দিন বাদেই জ্যেষ্ঠ পুত্র দু'বছরের শিশু গনি কঠিন ইনফ্লুয়েঞ্জা-রোগে আক্রান্ত হলো। রোগ ক্রমেই বাড়লো, গনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লো এবং জীবনসংশয় দেখা দিলো। সকলেই তার নিরাময়ের আশা ত্যাগ করলেন। আবদুল গফর তাঁর মুমূর্ষু পুত্রের শয্যাপার্শ্বে একটি মাদুরে বসে উপাসনা করছিলেন। এমন সময় তাঁর স্ত্রী ঘরে এলেন। তিনি মুমূর্ষু সন্তানের শয্যার চারিদিক প্রদক্ষিণ করে তারপর সন্তানের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে দুই বাহু ঊর্ধ্বে তুলে আল্লাহ্‌র কাছে কাতর প্রার্থনা করে বললেন, "ও আল্লাহ্, আমার ছেলের রোগ আমাকে দিয়ে তার প্রাণ বাঁচাও।" অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে রাত্রি কাটলো। সকাল থেকে গনির অবস্থা ক্রমেই ভালো হয়ে উঠলো এবং গনি কয়েক দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলো। কিন্তু মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর রোগ অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠলো এবং কয়েক দিনের মধ্যে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন।

এইভাবেই পঁচিশ বছর বয়সেই আবদুল গফর বিপত্নীক হলেন। এই শোক তাঁর অশান্ত চিত্তকে আরও অশান্ত করে তুললো। তিনি তাঁর দুই শিশু-সন্তানকে তাদের ঠাকুমার হাতে তুলে দিয়ে কর্মের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সমস্ত জাতির মুক্তির জন্যেই আল্লাহ্ যেন তাঁকে সংসার-বন্ধন থেকে হঠাৎ মুক্ত করে দিলেন। আবদুল গফর পাঠানজাতিকে শিক্ষিত ও সংঘবদ্ধ করে তোলার কাজে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর জনপ্রিয়তা ও প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগলো। হস্তনগরের খান্‌রা এক মসজিদে

সমবেত হয়ে তাঁকে তাঁদের "বাদশা" বলেই ঘোষণা করলেন। এইভাবে আবদুল গফর পরিচিত হলেন "বাদশা খান্" নামে। এই নামেই তিনি জগৎবিখ্যাত হয়েছেন।

৪.

সক্রিয় রাজনীতি : কারাবাস

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হলো। মহাযুদ্ধের অবসান ঘটায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই ভারতও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। যুদ্ধের সময় দ্রব্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের দুঃখের সীমা ছিল না। মানুষ ভাবলো, এখন যুদ্ধ বন্ধ হওয়ায় তার কিছুটা উপশম হবে। কিন্তু সেরকম কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দাবি কিছুটা মিটবে, এমন আশাও অনেকে করছিলেন, কিন্তু শীঘ্র সে বিষয়েও তাঁরা হতাশ হলেন। মুসলমানদের ধর্মনেতা বা খলিফা ছিলেন তুরস্কের সুলতান। তুরস্ক জার্মানির পক্ষে ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। এখন বিজয়ী ইংলণ্ড তার প্রতিশোধ নিতে চাইলো। তুরস্কের সুলতানকে তুরস্কের বাইরে অবস্থিত তাঁর সাম্রাজ্য থেকেই কেবল বঞ্চিত করা হলো না, তাঁকে ইসলাম দুনিয়ার খলিফার পদ থেকেও বিচ্যুত করা হলো। এতে ভারতীয় মুসলমানরা স্বভাবতঃই ইংরেজদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা সংস্কার সম্পর্কে যে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হলো, তাতে প্রদেশগুলিকে কিছু পরিমাণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঐ সামান্য সুযোগ থেকেও ইংরেজ সরকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশকে বঞ্চিত রেখেছিল,—ঐ রিপোর্টে পাঠানদের ভোটাধিকার, নির্বাচন, আইনসভা, মন্ত্রিসভা কিছুরই সুপারিশ ছিল না। অথচ প্রথম মহাযুদ্ধে পাঠানরা তাদের প্রাণ দিয়ে বৃটিশকে সাহায্য করেছিল। কেবল পেশোয়ার জেলা থেকেই বারো হাজারেরও বেশী পাঠান সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল। পাঠানজাতির প্রতি বৃটেনের এই নির্লজ্জ অবিচার সম্পর্কে আবদুল গফর পাঠানজাতিকে সচেতন করে তুললেন।

তারপর এলো ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সিডিসন কমিটির সুপারিশ অনুসারে দুটি বিল, যা রাউলাট্ বিল্স্ নামে কুখ্যাত হয়েছে। এই দুটি বিলে সকল প্রকার ব্যক্তি-স্বাধীনতার উচ্ছেদ এবং সরকারের সকল প্রকার দমনমূলক কাজকে আইন-সংগত করবার ব্যবস্থা ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষই এই দুটি বিলের প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলো। আবদুল গফরও এই বিলের প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। তাঁকে ইংরেজদের তাঁবেদার জিরগাগুলির পক্ষ থেকে বোঝাতে চেষ্টা করা হলো যে, যে সীমান্ত অপরাধ আইন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে চালু আছে, রাউলাট বিল্স্ তার তুলনায় অত্যন্ত নিরীহ। পাঠানরা যখন সীমান্ত অপরাধ আইনকেই মেনে নিয়েছে, তখন রাউলাট বিল্সের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা কেন? জিরগার এই যুক্তি আবদুল গফর মেনে নিতে পারলেন না। ইংরেজরা সর্বভারতীয় রাজনীতি থেকে পাঠানদের দূরে রেখেই তাদের পদানত রাখতে চায়; এখন পাঠানজাতির কর্তব্য সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে ঝাঁপিয়ে পড়া। ভারতের মুক্তির সঙ্গেই তার মুক্তি আসতে পারে, সুতরাং পাঠানজাতি এই জাতীয় সংকটে নিষ্ক্রিয় থাকলে চলবে কেন?

আইনসভায় নির্বাচিত ভারতীয় সদস্যদের মিলিত প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে রাউলাট বিল্স্ আইনে পরিণত হলো। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ একযোগে এই আইনের প্রতিবাদ জানালেন এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে ৩০শে মার্চ সমস্ত ভারতে হরতাল আহ্বান করলেন। পরে হরতালের তারিখ ৩০শে মার্চ থেকে পরিবর্তন করে ৬ই এপ্রিল করা হলো। কিন্তু এই সংবাদ ঠিকমতো না পৌছায় দিল্লীতে ৩০শে মার্চ তারিখেই হরতাল পালিত হলো। ঐদিন দিল্লীর বিখ্যাত জুম্মা মসজিদে অগণিত হিন্দু-মুসলমান মানুষের সামনে আর্যসমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ভাষণ দিলেন। তারপর দিল্লীবাসী হিন্দু-মুসলমান এক বিশাল শোভাযাত্রায় বার হলেন দিল্লীর পথে। পুলিস ও সৈন্যদল এই শোভাযাত্রীদের ভীতিপ্রদর্শনে নিরস্ত করতে না পেরে গুলি চালালো। গুলিতে কয়েকজন নিহত ও বহু আহত হলো। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাঁর বিশাল বক্ষ অনাবৃত করে ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গিনের সম্মুখে পেতে দিলেন। দিল্লীর হিন্দু-মুসলমানের এই মিলিত অহিংস সংগ্রামের সংবাদ বিদ্যুদ্‌গতিতে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়লো। এই সংগ্রামে আবদুল গফরের নেতৃত্বে পাঠানরাও ঝাঁপিয়ে পড়লো। ৬ই এপ্রিল তারিখে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-

প্রদেশে পূর্ণ হরতাল পালিত হলো। ঐদিন উটমনজাই গ্রামে এক বিশাল জনসমাবেশে আবদুল গফর ভাষণ দিলেন। তাঁর ৯০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ পিতাও পুত্রের এই প্রথম প্রকাশ্য রাজনৈতিক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় রাউলাট বিলসের তীব্র নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হলো।

সর্বভারতীয় রাজনীতি থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ এতোদিন দূরে ছিল। এখন তার ব্যতিক্রম ঘটায় সরকার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠলো। তার ওপর এই সময় আফগানিস্তান নিজেকে ইংরেজ-প্রভাব থেকে মুক্ত করবার জন্যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। আফগানিস্তানের অধিবাসীরা পাঠানদেরই স্বজাতি। তাছাড়া আফগানিস্তানের রাজা আমানুল্লা খান্‌ও পাঠানদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই অবস্থায় ইংরেজ সরকার দ্রুত পেশোয়ার জেলায় সামরিক আইন জারী করলো এবং ইংরেজবিরোধী পাঠানদের সামান্য সন্দেহেই গ্রেপ্তার করতে লাগলো। আবদুল গফর তাঁর কয়েকজন সঙ্গীসহ গোপনে উটমনজাই ত্যাগ করলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য তাঁরা প্রথমে মোহ্‌মন্দ অঞ্চলে যাবেন এবং সেখান থেকে আফগানিস্তানে চলে যাবেন। এই সংবাদ পেয়ে তাঁর বৃদ্ধ পিতা তাঁর অনুসরণ করলেন এবং আফগানিস্তানে যাওয়া থেকে বিরত করলেন। তিনি আবদুল গফর ও তাঁর সঙ্গীদের উটমনজাইয়ে গোপনে ফিরিয়ে আনলেন। আবদুল গফর ও তাঁর সঙ্গীরা গ্রেপ্তার এড়াবার জন্যে দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতেন এবং রাত্রিতে নিজ নিজ বাড়িতে আসতেন। কিন্তু শীঘ্রই পুলিস সন্ধান পেলো এবং আবদুল গফর গ্রেপ্তার হলেন।

তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলেও তাঁর কোনও বিচার হলো না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি পাঠানদের বাদশা কিনা। আবদুল গফর বললেন, তিনি সে সম্পর্কে কিছু জানেন না, তবে তিনি জানেন, তিনি পাঠানদের সেবক এবং তিনি রাউলাট বিল্‌সের বিরোধী। তাঁকে গ্রেপ্তার করে মর্দান জেলে রাখা হয়েছিল। পরদিন তাঁকে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে আনা হলে একজন বিপজ্জনক বন্দী হিসাবে তাঁর পায়ে বেড়ি লাগাতে হুকুম হলো। তাঁকে আবার জেলে পাঠানো হলো। বিশাল শরীর আবদুল গফরের, ওজনে তিনি ২২০ পাউণ্ড, তাঁর পায়ের উপযুক্ত বেড়ি জেলে ছিল না। বেড়ি পায়ের তুলনায় ছোট হলেও তাঁর পায়ে জোর করে তা-ই এঁটে দেওয়া হলো। এতে তাঁর পায়ের গাঁটের মাংস অনেকখানি ছিঁড়ে গেল। পুলিসের কর্তারা জানালেন, এ তাঁর সয়ে যাবে। তারপর তাঁকে মোটরে করে পেশোয়ারে

আনা হলো। সেখানে তাঁকে সেনানিবাসের জেল-হাজতে রাখা হলো। পরদিন একজন আফ্রিদি দারোগা তাঁর সেলে এসে তাঁকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্যে বেরিয়ে আসতে বললো। আবদুল গফর বললেন, "আমার পায়ে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে; এই অবস্থায় আমি হেঁটে আদালতে যেতে পারবো না। তুমি যদি একটা টোঙ্গা আনো, তবে যাবো, নইলে যাবো না।" দারোগা অনেক গালাগালি করলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টোঙ্গা আনলো। টোঙ্গায় হয়ে আবদুল গফর আদালতে পৌছলেন। আদালতে তিন-চারজন ইংরেজ বসে আছে। তারা আবদুল গফরকে দুচারটি প্রশ্ন করলো, তারপর নিজেদের মধ্যে আলোচনার জন্যে তাঁকে বাইরে যেতে বললো। ঘণ্টাখানেক বাদে তাঁকে জেলে নিয়ে যাওয়া হলো এবং একটি ব্যারাকে আটক রাখা হলো। সেখানে আরও কয়েকজন পাঠান ছিল।

এদিকে আবদুল গফর ও তাঁর সঙ্গীদের গ্রেপ্তারের পর উটনমনজাই গ্রামে সৈন্যদল এসে পৌছলো। তারা সারা গ্রাম ঘেরাও করে গ্রামবাসীদের আজাদ স্কুলের প্রাঙ্গণে একত্র এনে জড় করলো। তারপর তারা তাদের দিকে তাক করে কামান বসিয়ে তাতে গোলা-বারুদ ভরতে লাগলো। গ্রামবাসীরা ভাবলো, তাদের তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হবে, তাই তারা আল্লাহ্‌র নাম নিতে লাগলো। আসলে সৈন্যরা গ্রামবাসীদের ভয় দেখাবার জন্যে এটা করেছিল। তারা তাদের প্রাণে মারলো না সত্য, কিন্তু তাদের ধনসম্পত্তি যথেচ্ছভাবে লুণ্ঠন করলো এবং গ্রামের ওপর ত্রিশ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য করলো। ত্রিশ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করলেও নানা ফিকিরে তারা লক্ষাধিক টাকা আদায় করলো। জরিমানা আদায়ের জামিন হিসাবে প্রায় দেড় শতাধিক লোককে জেলে আটক রাখলো। বেহ্‌রাম খান্ ও তাঁর আত্মীয়স্বজনও সবাই জেলে তিনমাস আটক রইলেন। বেহ্‌রাম খান্‌কে তাঁর ছেলের সঙ্গে এক জেলেই রাখা হয়েছিল। তিনি তাতে খুশীই হয়েছিলেন, বলেছিলেন, "ওরা যদি আমাকে জেলে না আনতো, তবে তো আমি আমার ছেলেকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর দেখতে পেতাম না।"

ইতিমধ্যে ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওলাবাগে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। পাঞ্জাবে চলছিল সামরিক শাসন। তার প্রতিবাদে সারা ভারতে ঝড় উঠেছিল। আফগানিস্তানের সঙ্গেও বিবাদ চলছিল। তাই ইংরেজরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-

প্রদেশে কঠোরতম দমননীতি চালিয়ে পাঠানদের আতঙ্কগ্রস্ত করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের তৎকালীন চীফ কমিশনার স্যার জর্জ রুস্-কেপেল ছিলেন বিবেচক ব্যক্তি। সরকারের কঠোর দমননীতি পাঠানজাতিকে আতঙ্কিত না করে তাকে আরও ক্ষিপ্ত করে দেবে, বুঝে তিনি দমননীতি ত্যাগ করলেন। ফলে আবদুল গফর ছমাস কারাভোগের পর মুক্তি পেলেন।

৫.

নূতন সংসার : হিজরত : কারাগার

আবদুল গফর যখন কারাগার থেকে বাইরে এলেন, তখন তাঁর বৃদ্ধ পিতামাতা আবার বিয়ে করবার জন্যে তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আবদুল গফর তাতে রাজী হলেন এবং এক আত্মীয় ভাই আব্বাস খান্‌কে সঙ্গে নিয়ে বিয়ের বাজার করতে পেশোয়ার রওনা হলেন। কিন্তু সরদরিয়ার পৌছলেই পুলিস তাঁদের গ্রেপ্তার করলো। তারপর তাঁদের চরসদ্দা থানায় নিয়ে এলো এবং সেখান থেকে ফের হাঁটিয়ে পেশোয়ার নিয়ে গেলো। সেখানে তাঁদের গোয়েন্দাবিভাগের কর্তা মিঃ শর্টের বাংলোতে আনা হ'লো। মিঃ শর্ট তাঁদের শীতের সন্ধ্যায় বাইরে রাস্তায় দাঁড় কবিয়ে রাখতে হুকুম দিলো। তাঁরা প্রচণ্ড শীতে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে রইলেন আর মিঃ শর্ট তাঁর বাংলোতে আগুনের সামনে বসে মদ্যপান করতে লাগলো। গভীর রাত্রিতে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মিঃ শর্টের কাছে আনা হলো। জানা গেল, নওশোরায় যে বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে, সে সম্পর্কেই তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আবদুল গফর মিঃ শর্টের প্রশ্নের জবাব শান্তভাবেই দিচ্ছিলেন। মিঃ শর্ট তাঁকে চেঁচিয়ে ধমক দিয়ে উঠলো, "আস্তে বলো, চেঁচিয়ো না।" আবদুল গফর বললেন, "আমি যখন আস্তে কথা বলি, তখন আপনি বলেন, জোরে বল, আবার আমি যখন জোরে বলি, তখন আপনি বলেন, চেঁচিয়ো না। কিভাবে বলব, আপনি দেখিয়ে দিন।"

মিঃ শর্ট ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো, সে একজন সেপাই ডেকে আবদুল গফরকে গারদে আটকে রাখতে হুকুম দিলো। আব্বাস খান্‌কে পৃথক একটি সেলে আটক রাখলো। সে রাত্রি আবদুল গফরকে একটুকরা রুটিও খেতে দিলো না। সেলের মধ্যে শীতের রাত কাটাবার মতো কিছুই ছিল না। ছিল সিমেণ্টের বরফের মতো ঠাণ্ডা মেঝে ও লোহার-ডাণ্ডা দিয়ে তৈরী দরজা যা দিয়ে হিমেল হাওয়া হু হু করে ঢোকে। মেঝেতে দুখানা নোংরা কম্বল পড়েছিল, উকুন ও ছারপোকায় ভর্তি। আবদুল গফর শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ঐ কম্বল দুখানি মুড়ি দিয়ে পড়ে রইলেন। সকালে যখন উঠলেন, তখন তাঁর গা ও জামাকাপড় উকুন ও ছারপোকায় ভর্তি হয়ে গিয়েছে। সেগুলোকে তিনি বেছে বেছে ফেলে দিয়ে খানিকটা স্বস্তি বোধ করলেন। ঐ জেলে তাঁকে এক সপ্তাহ আটক রাখা হলো। তারপর তাঁকে একজন ইংরেজের কাছে আনা হলো, সে তাঁকে ছেড়ে দিলো।

আবদুল গফর প্রশ্ন করলেন, "আমায় কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ?"

ইংরেজটি বললো, "আমরা তোমার ব্যাপারে তদন্ত করছিলাম।"

"আমাকে গ্রেপ্তার করবার আগে কি আপনারা তদন্ত করতে পারতেন না ?"

সাহেব চটে উঠলো, "তদন্ত করে গ্রেপ্তার করব, কি গ্রেপ্তার করে তদন্ত করব, সেটা আমাদের মর্জি।"

"কিন্তু আমিও তো মানুষ। আমারও তো মর্যাদা আছে। অকারণে আমাকে হয়রান করলেন। আমি পালিয়ে যাচ্ছিলাম না। আমি অপরাধী হলে আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারতেন।"

সাহেব চটে উঠলো, "এইসব লম্বা লম্বা কথার অর্থ ?"

আবদুল গফর বুঝলেন, এই সাধারণ যুক্তি বুঝবার মতো অবস্থা এই বর্বরদের নেই। তাই তিনি কথাকাটাকাটি বন্ধ করে স্বগ্রামে ফিরলেন।

বাড়ি ফিরবার পর তাঁর বৃদ্ধ পিতামাতার ইচ্ছানুযায়ী তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করলেন। তখন তাঁর বয়স উনত্রিশ বছর।

বিবাহ করলেও আবদুল গফরের রাজনৈতিক কার্যকলাপে মোটেই ভাটা পড়লো না। বরং কারাগারের কঠিন অভিজ্ঞতা তাঁকে বর্বর বৃটিশ শাসনের অবসানের জন্য শতগুণে উৎসাহিত করে তুললো। ১৯২০ সালের গোড়ায় দিল্লীতে খিলাফত সম্মেলন হচ্ছিল। তাতে মহাত্মা গান্ধী, মওলানা আজাদ, হাকিম আজমল খান্, মওলানা সওকত আলি, মওলানা মহম্মদ আলি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ

সমবেত হয়েছিলেন। আবদুল গফর এই সম্মেলনে যোগদানের জন্যে দিল্লী যাত্রা করলেন। এই খিলাফত সম্মেলনেই গান্ধীজী তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের পরিকল্পনা উত্থাপন করেন এবং রাউলাট আইন, পাঞ্জাবে ইংরেজদের অবিচার ও তুরস্কের সুলতান ও মুসলিম দুনিয়ার খলিফার অধিকার হরণের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান ভারতবাসীকে মিলিতভাবে সংগ্রামের আহ্বান জানান।

সারা দেশে যখন খিলাফত আন্দোলনের ব্যাপক প্রস্তুতি চলছিল, তখন ভারতীয় মুসলমানদের একটি অংশ ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁদের ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশের জন্য বৃটিশ ভারত ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাজ্যে চলে যাওয়ার সংকল্প করেছিলেন। এইভাবে দেশত্যাগকে তাঁরা নাম দিয়েছিলেন "হিজরত"—দর্-উল্-হারব্ বা অশান্তির দেশ থেকে দর্-উল্-সালাম্ বা শান্তির দেশে গমন। মোল্লারা হিজরত আন্দোলনে মুসলমানদের বাধ্য করবার জন্যে এমন ফতোয়াও দিচ্ছিলেন যে, যে মুসলমান হিজরতে না যাবে, নিজের স্ত্রীর ওপর তার কোনও অধিকার থাকবে না। যারা এই হিজরতে যাচ্ছিল, তারা পেশোয়ার জেলার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে আফগানিস্তানে প্রবেশ করছিল। এইসব দেশত্যাগী তীর্থযাত্রী বা মুজাহারিন্দের সাহায্যদানের জন্যে পেশোয়ারে একটি হিজরত কমিটিও গঠিত হয়েছিল। আবদুল গফরও এই হিজরত আন্দোলনে যোগ দিলেন।

গোড়ার দিকে ইংরেজ সরকার এই দেশত্যাগ বন্ধ করবার জন্যে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পরে তারা এ বিষয়ে উৎসাহই দিতে লাগলো। কারণ, এতে এক ঢিলে দুই পাখী শিকারের সম্ভাবনা ছিল। প্রথমতঃ, দলে দলে মুজাহারিন্ আফগানিস্তানে পৌঁছলে তা আফগানিস্তানের অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করবে; দ্বিতীয়তঃ, আবদুল গফরের মতো অনেক শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী এই মুজাহারিন্দের নেতৃত্ব করায় তাদের হাত থেকে বৃটিশ ভারত নিষ্কৃতি পাবে।

পেশোয়ার জেলা থেকে কয়েক হাজার মুসলমান দেশত্যাগ করলো; অন্যান্য জেলা থেকেও অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে হ'লেও বহু লোক দেশত্যাগ করলো। অনেকে নিজেদের জোতজমি, ঘরবাড়ি, দোকানপাট পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়ে দেশত্যাগী হলো। বেহ্‌রাম খানের মতো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা এই আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে পারলেন না। তিনিও দেশত্যাগী হওয়ার সংকল্প করলেন। কিন্তু আবদুল গফর তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে এ বিষয়ে শেষ পর্যন্ত

বিরত করলেন এবং নিজে একটি বিরাট মুজাহারিন্‌দল নিয়ে আফগানিস্তানে পৌছলেন।

ইংরেজ সরকার এইসব মুজাহারিন্‌দের দলে বহুসংখ্যক গুপ্তচর ও প্ররোচক ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তানে মুজাহারিন্‌দের দিয়ে উৎপাত ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা।

দলে দলে মুজাহারিন্‌ আফগানিস্তানে প্রবেশ করলে আফগানিস্তানের রাজা আমানুল্লাহ্‌ খান্‌ তাদের খাদ্য আশ্রয় ও সুযোগসুবিধার সমস্ত ব্যবস্থা করতে, তাদের চাষের জমি, চাকরি ও ব্যবসায়ের সুযোগ দিতে চাইলেন। কিন্তু গোয়েন্দা ও প্ররোচকরা মুজাহারিন্‌দের উত্তেজিত করতে লাগলো। মুজাহারিন্‌রা বললো, তারা আফগানিস্তানে বসবাস বা কাজ করতে আসেনি, এসেছে ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ করতে, রাজাকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদের জেহাদে সাহায্য করতে হবে।

রাজা আমানুল্লাহ্‌ খান্‌ তাদের বললেন, বৃটিশ কেউটে সাপের মতো, সর্বদা তাঁকে দংশনের চেষ্টা করছে। কিন্তু বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার শক্তি তাঁর নেই; সে শক্তি তাদের নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে; তিনি কেবল তাদের বসবাসের সুযোগ দিতে পারেন। রাজা আমানুল্লাহ্‌ মুজাহারিন্‌দের যথাসাধ্য সুখ-সুবিধার চেষ্টা করলেন। শেষ পর্যন্ত হিজরত্‌ আন্দোলন ব্যর্থ হলো এবং এই হাজার হাজার মুজাহারিন্‌ তাঁর শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠলো।

হিজরত আন্দোলনের অযৌক্তিতা আবদুল গফর শীঘ্রই বুঝতে পারলেন। তিনি রাজা আমানুল্লাহ্‌ খানের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁদের মধ্যে খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হইল। আফগানদের মাতৃভাষা পাখতু হলেও আফগানিতে ফারসী ভাষারই চল ছিল। রাজা নিজে কয়েকটি ভাষা জানলেও পাখতু জানতেন না। আবদুল গফর যখন নিজের মাতৃভাষা ও আফগানিস্তানের জাতীয় ভাষা সম্পর্কে রাজার অজ্ঞতার প্রসঙ্গ তুললেন, তা সহজেই রাজার হৃদয় স্পর্শ করলো। অল্পদিনের মধ্যেই পাখতু শিখে তাঁর এই ত্রুটি দূর করলেন। আবদুল গফরকে আফগান মন্ত্রী ও ছাত্রদের সঙ্গেও ফারসীতেই আলাপ করতে হতো। তাঁদেরও তিনি তাঁদের মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষা পাখতু সম্পর্কে সচেতন করলেন। রাজা আমানুল্লাহ্‌র সঙ্গে আলাপে আবদুল গফর বুঝলেন, ভারতীয় পাঠানদের তাদের নিজেদের সমস্যা নিজেদেরই সমাধান

করতে হবে, তাদের মুক্তি তাদের নিজেদের দ্বারাই সাধিত হতে পারে, দেশত্যাগ করে ও অন্য দেশের সাহায্য নিয়ে তা কখনই সম্ভব নয়।

আবদুল গফর আফগানিস্তান থেকে স্বদেশে ফিরে এলেন। তাঁর কয়েকজন সঙ্গী তাসখন্দের দিকে যাত্রা করলেন। তিনি সামান্যসংখ্যক সঙ্গী নিয়ে বাজাউরে পৌছলেন এবং এই উপজাতীয় অঞ্চলে বিদ্যালয়সমূহ স্থাপনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে চাইলেন। তিনি দির গ্রামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। বিদ্যালয়টিতে দেখতে দেখতে ছাত্ররা আসতে লাগলো। কিন্তু এই সংবাদ ইংরেজদের কানে পৌছামাত্র পলিটিক্যাল এজেন্ট দিরের নবাবকে তলব করলেন এবং স্কুলটি অবিলম্বে বন্ধ করে দিতে হুকুম দিলেন। এই অবস্থায় আবদুল গফরের সঙ্গীরা তাঁকে ত্যাগ করলেন। আবদুল গফর দির ও বাজাউরের বহু জায়গা ঘুরে স্বগ্রামে ফিরে এলেন এবং ইংরেজরা এই অঞ্চলে যেসব স্কুল বন্ধ করে দিয়েছিল, সেগুলি আবার খুলতে চেষ্টা করলেন।

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসেছিল। এই কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতের সর্বত্র থেকে প্রায় চৌদ্দ হাজার প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, জিন্না, লালা লজপত রায়, মহম্মদ আলি, সওকত আলি ও আজাদের মতো দেশবরেণ্য নেতারা। কলিকাতা কংগ্রেসে ইংরেজের বিরুদ্ধে আসন্ন সংগ্রামের যে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল, তাকেই চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হচ্ছিল এই কংগ্রেসে। আবদুল গফর কংগ্রেসের এই অধিবেশনের সংবাদ শুনে স্থির থাকতে পারলেন না, এসে যোগ দিলেন। এই অধিবেশনে যেসব প্রস্তাব গৃহীত হলো, সেগুলির একটিতে বলা হলো যে, "কংগ্রেসের লক্ষ্য হলো সর্বপ্রকার বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতবাসীর স্বরাজলাভ।" কংগ্রেসের লক্ষ্য সম্পর্কে অধিবেশনে বিশদ আলোচনা হলো। গান্ধীজী কংগ্রেসের যে সংবিধান রচনা করেছিলেন, তাতে বলা হয়েছিল যে, কংগ্রেসের লক্ষ্য সম্ভব হলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভেতরে থেকে এবং প্রয়োজন হলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে গিয়ে ভারতবাসীর স্বরাজ-অর্জন। "প্রয়োজন হলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে গিয়ে" এই কথাগুলি মালব্য ও জিন্না এবং তাঁদের সমর্থকদের পছন্দ হলো না। তাঁরা কংগ্রেসের লক্ষ্যকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভেতরে থেকেই ভারতবাসীর স্বরাজলাভের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইলেন। জিন্না তাঁর যুক্তিস্বরূপ বললেন, ভারতবর্ষ কখনই বিনা রক্তপাতে কেবল শান্তিপূর্ণ উপায়ে

স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে না; ভারতের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের শক্তি বা ইচ্ছা কোনটাই নেই; সুতরাং এই অবস্থায় "প্রয়োজন হলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে গিয়ে" এ কথা বলা হঠকারিতা মাত্র। তিনি বললেন, এই প্রস্তাব গৃহীত হলে যারা বৃটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায় এবং যারা বৃটেনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায়, তারা একসঙ্গে মিলিত হ'তে পারে কিভাবে? কিন্তু গান্ধীজীর প্রস্তাবই কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত হলো। সংগ্রামী ভারতের সঙ্গে আবদুল গফর একাত্ম বোধ করলেন। তিনি বিশেষভাবে গান্ধীজীর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তাঁর স্বাভাবিক লাজুকতা ও নিজেকে অপ্রকাশিত রাখবার তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা ঐ সময় তাঁকে গান্ধীজীর কাছ থেকে দূরে রাখলো। কিন্তু তিনি গান্ধীজী ও কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগের কর্মসূচীকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করলেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতাই যে পাখতুনজাতিকে তার বহুবাঞ্ছিত স্বাধীনতা দিতে পারে, সে বিষয়ে তাঁর দৃঢ়প্রত্যয় জন্মালো।

নাগপুর কংগ্রেস থেকে ফিরেই আবদুল গফর সাংগঠনিক কার্যে আবার আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি তাঁর স্বগ্রামে আজাদ হাই স্কুল স্থাপন করলেন। এই স্কুলে তাঁর সহকর্মীদের অনেকেই শিক্ষকতা করতে লাগলেন। কিন্তু অর্থের অভাবে হাই স্কুলের উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব অনুভূত হ'তে লাগলো। অবদুল গফর নিজেও শিক্ষকতা করতেন। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম ছিল মাতৃভাষা পাখতু। সেই সঙ্গে ইসলামধর্মের মূল শিক্ষা এবং পাখতুনজাতির অতীত ইতিহাস ও সভ্যতা সম্পর্কেও শিক্ষা দেওয়া হ'তো। আবদুল গফর এই বিদ্যালয়ে বয়নশিল্প শিক্ষারও ব্যবস্থা করলেন।

পাখতুনদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজ সুব্যবস্থিতভাবে পরিচালিত করবার জন্যে তিনি একটি সংস্থাও গড়ে তুললেন। এই সংস্থার নাম হলো "অন্‌জুমান ইসলাহ্-উল্-আফাখিনা।" এই সংস্থার আদর্শ সম্পর্কে বলা হলো, এই সংস্থা সম্পূর্ণরূপে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ও সেবামূলক; রাজনীতির সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। অল্পদিন বাদেই আবদুল গফর খিলাফত সম্মেলনে যোগদানের জন্যে লাহোরে গেলেন। সেখানে বান্নুর আমীর মুখ্‌তার খানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো। আমীর মুখ্‌তার খান্ তাঁর দুই পুত্রকে—আমীর মমতাজ ও আমীর মকসুদ—আবদুল গফরের হাতে তুলে দিলেন। তাঁরা দুই ভাই পেশোয়ারে ইসলামিয়া কলেজে বি. এ. পড়ছিলেন, এবং খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে কলেজ ত্যাগ করেছিলেন। ওঁরা দুজনেই আজাদ হাই স্কুলে

শিক্ষকরূপে যোগ দিলেন। প্রথমে আমীর মকসুদ হয়েছিলেন হেডমাস্টার; পরে তিনি আবার কলেজে পড়াশুনো করতে গেলে তাঁর দাদা আমীর মমতাজ হেডমাস্টার হলেন। আজাদ.হাইস্কুলের শিক্ষকদের পুলিস ক্রমাগতই নানাভাবে ভীতিপ্রদর্শন ও বিব্রত করতো। কিন্তু শিক্ষকরা তা উপেক্ষা করতেন।

এই সময়ে পেশোয়ার খিলাফত কমিটিতে দুই উপদলে মতবিরোধ দেখা দিলে উভয় দলই আবদুল গফরকে ঐ কমিটির সভাপতি হতে অনুরোধ করলেন। খিলাফত তহবিলে যে অর্থ সংগ্রহ হবে, তা কেবল শিক্ষাবিস্তারের কাজে ব্যয়িত হবে, এই শর্তে তিনি সভাপতির পদ গ্রহণ করলেন। আবদুল গফর আবার সীমান্ত-প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, এবং পুরাতন যোগাযোগ পুনরুজ্জীবিত করে তিনি বন্ধ স্কুলগুলি আবার খুলবার চেষ্টা করলেন। আবদুল গফরের কার্যকলাপ সরকারকে পুনরায় উদ্বিগ্ন করে তুললো। সরকার বিভিন্ন জেলায় তাঁর সফরে আপত্তি করলো এবং সীমান্ত-প্রদেশের তৎকালীন চীফ কমিশনার স্যার জন ম্যাফি আবদুল গফরের বৃদ্ধ পিতাকে ডেকে তাঁর পুত্রকে ওই কাজ থেকে নিরস্ত করতে পরামর্শ দিলেন। তা না করলে তাঁদের বিপদ ঘটতে পারে, এমন কথাও জানালেন। বৃদ্ধ বেহ্‌রাম খান্‌ তাঁর পুত্রকে ডেকে বললেন, "বাবা, অন্যে যা করছে না, তুমি তা করছ কেন? তোমার তো কোনও অভাব নেই; তুমি ঘরেই আরামে বসে থাকো না।"

ইংরেজরা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পিতাপুত্রের মতান্তর ঘটাতে চেষ্টা করছে দেখে আবদুল গফর ব্যথিত হলেন। তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন, "বাবা, ধরুন, অন্য সকলে নমাজ ছেড়ে দিল, তখন আপনি কি আমাকেও নমাজ বন্ধ করতে বলবেন?"

"নিশ্চয় না। লোকে যাই করুক না কেন, আমি তোমাকে তোমার ধর্মীয় কাজ বন্ধ করতে কখনই বলব না।"

"তবে, বাবা, জাতির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করা ধর্মীয় কাজের মতোই পবিত্র। আমি যদি নমাজ ছাড়তে পারি, তবে আমি স্কুলও ছাড়ব। নমাজ যেমন কর্তব্য, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করা, তাদের সেবা করাও তেমনি আমার কর্তব্য।"

ধর্মপ্রাণ পিতা মুগ্ধ হয়ে বললেন, "তবে তোমার কর্তব্যই করো।" তিনি চীফ কমিশনারকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর পুত্র কোনও ধর্মীয় কাজ ত্যাগ করতে পারে না; এ বিষয়ে তিনিও তাকে পরামর্শ দিতে পারেন না।

আবদুল গফর নিজেও সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে তকরার করলেন,—শিক্ষাদান কোনও অপরাধ নয়, বরং এ বিষয়ে সরকারেরই সাহায্য করা উচিত। তখন তাঁকে জানানো হলো, "তোমাকে যদি সমাজসংস্কারের দ্বারা পাঠানদের ঐক্যবদ্ধ করতে দেওয়া হয়, তবে তা যে সরকারের স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে না, এমন কি নিশ্চয়তা আছে?"

"আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।"

"না, বিশ্বাস করা যায় না। এজন্য তোমাকে মার্জনা চাইতে হবে এবং তুমি আর কখনও এ কাজ করবে না, সে সম্পর্কে জামানত রাখতে হবে।"

"সেবাকার্য বন্ধ করবো এই শর্তে আমাকে জামানত দিতে বলছেন?"

"না, এ সেবাকার্য নয়, রাজদ্রোহ।"

এর অল্পদিন বাদেই আবদুল গফর গ্রেফতার হলেন। তাঁকে হাজতে না রেখে পেশোয়ার জেলে পাঠানো হলো। সেখানে তাঁকে সেলে রাখা হলো। সেলের দরজা খুলতেই দুর্গন্ধে নাক ভরে গেলো। দেখা গেল, যে কয়েদী এই সেলে আগে ছিল, তার বিষ্ঠা একটি মাটির পাত্রে সেলের এক কোণে রয়েছে। এই নোংরা সেল সম্বন্ধে তিনি প্রতিবাদ জানালে তাঁকে জেলের অফিসার জোর করে সেই সেলে ঢুকিয়ে তালাবন্ধ করে দিলো। দশদিন সেলে আটক রাখবার পর তাঁকে 'বিচারের' জন্যে ডেপুটি কমিশনারের কাছে আনা হলো। পুলিস বললো, "এ হিজরতে গিয়েছিল এবং আজাদ ইস্কুল খুলেছে।"

ডেপুটি কমিশনার বললেন, "যদি হিজরতে গিয়েছিল, তবে আবার আসতে দেওয়া হলো কেন?" তখন আবদুল গফর বলে উঠলেন. "তোমরা আমাদের দেশ নিয়েছ; এখন আমাদের দেশছাড়া করতে চাও?" এই জবাবে ডেপুটি কমিশনার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। ১৯২১ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে সীমান্ত অপরাধ আইনের ৪ ধারা অনুসারে আবদুল গফর তিন বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

কারাগারে যে দুঃসহ লাঞ্ছনা ও নির্যাতন তাঁকে সইতে হ'লো, তার তুলনা হয় না। তবে তাতে উজ্জ্বল স্বর্ণরেখাও যে দু-একটি ছিল না এমন নয়। তাঁকে সাধারণ কয়েদীর পোশাক পরতে দেওয়া হলো। তাঁর মতো লম্বা-চওড়া লোকের পক্ষে এ পোশাক ছিল নিতান্তই খাটো। তাঁর পায়জামা হাঁটু পর্যন্ত ও কামিজ নাই পর্যন্ত নামতো। তিনি নমাজ পড়লে প্রায়ই তাঁর পায়জামা ফেটে যেতো, জামা পাঁজরার উপরে উঠে থাকতো। জেলে কয়েদীদের বেড়ি

পরানো হ'তো, গলায় পরানো হ'তো লোহার হাঁসুলি। তাতে ঝুলতো একটি কাঠে লেখা দণ্ডের কারণ ও দণ্ডকাল। কয়েদীদের রোজ আধমণ শস্য চাকিতে ভাঙতে হ'তো। প্রত্যেক কয়েদীকে একটি নির্জন সেলে রাখা হ'তো। এই জেলের জেলর ছিলেন একজন হিন্দু; তিনি সৎ ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি আবদুল গফরকে একটি নির্জন সেলে রাখলেও তাঁকে চাকিতে খাটাননি। তিনি আবদুল গফরের পায়ে বেড়িও পরাননি। তিনি আবদুল গফরকে জেলের খাবার দিলেও তা কিছুটা পরিচ্ছন্ন ছিল। আবদুল গফরের সেলটি ছিল উত্তরমুখো। তাতে রোদ কখনো লাগতো না, লাগতো প্রচণ্ড হিমেল হাওয়া। তাঁকে একটি মাদুর ও তিনখানি পুরাতন কম্বল দেওয়া হয়েছিল। ঐ সেলে তাঁকে দিনরাত্রি আটক থাকতে হ'তো। রাতে ঘুমোবার জো ছিল না। পাহারাওলা বদলি হ'লেই নূতন পাহারাওলা এসে চেঁচিয়ে কয়েদীদের ডাকতো, কয়েদীরা সাড়া না দেওয়া পর্যন্ত তাদের চেঁচামেচি চলতো।

পেশোয়ার জেলে আবদুল গফর দু মাস ছিলেন। এই সময়ে অনেক খিলাফত বন্দীকেও এই জেলে আনা হয়েছিল। জেলে যাওয়ার কিছুদিন বাদে আবদুল গফরের দাদা ডাঃ খান সাহেব জেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁর হাতে সরকার একটি খবর পাঠিয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, আবদুল গফরকে সরকার স্কুল চালাতে দিতে পারে, তবে তাঁকে গ্রামে গ্রামে সফর বন্ধ করতে হবে। এই শর্তে রাজী হলে সরকার তাঁকে মুক্তি দেবে। আবদুল গফর ঘৃণাভরে সরকারের এই চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিলেন।

দু মাস পেশোয়ার জেলে রাখবার পর তাঁকে ডেরা ইসমাইল খাঁ জেলে পাঠানো হলো। পেশোয়ার জেল থেকে নিয়ে যাওয়ার সময়ে তাঁর পায়ে আবার বেড়ি পরানো হলো। কিন্তু ডেরা ইসমাইল খাঁ জেলে পৌঁছলে বেড়ি খুলে দেওয়া হলো। এখানে প্রথমদিন তাঁকে আধমণ শস্য ভাঙতে দেওয়া হ'লো। এখানে জেলর ছিলেন একজন প্রৌঢ় মুসলমান; তিনি আগে সৈনিক ছিলেন, তাঁর অবসরগ্রহণের সময়ও হয়ে এসেছিল। একদিন তিনি এসে আবদুল গফরকে শস্য ভাঙতে দেখে তাঁকে ঐ কাজ বন্ধ করতে বললেন। আবদুল গফর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "তুমিই এখানে একমাত্র লোক যে আল্লাহ্‌র তরফে এসেছে। আমি তোমাকে দিয়ে কিভাবে এ কাজ করাতে পারি?"

জেলরকে খুশি করবার জন্যে আবদুল গফর কাজ বন্ধ রাখলেন; জেলর

চলে যাওয়ার পরই তিনি আবার কাজ শুরু করলেন। জেলর একটি ফুটো দিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করছিলেন, তিনি ফিরে এসে বললেন, "তোমায় তো আমি কাজ না করতে বললাম; তবু কাজ করছ কেন?" আবদুল গফর একজন সাধারণ কয়েদীকে দেখিয়ে বললেন, "ও ডাকাত কি খুনী; ও কাজ করছে; আমার আদর্শ, যা পবিত্র ও শুদ্ধ, তার জন্যে কি আমি কষ্ট স্বীকার করতে পারি না?"

পরদিন জেলর আবদুল গফরকে কিছু গম ও কিছু ময়দা দিলেন। তাঁকে জেলরের লোক এসে বললো, "তোমাকে গম ভাঙতে হবে না; যদি জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসে, তবে তুমি গম ভাঙার ভান করবে; তাই তোমাকে এই ময়দা দিচ্ছি। নইলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানতে পারলে আমার চাকরি যাবে।"

আবদুল গফর বললেন, "তোমাদের কারো চাকরি যায়, তা আমি চাই না, ভাই। তাছাড়া আমি মিছে কথা বলতে ভালোবাসি না। তাই অন্যদের মতো আমাকেও গম পিষতে দাও।"

এই জেলে রুটি যা দেওয়া হ'তো, তা এমন শক্ত ছিল যে আবদুল গফর বলেছেন, ওরা রুটিতে বোধ হয় সিমেণ্ট ভেজাল দিতো। তরকারি ছিল অখাদ্য। তাই জেলর তাঁকে নিজের বাড়ি থেকে খাবার পাঠিয়ে দিতে চাইলেন। আবদুল গফর এই মানুষটির ধর্মভীরুতায় ও দরদে মুগ্ধ হলেন। কিন্তু তাঁকে ঐভাবে খাবার পাঠাতে নিষেধ করলেন। যে লোকটি দুধ আনতো, সম্ভবতঃ জেলরের পরামর্শেই সে আবদুল গফরকে কিছুটা দুধ দিতে চাইলো, বললো, ডাক্তার দিতে বলেছে। কিন্তু আবদুল গফর জানতেন, তাঁর কয়েদীর খাদ্যে দুধের বরাদ্দ নেই। তিনি যদি দুধ নেন, তবে তা কোনও রুগ্ণ কয়েদীর বরাদ্দ থেকে নিতে হবে। তাই তিনি তাও নিলেন না।

জেলে এইসব মানুষেরও যেমন সাক্ষাৎ পেলেন আবদুল গফর, তেমনি গঙ্গারামের মতো নরদেহধারী সরীসৃপকেও দেখলেন। এই জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন ইংরেজ। তিনি ইংরেজী ভিন্ন কিছুতে কথা বলতে পারতেন না। জেলরের অবসর নেওয়ার সময় হয়ে এসেছিল। গঙ্গারাম ছিল ডেপুটি জেলর। তাই জেলে ছিল তার দোর্দণ্ড প্রতাপ। সে কয়েদীদের কাছ থেকে নানা ছুতায় ঘুষ আদায় করতো। সে প্রায়ই কয়েদীদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিতো, তারপর তাদের ভয় দেখিয়ে পয়সা আদায় করতো। কয়েদীদের মধ্যে ঝগড়া বাধতো প্রায়ই ছোকরা নিয়ে। আবদুল গফর

কয়েদীদের এই কদর্য অভ্যাস ও প্রবণতা দেখে লজ্জিত ও মর্মাহত হলেন। গঙ্গারামের লোক আবদুল গফরকেও ঘুষের জন্যে বিরক্ত করতে লাগলো। বললো, গঙ্গারামকে ঘুষ দিলে সে তাঁকে নির্জন সেল থেকে বাইরে অন্য কোথাও থাকতে দেবে। আবদুল গফর বললেন, "তোমরা জানো, ঘুষ দেওয়া পাপ। তাছাড়া, আমি জামানত দিইনি বলেই এখানে এসেছি। ঘুষ দিলে তো জামানতও দিতে পারতাম।"

একদিন জেলের ইংরেজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সেলগুলি দেখতে এলেন। আবদুল গফরকে যে খাবার দেওয়া হয়েছিল, তা তিনি খেতে পারেন নি, পড়েছিল। তিনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে তা দেখিয়ে বললেন, "এই খাবার বিড়ালেও ছোঁয় না। এ কি মানুষে খেতে পারে?"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন ডাক্তার; তিনি খাবারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেন, খাবারের দোষ কি হলো?"

তখন আবদুল গফর বললেন, "আমার পাশের যে লোকটি আছে, তার পায়েও বেড়ি, আমারও পায়ে বেড়ি। সে-ও রোজ যেমন গম পেষে, আমি তেমনি পিষি। সে-ও কয়েদী, আমিও কয়েদী। কিন্তু তার অপরাধ ও আমার অপরাধ কি সমান? আমাদের মতো বন্দীদের কি আপনাদের দেশে এইভাবে রাখা হয়?"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গম্ভীরমুখে চলে গেলেন। কিন্তু পরদিন দেখা গেল, তাঁকে খাম তৈরির কারখানায় কাজ দেওয়া হয়েছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা হ'লে তিনি বললেন, আবদুল গফরকে আর বেশিদিন নির্জন সেলে থাকতে হবে না।

খাম-তৈরির কারখানায় সীমান্ত প্রদেশের সকল অঞ্চলেরই কয়েদী ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি করতো এবং আবদুল গফরের কাছে এসে আলাপ করতো। আবদুল গফর তাদের ঐ কদর্য অভ্যাস ত্যাগ করতে বললেন। তিনি গঙ্গারামকে ঘুষ দিতেও নিষেধ করলেন। দেখতে দেখতে গঙ্গারামের কারবারে মন্দা দেখা গেল। গঙ্গারাম এর শোধ নেওয়ার জন্যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে নালিশ করলো যে, আবদুল গফর কয়েদীদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাচ্ছে এবং জেলে বিশৃঙ্খলা-সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তাকে এ জেল থেকে না সরালে গোলযোগ হবে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসে আবদুল গফরকে প্রশ্ন করলেন। তিনি জানতেন, গঙ্গারাম মিছে কথা বলছে। তবু তিনি আবদুল

গফরকে ডেরা গাজী খাঁ জেলে বদলি করে দিলেন। আবদুল গফর পেশোয়ার জেলে দুমাস ও ডেরা ইসলাইল খাঁ জেলে দুমাস ছিলেন। এই চার মাসে তাঁর ওজন ৪৫ পাউণ্ড কমে গিয়েছিল। খারাপ খাবার খাওয়ার ফলে তাঁর মাড়ি নষ্ট হয়েছিল ও পাইওরিয়ারোগ দেখা দিয়েছিল।

আবার পায়ে বেড়ি, হাতে হাতকড়া, গলায় লোহার হাঁসুলি পরিয়ে কয়েদীর পোশাকে পর্দাঢাকা মোটরে আবদুল গফরকে ডেরা গাজী খাঁ রেলস্টেশনে আনা হলো। ট্রেন ধরতে না পারায় সারারাত তাঁকে রেলস্টেশনে সেই অবস্থায় কাটাতে হলো। সঙ্গে যেসব পুলিস ছিল, তারা সকলেই পাঠান; যে দারোগার উপর তাঁর ভার ছিল, সে ছিল পেশোয়ার জেলারই লোক, নাম নাদির খান্, সে এক সময়ে ডাকাত ছিল। তারা কাউকে আবদুল গফরের কাছে আসতে দিলো না, আবদুল গফরকেও কারো সঙ্গে কথা বলতে দিলো না। সকালে ট্রেন এলে তাঁকে চাকরদের কামরায় তোলা হ'লো। স্টেশনে ট্রেন থামলে কেউ যাতে তাঁকে দেখতে না পায়, সেজন্যে কাউকে কাছে আসতে দেওয়া হলো না। গাজিয়াঘাটে তাঁকে ট্রেন থেকে নামিয়ে অন্য একদল পুলিসের হাতে দেওয়া হ'লো। এদের ভারপ্রাপ্ত দারোগা ছিলেন হিন্দু। তিনি আবদুল গফরের হাতকড়া খুলে দিয়ে সঙ্গে করে প্লাটফর্মে বেড়াতে লাগলেন। তা দেখে নাদির খান্ বলে উঠলো, "সর্বনাশ! করছেন কি!" হিন্দু দারোগাটি বললেন, "ভাববেন না, এঁর সব দায়িত্ব এখন আমার। আপনি যেতে পারেন।"

সিন্ধুনদ পার হয়ে একটি টোঙ্গায় চড়িয়ে আবদুল গফরকে ডেরা গাজী খাঁ জেলে আনা হলো। জেলের ভেতরে পৌছলে তাঁর পায়ের বেড়ি খুলে দেওয়া হ'লো। এই ছোট্ট জেলটিতে পাঞ্জাবের রাজনৈতিক বন্দীদের রাখা হয়েছিল। এখানে সি-ক্লাস বন্দী ও বিশেষ শ্রেণীর বন্দীদের জন্যে দুটি ব্যারাক ছিল। আবদুল গফরকে সি-ক্লাস ব্যারাকেই রাখা হ'লো। এখানে এসে আবদুল গফর একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। এখানে সি-ক্লাস ব্যারাকে সব হিন্দু ও শিখ বন্দীরা ছিলেন; তাঁরা আবদুল গফরকে খুবই সৌজন্য দেখালেন। এখানকার খাদ্যও ছিল ভালো, কারণ রাজবন্দীরা খাবার নিজেরাই তৈরি করে নিতেন। বিশেষ শ্রেণীর রাজবন্দীরা যখন জানলেন যে, আবদুল গফর এই জেলে এসেছেন এবং তাঁকে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের সঙ্গে রাখা হয়েছে, তখন তাঁরা সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের কাছে দাবি জানালেন যে, আবদুল গফরকে বিশেষ শ্রেণীর ব্যারাকে পাঠানো হ'ক। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন একজন সৎ মুসলমান, তিনি

আবদুল গফরকে বিশেষ শ্রেণীতেই কেবল পাঠালেন না, তাঁর জন্যে একটি চরকারও ব্যবস্থা করলেন। এখানে নেতৃস্থানীয় বহু রাজবন্দীর সঙ্গে থেকে তাঁদের পরস্পরের ভাববিনিময়ের সুবিধা হ'লো। তাঁকে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীরূপে রাখার বিরুদ্ধে রাজবন্দীরা তীব্র প্রতিবাদ জানালে সরকার শেষ পর্যন্ত আবদুল গফরকে বিশেষ শ্রেণীর বন্দীর মর্যাদা দিলো। এখানে অনেক রাজবন্দী অল্পমেয়াদেই এসেছিলেন; তাঁরা আবদুল গফরের বহু আগেই জেল থেকে চলে গেলেন। আবদুল গফর দাঁতের রোগে খুবই ভুগছিলেন। তাই ডেরা গাজী খাঁ জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাঁকে দাঁতের চিকিৎসার জন্যে লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু এখানকার জেলর খান্ আলাউদ্দিন খান্ ছিল বৃটিশের করুণাকণাপ্রার্থী ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঘোর বিরোধী। তাই রাজবন্দীদের ওপর সে খুবই দুর্ব্যবহার করতো। এই জেলে খিলাফত ও কংগ্রেস আন্দোলনের রাজবন্দীরা ছিলেন। আবদুল গফরকে তাঁদের সঙ্গে না রেখে সে একটি নির্জন সেলে রাখলো। এই সংবাদ পেয়ে রাজবন্দীরা প্রতিবাদ জানালেন। ফলে পরদিন জেলর আবদুল গফরকে রাজবন্দীদের সঙ্গে রাখতে বাধ্য হ'লো। এখানে আবদুল গফর লালা লজপত রায়, আগা সফদার, মালিক লাল খান্ প্রভৃতির মতো রাজনৈতিক নেতাদের সাক্ষাৎ পেলেন। এখানে দন্তচিকিৎসা হওয়ার পর আবদুল গফরকে আবার ডেরা গাজী খাঁ জেলে স্থানান্তরিত করা হ'লো।

ডেরা গাজী খাঁ জেলের যে ব্যারাকে আবদুল গফর ছিলেন, সেই ব্যারাকে কিছুসংখ্যক শিখ ও হিন্দু রাজবন্দী ছিলেন। শিখরা যখন একসঙ্গে গাইতেন, "শির যাবে তো যাবে, মেরা শিখ ধরম না যাবে", তখন আবদুল গফরের খুবই ভালো লাগতো। শিখরা তাঁদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান উপাসনা প্রভৃতিতে এতোখানি প্রাণসঞ্চার করতে কেন পারতেন, সে সম্পর্কে আবদুল গফর বলেছেন, গুরু গ্রন্থসাহেব শিখদের মাতৃভাষায় লেখা, আর হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্র লেখা এমন ভাষায় যা তাদের মাতৃভাষা নয়। হিন্দু ও মুসলমানরা তাদের সংস্কৃত বা আরবী ধর্মশাস্ত্রের অর্থও প্রায়ই উপলব্ধি করতে পারে না। এই রাজবন্দীদের সঙ্গে আবদুল গফরের দিনগুলি ভালোই কাটতে লাগলো। এই সময়কার এই জেলের একটি ঘটনার কথা তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন।

একদিন আমরা শুনলাম যে, ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্‌স্‌ কর্নেল ওয়েড আমাদের জেল দেখতে আসবেন। তিনি খুব রুক্ষমেজাজের লোক বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি বন্দীদের সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার করতেন, যেন তিনিই সর্বশক্তিমান্‌ বিধাতা।...তিনি ব্যারাকে ঢুকে দেখলেন যে, হিন্দুরা গান্ধী-টুপি ও শিখরা কালো পাগড়ি মাথায় দিয়ে আছেন। তিনি জেলরের উপর খুব চটে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন কে এটা করতে দিয়েছে। আমাদের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টও ছিলেন একজন ইংরেজ, কিন্তু সদাশয় ব্যক্তি। তিনি কর্নেলকে বললেন, "দোষ আমার, ওঁদের নয়।"

ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল জেল থেকে চলে যাওয়ার আগে বন্দীদের গান্ধী-টুপি ও কালো পাগড়ি খুলিয়ে ফেলতে হুকুম দিয়ে গেলেন। পরদিন পর্যন্ত আমরা এই হুকুম সম্পর্কে কিছু জানতাম না। যাই হ'ক, এই হুকুমনামা পরদিন আমাদের পড়ে শোনানো হলো।

সর্দার খড়ক সিং সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে বললেন, "কিন্তু, স্যার, আমরা বিশেষ শ্রেণীর বন্দী, সরকার আমাদের নিজ নিজ পোশাক পরবার অনুমতি দিয়েছে। সুতরাং আমরা ইচ্ছামতো পোশাক পরতে পারি এবং ইন্‌স্‌পেক্টর-জেনারেলের হুকুম অবৈধ এবং এটা আমাদের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ।"

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বললেন, "আমি কি করতে পারি? আমি কেবল হুকুম তামিল করি। তাই আমি আপনাদের গান্ধী-টুপি ও পাগড়ি খুলে ফেলতে বলছি।"

...তিনি চলে গেলে আমরা ব'সে কি করা যায়, আলোচনা করলাম। শেষে আমরা স্থির করলাম, আমাদের যখন নিজ নিজ পোশাক পরবার অনুমতি আছে, তখন আমাদের নিজ নিজ অভিরুচিমতো পোশাক পরবারও অধিকার আছে। তা গান্ধী-টুপিই হক, কি কালো পাগড়িই হক, সে বিষয়ে নিষেধ করবার কারও অধিকার নেই।

পরদিন যখন দেখা গেল যে, বন্দীরা গান্ধী-টুপি ও পাগড়ি পরে আছে, তখন তাদের একে একে অফিসে নিয়ে গিয়ে তাদের টুপি ও পাগড়ি খুলে ফেলা হ'লো। আমরা তখন ঠিক করলাম, লেংটি ছাড়া আমরা কিছুই পরব না।

গান্ধী-টুপি বা পাগড়ি পরার বিশেষ কোনও অর্থ নেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের লোকদের কাছে এবং আমি নিজে টুপি বা পাগড়ি কিছুই পরতাম না। তবু আমি আমার বন্ধুদের বললাম, আমিও হুকুম অমান্যের ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাঁরা আমাকে তা করতে দিলেন না, বললেন, এটা তাঁদের, পাঞ্জাবীদের, নিজস্ব ব্যাপার।

ডেরা গাজী খাঁর ডেপুটি কমিশনার মিঃ উইলসন জেল দেখতে এলে সর্দার খড়ক সিং বন্দীর পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। তিনি বললেন যে, আমাদের নিজ নিজ পোশাক পরবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের এই অধিকার হঠাৎ আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া চলে না। ডেপুটি কমিশনার বললেন, "নিজেদের পোশাক পরবার অধিকার টুপি ও পাগড়ির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।"

সর্দার খড়ক সিং বললেন, "আপনি কি বলতে চান টুপি ও পাগড়ি পোশাক নয়?"

ডেপুটি কমিশনার বললেন, "না…"। আরও তর্ক হয়তো হ'তো; কিন্তু শিখরা হঠাৎ ধ্বনি দিয়ে উঠলেন, "সৎ শ্রী আকাল! যো বোলে সো নিহাল!"

তাঁদের গর্জনে আকাশ-বাতাস পূর্ণ হ'লো। ডেপুটি কমিশনার ছুটে অফিসে গেলেন এবং সেখানে স্থির হ'লো যে, এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য বন্দীদের শাস্তি দিতে হবে। পরদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘোষণা করলেন যে, যে ঠিকমতো পোশাক পরবে না, তাঁকে জেলের আইন-কানুন অনুসারে অভিযুক্ত ক'রে আদালতে নিয়ে যাওয়া হবে। মুসলমানরা হুকুম মেনে নিলেন, কিন্তু হিন্দু ও শিখরা মানলেন না। তাঁদের আদালতে নিয়ে যাওয়া হ'লো এবং ম্যাজিস্ট্রেট তাঁদের প্রত্যেককে অতিরিক্ত ন মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।……

ডেরা খাজী খাঁ জেলের বন্দীদের মধ্যে দীর্ঘতম মেয়াদ ছিল আমার—তিন বছর। অন্যান্য বন্দীরা ছ মাস, ন মাস, খুব বেশি হ'লে এক বছর দণ্ডভোগ করছিলেন। শীঘ্রই ছ মাস মেয়াদের বন্দীদের অনেকেই মুক্তি পেয়ে গেলেন; অন্যরাও পেয়ে যেতেন যদি গান্ধী-টুপি ও পাগড়ি নিয়ে আন্দোলন না হ'তো। তাঁরা তাঁদের অতিরিক্ত ন মাস মেয়াদ

খাটলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁদের বললেন: "এখন তোমরা ঠিকমতো পোশাক পরবে, নইলে আমি আবার তোমাদের অভিযুক্ত করবো।" এইবার হিন্দুরা হুকুম মেনে নিলো। কিন্তু শিখরা হুকুম মানলেন না; তাঁরা সকলে আবার ন'মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'লেন। যাঁরা হুকুম মেনে নিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের অন্য জেলে বদলি ক'রে দেওয়ার জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে অনুরোধ করলে তাঁদের অন্য জেলে বদলি ক'রে দেওয়া হ'লো।

শিখরা যখন তাঁদের দ্বিতীয়বার ন মাসের মেয়াদ শেষ করলেন, তখন তাঁরা বুঝলেন যে, তাঁরা হুকুম না-মানা পর্যন্ত তাঁদের বারবার অভিযুক্ত করা হবে। তাই তাঁরাও নরম হলেন ও অন্য জেলে বদলি করতে অনুরোধ করলেন। তাঁদের অনুরোধ মঞ্জুর হ'লো।

এখন রইলাম কেবল আমি ও সর্দার খড়ক সিং। সর্দার খড়ক সিং ছিলেন শক্তিমান্ পুরুষ, পর্বতের মতো দৃঢ় ও অবিচল। কারও হুকুম শোনার মানুষ ছিলেন না তিনি। আবার একবার ইন্‌স্‌পেক্‌টর জেনারেল জেল দেখতে এলেন, আগের মতোই দাম্ভিক ও উদ্ধত। তিনি আমাদের দেখে বললেন, "Well, Kharak Singh ?" (কি হে খড়ক সিং?)

সর্দার খড়ক সিং জবাব দিলেন, "Yes, Wade?" (কি বলছ, ওয়েড?)

ইনস্‌পেক্টর জেনারেল ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন এবং খড়ক সিংকে নির্জন সেলে আটক রাখার হুকুম দিলেন। ডাক্তার তাঁর জন্যে যে দুধের ব্যবস্থা করেছিলেন, তাও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'লো।...আমি এখন একাই ব্যারাকে রইলাম। ব্যারাকের পরেই হাসপাতাল। এখন আমাদের দুজনের দেখাসাক্ষাৎ হ'তো দরজার একটি ফুটো দিয়ে। সর্দার শীঘ্রই খুব দুর্বল হয়ে পড়লেন। আমি সুযোগ পেলেই দরজার ফুটোর মধ্য দিয়ে কিছু খাবার দিতাম। সর্দার খড়ক সিং ছিলেন চমৎকার মানুষ। সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও সাহস ও সংকল্পের তাঁর কখনও অভাব হয় নি।

বাইরে সারা দেশে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন প্রবলবেগে চলছিল। ক্রমেই অধিক বন্দী আসতে থাকায় জেল-কর্তৃপক্ষ আবদুল গফর যে ব্যারাকে ছিলেন, তা নিয়ে নেওয়ার সংকল্প করলো এবং আবদুল গফরকে মিয়ানওয়ালি

জেলে বদলি করলো। এখানে কোনও ব্যারাক ছিল না, তাই তাঁকে নির্জন সেলেই থাকতে হ'লো। এখানে অসহযোগ, খিলাফত ও গুরু-কে-বাগ আন্দোলনের বহু বন্দী ছিলেন। তাঁদের সকলের সঙ্গে আবদুল গফর পরিচিত হলেন।

তিন বছরের কারাবাসের মেয়াদ শেষ হয়ে এলো। এখন তাঁকে মিয়ানওয়ালি জেল থেকে পেশোয়ারে নিয়ে যাওয়া হলো। চরসদ্দায় তাঁকে এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের কাছে হাজির করলে তিনি তাঁকে উটমনজাই গ্রামে নিয়ে গিয়ে সেখানে মুক্তি দিতে পুলিসকে হুকুম দিলেন। এইভাবে দীর্ঘ তিনবছর কারাবাসের পর ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে আবদুল গফর মুক্তি পেলেন।

তিনি যখন ডেরা গাজী খাঁ জেলে ছিলেন, তখন তাঁর মার মৃত্যু হয়েছিল। আবদুল গফর বলেছেন: "আমার গ্রেফতার আমার মাকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল। তিন মাস ছাড়া আমাকে যে একখানি চিঠি লিখতে দেওয়া হ'তো, তা সব সময় তাঁকেই লিখতাম। তাঁর একটি প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল আমাকে আবার দেখবার। তিনি আমাকে জেলে দেখতে আসতেন, কিন্তু তিনি ছিলেন অতি বৃদ্ধা এবং ডেরা গাজী খাঁ ছিল অনেক দূরে, আমাদের মধ্যে ছিল সিন্ধুনদ। তাঁকে দেখতে আমার ইচ্ছা করলেও এইরকম কঠিন যাত্রার ঝুঁকি নিতে আমি তাঁকে বিরত করতাম।...১৯২৩ সালের শেষের দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন ও পরলোকে গেলেন। কিন্তু এ সংবাদ আমাকে কেউ দেয় নি। আমি খবরের কাগজ থেকে তা জেনেছিলাম ও গভীর বেদনা বোধ করেছিলাম।" তিনি বলেছেন: "আমি যখন মুক্তির পর বাড়ি ফিরলাম, তখন আমার বোন আমাকে বললেন যে, মা তাঁর জীবনের শেষের দিকে সব সময় আমার কথা জিজ্ঞাসা করতেন। যখন তাঁর অন্তিমকাল ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি বলেছিলেন, 'গফর কোথায়? সে কি এখনো ফিরে আসে নি?' মা আমার নাম মুখে নিয়েই পরলোকে যাত্রা করলেন।"

আবদুল গফরের এই দীর্ঘ কারাবাস পাঠানজাতির মধ্যে অভূতপূর্ব প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। তিনি যখন কারাগারে ছিলেন, তখন তাঁর ন বছরের পুত্র গনিও সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতেন। তিনি বলতেন "আপনারা যান, সরকারকে জিজ্ঞাসা করুন, কেন তারা আমার বাবাকে বন্দী ক'রে রেখেছে! যান, জিজ্ঞাসা করুন, কি অপরাধ তিনি করেছিলেন!" তাঁর এই বক্তৃতা গভীরভাবে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতো। পাঠানজাতির এই নবজাগরণ দেখে আবদুল গফরের আনন্দের সীমা রইলো না। তিনি বুঝলেন, তাঁর দুঃসহ দুঃখবরণ সার্থক হয়েছে।

পাঠানরা মুক্তিপ্রাপ্ত আবদুল গফরকে আটক থেকে ঘোড়ায় চড়িয়ে বিরাট মিছিল করে উটমনজাইয়ে আনবে স্থির করেছিল। সরকার তার গন্ধ পেয়ে তাঁকে কয়েকদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছিল। পুলিস যখন তাঁর স্বগ্রামে এনে তাঁকে মুক্তি দিলো, তখন তাঁর সাধের আজাদ হাই স্কুলে সবে ছুটি হয়েছে। ছাত্র ও শিক্ষকরা আত্মহারা হয়ে তাঁকে ঘিরে ধরলেন।

তাঁর মুক্তির প্রতীক্ষায় বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসবও পেছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আবদুল গফর ফিরে এলে আজাদ হাই স্কুলের বার্ষিক উৎসব হলো। হাজার হাজার মানুষ অভূতপূর্ব উদ্দীপনা নিয়ে এই উৎসবে এসে যোগ দিলেন। অনেকে অনেক ভাষণ দিলেন, কবিতা পড়লেন, আবৃত্তি করলেন, আবদুল গফরকে নানাবিধ উপহার দিলেন। শেষে সকলে তাঁকে "ফকর-এ আফগান" বা আফগানগৌরব উপাধিতে ভূষিত করলেন। আবদুল গফর এই সমাবেশে বক্তৃতাদানকালে বললেন :

> একদিন একটা সিংহী একপাল ভেড়ার পালে পড়েছিল। তার পেটে বাচ্চা ছিল, তাই চড়াও হওয়ার সময় তার একটা বাচ্চা হ'লো। সিংহীটা মরে গেল এবং সিংহের বাচ্চাটা ভেড়ার পালে রয়ে গেল। সেটা ভেড়ার মতো মাঠে চরে চরে ঘাস খায়, ভেড়ার মতো ডাকে। একদিন একটা সিংহ বন থেকে বেরিয়ে ভেড়ার পালকে আক্রমণ করলো। সে ভীতু ভেড়াগুলোর সঙ্গে এদিকে ওদিকে একটা সিংহের বাচ্চাকে ছুটোছুটি করতে দেখে খুবই অবাক হলো। সে সিংহের বাচ্চাটার কাছে যেতে চেষ্টা করলো, কিন্তু সিংহের বাচ্চা তো পালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সিংহ ভেড়ার পাল থেকে সিংহের বাচ্চাকে আলাদা করে ধরলো এবং তাকে একটা জলাশয়ের কাছে নিয়ে গেল। বললো, "জলের মধ্যে তোমার নিজের চেহারাটা দেখ! তুমি ভেড়া নও, তুমি সিংহ! ভেড়ার মতো ভয় পাওয়া আর ভ্যা ভ্যা করা বন্ধ কর। গর্জন করো সিংহের মতো।" পাঠানগণ! আমিও আপনাদের বলব, আপনারা মেষ নন, আপনারা সিংহ, কিন্তু আপনারা দাসত্বের মধ্যে বড় হয়েছেন। ভেড়ার মতো ভ্যা ভ্যা করা বন্ধ করুন। সিংহের মতো গর্জন করুন।

এই জনসভা ও আবদুল গফরের এই বক্তৃতা ইংরেজ সরকারকে আবার উদ্বিগ্ন ক'রে তুললো। তারা আঘাত হানার সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলো।

৬.

পিতৃবিয়োগ : হজ : পত্নীবিয়োগ

শতায়ু বৃদ্ধ বেহ্‌রাম খানের আনন্দের সীমা ছিল না। তাঁর দুই পুত্রকেই এখন তিনি কাছে পেয়েছিলেন। তাঁর বড় ছেলে ডাঃ খান সাহেব তেইশ বছর বিদেশে ছিলেন। লণ্ডনে থাকার সময়ে জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিনি লণ্ডনে এম. আর. সি. পি. পাস ক'রে যুদ্ধের সময়ে সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বিলাতে দ্বিতীয়বার একজন ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁদের একটি পুত্রসন্তানও হয়েছিল। তিনি যখন মিত্রপক্ষে ফ্রান্সে ইংরেজ বাহিনীতে কাজ করছিলেন, তখন ভারতে ইংরেজরা তাঁর ভ্রাতা, বৃদ্ধ পিতা ও পরিজনবর্গকে কারাগারে আটক রেখেছিল। কিন্তু এসব সংবাদ তিনি পাননি। পরে যুদ্ধশেষে তিনি যখন দেশে ফিরতে চাইলেন, তখনও সরকার অযথা তাতে বিলম্ব ঘটালো। শেষে ১৯২০ সালের মার্চ মাসে তিনি ভারতে ফিরলেন। তখনও তিনি সৈন্যদলে ছিলেন, তাঁকে গাইডস্‌ রেজিমেণ্টে মর্দানে রাখা হলো। তিনি দেশের ঘটনাবলী শুনে ক্ষুব্ধ হলেন। ১৯২১ সালে ওয়াজিরিস্তানে যে বিদ্রোহ দেখা দেয়, তা দমনের জন্যে তাঁর দলকে পাঠানোর নির্দেশ এলে তিনি স্বজাতীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণে আপত্তি করলেন এবং অনেক চেষ্টা ক'রে তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করাতে সমর্থ হলেন। তারপর তিনি পেশোয়ারে স্বাধীনভাবে চিকিৎসাব্যবসা শুরু করলেন। চিকিৎসাব্যবসায়ে তাঁর দ্রুত পসার হলো। দীর্ঘকাল পরে জ্যেষ্ঠপুত্রকে কাছে পেয়ে স্বভাবতই বেহ্‌রাম খান্‌ খুবই খুশী হয়েছিলেন। এখন তিন বছর বিচ্ছেদের পর তাঁর কনিষ্ঠপুত্রও ফিরে এলেন। কিন্তু এই আনন্দ তাঁর দীর্ঘস্থায়ী হলো না। ১৯২৬ সালে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন ও পরলোক গমন করলেন।

শব-সৎকারের সময়ে মোল্লারা দলে দলে এসে পৌঁছলো প্রাপ্যের লোভে। কিন্তু আবদুল গফর এঁদের দান দিতে অস্বীকার করলেন এবং পিতার মৃত্যুতে তিনি মোল্লাদের যে দু হাজার টাকা দান করতেন, তা

শিক্ষাবিস্তারের কাজেই দান করলেন। মোল্লারা আবদুল গফরের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো।

ঐ বছর, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে, তাঁর দিদি হজ করতে যাচ্ছিলেন। তাঁর অনুরোধে আবদুল গফর ও তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে গেলেন। তাঁরা করাচী থেকে জাহাজে রওনা হলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সব আসনই আগে বুক হয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁদের তৃতীয় শ্রেণীতেই যেতে হলো। অত্যন্ত গরম, তাতে তৃতীয় শ্রেণীতে যাত্রীর ভীড়। জাহাজ করাচী ছাড়বার পরই তাঁরা সকলেই 'সমুদ্ররুগ্‌ণ' হয়ে পড়লেন এবং খাবার ছুঁতে পারলেন না। জাহাজ ক্যামেরুনে নোঙর করলে তাঁরা ডাঙায় উঠে কিছু খেলেন। পরদিন সকালে জাহাজ আবার ছাড়লো; কিন্তু আবদুল গফর হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়লেন। একজন সদাশয় আরব যাত্রী তাঁকে নিজের কেবিনে ঠাঁই দিয়ে আবদুল গফরের প্রাণরক্ষা করলেন। জিড্ডায় যখন জাহাজ পৌছলো, তখন আবদুল গফর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। একজন মুসলিম পাণ্ডা তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে গেল। কিন্তু তার অসাবধানে জাহাজ থেকে মালপত্র নামানো হলো না, কিংবা পাণ্ডাই তা চুরি করলো। পরদিন তাঁরা জিড্ডা থেকে মক্কা গেলেন। মক্কায় ঐ সময় দিনে ছিল দুঃসহ গরম ও রাতে দুঃসহ ঠাণ্ডা। এইরকম আবহাওয়ায় অনভ্যস্ত অসংখ্য হজযাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লো ও মারা গেল।

ঐ বছরই মক্কার সরিফকে পরাজিত করে আরবের সুলতান ইব্‌ন্ সাউদ মক্কা জয় করেছিলেন। তিনি ঐ সময় বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট মুসলিমদের নিয়ে একটি সম্মেলন করেছিলেন। আবদুল গফরও ঐ সম্মেলনে যোগ দিলেন। অন্যান্য কয়েকজন ভারতীয় মুসলমান নেতা, যেমন, মহম্মদ আলি, সওকত আলি, জাফর আলি খান্, উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো, কিন্তু আলোচনায় কোনও মতৈক্য দেখা দিল না। শেষে গোলমালের মধ্যে সম্মেলন শেষ হলো। আবদুল গফর কিন্তু এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন। তিনি বিভিন্ন দেশের মুসলমান নেতাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের নানা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করলেন।

হজ-শেষে আবদুল গফরের দিদি মদিনা-দর্শনে গেলেন এবং সেখান থেকে তিনি দেশে ফিরলেন। আবদুল গফর ও তাঁর স্ত্রী গেলেন তাইফে; কারণ তাইফের জলবায়ু ছিল ঠাণ্ডা, প্রাকৃতিক শোভা মনোরম, উদ্দেশ্য তাঁর হৃতস্বাস্থ্য

পুনরুদ্ধার করা। পথে এক পাখতুন ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। তাইফে ঐ ভদ্রলোকের একটি বাড়ি ছিল। আবদুল গফর ও তাঁর স্ত্রী সেখানেই গিয়ে রইলেন। একদিন তিনি শহর থেকে বাইরে গিয়েছিলেন, একজন লম্বা-দাড়িওলা আলখিল্লা-পরা লোক তাঁকে ডেকে বললো, "এই শেখ! এদিকে এসো!" আবদুল গফর তার কাছে গেলে সে বললো, সে তাঁকে পয়গম্বরের দাড়ির চুল ও পায়ের ছাপওলা পাথর দেখাতে পারে। আবদুল গফর বললেন, "আমি ঐসব চিহ্নাবশেষ দেখতে আসি নি। আমি এসেছি পয়গম্বরের সেই ধৈর্য ও সাহসের সন্ধানে, যে পয়গম্বরকে মক্কার মরুভূমি তুচ্ছ করে তাইফের মানুষের কল্যাণের জন্য এখানে এনেছিলেন। আর তাইফের মানুষ তাঁকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করেছিল? তারা তাঁকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়েছিল, কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল, প্রহার করেছিল। এইসব নৃশংসতা সত্ত্বেও পয়গম্বর তাইফের মানুষদের সম্পর্কে হতাশ হননি, তিনি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, "আল্লাহ্! তুমি এদের পথ দেখাও।"

তাইফ থেকে আবদুল গফর ও তাঁর স্ত্রী মক্কা, জিড্ডা ও মদিনা গেলেন। তাঁদেব যাত্রিদলে দুজন পুরুষ ও চারজন স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁরা উটের পিঠে চড়ে যেতেন; দিনে বিশ্রাম করতেন, রাতে যাত্রা করতেন।

কয়েকদিন মদিনায় থাকবার পর তাঁরা জেরুজালেম রওনা হলেন। তাঁরা প্রথমে রাবাকে গেলেন, সেখান থেকে গেলেন সুয়েজখালে, সুয়েজ থেকে রেলে জেরুজালেমে। এই শান্তিধাম জেরুজালেমে তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী অকস্মাৎ অনন্ত শান্তিধামে চলে গেলেন। একটি সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হলো। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে আবদুল গফরের দুটি সন্তান হয়েছিল, একটি পুত্র, একটি কন্যা—আলি ও মেহেরা তাজ। এই আকস্মিক পত্নীবিয়োগে আবদুল গফর অত্যন্ত বিচলিত হলেন। এই সময়ে তাঁর বয়স মাত্র ছত্রিশ বৎসর হলেও তিনি আর বিয়ে করেননি। কয়েক বৎসরের মধ্যে মাতাপিতা ও পত্নীর মৃত্যু যেন তাঁকে দেশের ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগের জন্য সকল বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলো।

আবদুল গফর কয়েকদিন প্যালেস্টাইন, লেবানন, সিরিয়া ও ইরাকে কাটালেন। ঐসব জায়গায় তিনি মুসলিমদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। কয়েকদিন বাগদাদে থাকবার পর বসরায় গেলেন। তারপর জাহাজযোগে করাচীতে এসে পৌছলেন; সেখান থেকে ফিরে এলেন স্বগ্রামে।

মুসলিম দুনিয়ায় সফরের ফলে তিনি দেখলেন সর্বত্রই মানুষ ধর্মীয় সংকীর্ণতা ছেড়ে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। যে খলিফার অধিকার নিয়ে ভারতীয় মুসলমানরা লড়াই করেছিল, তুরস্কের নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদ স্বহস্তে তার উচ্ছেদসাধন করেছে, এবং কামাল আতাতুর্কের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তুরস্কে গড়ে উঠেছে এক শক্তিশালী প্রজাতন্ত্র। ইজিপ্ট, ইরান, আরবদেশ জগলুল পাশা, রেজা শাহ্, ইব্‌ন্ সাউদ প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী নেতাদের নেতৃত্বে জেগে উঠেছে। সর্বত্রই মানুষ মনে করছে, ভারতবর্ষ যদি তার স্বাধীনতা-সংগ্রামে সফল হয়, তবে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে মুক্ত হবে। আবদুল গফর বুঝলেন, কেবল ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র মুসলিম দুনিয়ার মুক্তিই ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামের সাফল্যের উপর নির্ভরশীল। তাই প্রত্যেক ভারতীয় মুসলমানের উচিত এই মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া।

১৯২২ থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে দুর্দিন দেখা দিয়েছিল। চৌরিচৌরা থানা আক্রমণ ও পুলিস হত্যার পর গান্ধীজী হঠাৎ অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করেছিলেন। তাঁর এই কার্যে সর্বভারতীয় নেতাদের অনেকেই বিস্মিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা প্রায় সকলেই জেলে ছিলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহারের কয়েকদিন পরেই মার্চ মাসে গান্ধীজীও গ্রেপ্তার হলেন এবং ছ বছরের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কেবল কংগ্রেস ও খিলাফত আন্দোলনকারীদের মধ্যেই বিভেদ সৃষ্টি হলো না। কংগ্রেসও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। যে ক্ষোভ ও ক্রোধ বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হয়েছিল, তা এখন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে বিস্ফুরিত হলো। দেশের সর্বত্র বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটলো। ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের কোহাটেও ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হলো। কোহাট ছেড়ে হিন্দুরা সকলে পালিয়ে এলেন। সাম্প্রদায়িক মনোভাব এমন কি মওলানা মহম্মদ আলি ও সওকত আলির মতো নেতাদেরও পেয়ে বসলো। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো, তা সাম্প্রদায়িকতাকে আরও ইন্ধন যোগালো। বহু দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রক্তপাত ঘটলো। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের অন্যতম সর্ববরেণ্য নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ একজন মুসলমান আততায়ীর হস্তে নিহত হলেন। গান্ধীজী বললেন, "মুসলমানের মধ্যে তরবারি অত্যধিক প্রকট হয়ে উঠেছে। ইসলামের মূল অর্থ শান্তি; সেই অর্থ রক্ষা করতে হলে তরবারি কোষবদ্ধ করতে হবে।" সাম্প্রদায়িকতার

উন্মত্ততা আবদুল গফরকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করলো না। তিনি বললেন, "ইসলাম হলো আসল, ইয়াকীন্ ও মহব্বত—সদাচরণ, ধর্মাচরণ ও প্রেম। তার মধ্যে হিংসার স্থান কোথায় ?"

অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের মতো তিনিও হিন্দু-মুসলমান সকলকে বৃটিশের বিভেদ-সৃষ্টির এই ফাঁদে পা দিতে নিষেধ করলেন।

৭.

'পাখতুন' প্রকাশ : খুদাই খিদমতগার সংস্থা গঠন

হজ থেকে ফিরে আবদুল গফর সীমান্ত-প্রদেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ালেন। পাঠানদের শতকরা নিরানব্বই ভাগ ছিল নিরক্ষর, তাই তাদের সঙ্গে মুখে মুখে আলাপ করাই ছিল সর্বাধিক কার্যকর। তবু শিক্ষিত পাঠানদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত পাঠানের মারফত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, সকল বিষয়ের খবর নিরক্ষর মানুষের কাছে পৌছে দিতে হ'লে আবদুল গফর পাঠানদের মাতৃভাষায় একটি সাময়িক পত্র প্রকাশের প্রয়োজন বোধ করলেন। কেবল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে নয়, উপজাতীয় অঞ্চলে ও আফগানিস্তানেও পাখতুনদের মাতৃভাষা পাখতু। পাখতুনরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলেই ছড়িয়ে আছে। তাছাড়া ভারতের বাইরেও বহু স্থানেই তারা আছে। অস্ট্রেলিয়ায় ও ক্যালিফর্নিয়াতেও তাদের উপনিবেশ আছে। সুতরাং পাখতু ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে পারলে পাখতুনদের মধ্যে যোগাযোগের পথ সুগম হবে।

তাই ১৯২৮ সালের মে মাসে আবদুল গফর 'পাখতুন' নামে পাখতু ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। এর বার্ষিক চাঁদা করা হলো ৪ টাকা, তবে ছাত্রদের জন্যে আড়াই টাকা। এই পত্রিকায় একটি সংক্ষিপ্ত নোটে বলা হলো : "পাখতুন পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা ও উন্নতি সাধন করা পাখতুনদের আত্মমর্যাদার প্রশ্ন হওয়া উচিত। 'পাখতুন' পাখতুনদের জন্যেই প্রকাশিত ; তাই আমরা স্থির করেছি যে, এই প্রকাশনা থেকে যা লাভ হবে, তা পাখতুনদের

জাতীয় ক্রিয়াকলাপেই ব্যয়িত হবে। আমরা এই প্রকাশনাকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে পাখতুনদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।"

এই পত্রিকার প্রকাশনা সম্পর্কে আবদুল গফর বলেছেন :

> তখন পাখতুনদের নিজেদের ভাষা সম্পর্কে কোন অনুরাগ ছিল না। পাখতু যে তাদের মাতৃভাষা, সে বিষয়ে তারা সচেতনও ছিল না এবং তারা যেখানেই যেতো, সেখানকার ভাষাকে রপ্ত ক'রে নিতো ও মাতৃভাষা ভুলে যেত। তারা নিজেদের ভাষা অপরকে শেখাতো না, নিজেরাও পাখতু ভাষায় কিছু পড়তো না, শিখতো না। নিরক্ষরদের কথা ছেড়েই দিলাম, আমি যখন শিক্ষিত পাখতুনদের কাছে পাখতু ভাষায় প্রকাশিত একটি পত্রিকার সভ্য হতে ও পড়তে আবেদন করলাম, তাঁরা মন্তব্য করলেন, 'পাখতু ভাষায় পড়বার মতো শেখবার মতো কি আছে?' আমি বললাম, 'তা ঠিক, কিন্তু সেটা তো পাখতু ভাষার দোষ নয়। অন্যান্য দেশের সকল ভাষাই একদিন অনুন্নত ছিল। শক্তিমান মানুষের আত্মোৎসর্গ এইসব ভাষাকে লালন করেছে এবং এমন উচ্চতায় উন্নীত করেছে। আমাদের কেউ কি পাখতু ভাষাকে লালন করতে বা উন্নত করতে চেষ্টা করেছি? অন্যপক্ষে, মোল্লারা প্রচার করেছে পাখতু হ'লো নরকের ভাষা, নরকের লোকে ঐ ভাষায় কথা বলে। পাখতুনরা এতোই অজ্ঞ যে, তারা মোল্লাদের প্রশ্নও করে নি, এই খবর মোল্লারা কিভাবে পেলেন, তাঁরা কতদিন হ'লো নরক থেকে এসেছেন? এইরকম অবস্থায় 'পাখতুন' পত্রিকার জন্ম হ'লো। অল্পদিনের মধ্যে তা কেবল পাখতুনদের স্বদেশে নয়, পৃথিবীর যেখানেই পাখতুনরা বাস করে, সেখানেই জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। আমেরিকায় বাসকারী পাখতুনরা কেবল প্রচারের দিক্ থেকে নয়, অর্থের দিক থেকেও সর্বাধিক সাহায্য দিলো।

'পাখতুন' পত্রিকায় সুলিখিত বহু নিবন্ধ থাকতো ; সেই সঙ্গে থাকতো ছোট বড় কবিতা-ও। পাখতু ভাষার ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা যে কতো, সে সম্পর্কে 'পাখতুন' পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই সচেতন হয়ে উঠলেন। আফগানিস্তানেও 'পাখতুন' পত্রিকা খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। আবদুল গফরের পরামর্শমতো রাজা আমানুল্লাহ্ নিজে পাখতুনদের মাতৃভাষা পাখতু শিখেছিলেন। তিনি পাখতুকেই রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন।

তাই তিনি সরকারী কর্মচারীদের সকলকেই তিন বছরের মধ্যে পাখতু শিখে নেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। 'পাখতুন' প্রকাশের কিছু পরে রাজা আমানুল্লাহ্‌র পৃষ্ঠপোষকতায় আফগানিস্তানেও পাখতু ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশিত হলো।

আমানুল্লাহ্ খান্ বলতেন, তিনি বিপ্লবী রাজা। তাঁর জাতীয়তাবাদী উদার চিন্তাধারা এবং প্রকাশ্য বৃটিশ-বিরোধিতা ইংরেজদের মনঃপূত হলো না। তাই তারা দেশে মোল্লাশ্রেণীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমানুল্লাহ্‌কে সিংহাসনচ্যুত করতে চাইলো। মোল্লা ও মওলানার দল রাজা আমানুল্লাহ্‌কে কাফের বলে ঘোষণা করলো। রাজা আমানুল্লাহ্ দেশত্যাগ করতে বাধ্য হলেন এবং বাচ্চা-ই-সাকাও নামে এক ভাগ্যসন্ধানী আফগানিস্তানের সিংহাসন অধিকার করলো। এই ঘটনা সম্পর্কে আবদুল গফর বলেছেন :

> আমানুল্লাহ্ খান্ পাখতুনদের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্যে কাজ করেছিলেন। কিন্তু পাখতুনরা কে মিত্র কে শত্রু চিনতে পারলো না, বিদ্রোহ করলো এবং তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত করলো। এ জঘন্য কৃতঘ্নতা। কৃতঘ্নতা ভগবানের চক্ষে মহাপাপ, তাই পাখতুনদের ঘাড়ে বাচ্চা-ই সাকাওকে চাপিয়ে দিয়ে তিনি তাদের শাস্তি দিলেন। দেশের ও জাতির অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি রুদ্ধ হলো ; দেশ ও জাতি ধ্বংসের পথে দ্রুত এগিয়ে চললো।

আমানুল্লাহ্ খান্ ছিলেন মহম্মদজাই উপজাতির লোক। মহম্মদজাই উপজাতির নাদির খান্ ছিলেন ফ্রান্সে। তিনি বাচ্চা-ই-সাকাওয়ের সিংহাসন অধিকারের সংবাদে দ্রুত স্বদেশে ফিরলেন এবং বাচ্চা-ই-সাকাওকে বিতাড়িত করবার জন্যে সচেষ্ট হলেন। মহম্মদজাই, মাসুদ ও ওয়াজিরি উপজাতিগুলি তাঁর সমর্থনে এগিয়ে এলো। আবদুল গফর সীমান্ত-প্রদেশে ও উপজাতি-অঞ্চলে নিজে ঘুরে নাদির খানের জন্যে সাহায্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। ভারতীয় পাখতুনদের মুক্তি যেমন ভারতবর্ষের মুক্তির সঙ্গে জড়িত, তেমনি পাখতুন-জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিও আফগানিস্তানের মুক্তির সঙ্গে জড়িত। তাই আবদুল গফর একদিকে যেমন সর্বভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তেমনি আফগানিস্তানের রাজনীতি সম্পর্কেও তিনি উদাসীন থাকতে পারেন নি।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে কলকাতায় যে খিলাফত-সম্মেলন হলো আবদুল

গফর তাতেও যোগ দিলেন। এখানে তাঁর একটি কুৎসিত অভিজ্ঞতা হলো। মওলানা মহম্মদ আলি ও সওকত আলির সঙ্গে পাঞ্জাবের মুসলিম নেতাদের মতদ্বৈধ দেখা দিয়েছিল। সভামঞ্চে মহম্মদ আলির পাশেই আবদুল গফর বসে ছিলেন। একজন পাঞ্জাবী মুসলিম নেতা মহম্মদ আলির সমালোচনা করলে মহম্মদ আলি ক্ষিপ্ত হয়ে বক্তাকে যথেচ্ছ ভাষায় গালাগালি করতে লাগলেন। তখন আর একজন পাঞ্জাবী নেতা তিনি হঠাৎ ছোরা বার করে মহম্মদ আলিকে তীব্রভাষায় আক্রমণ করলেন। মঞ্চে তুমুল হৈচৈ বেধে গেল। আবদুল গফরের সঙ্গীরা শেষ পর্যন্ত মহম্মদ আলিকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

ঐ সময় কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনও চলছিল। খিলাফত-সম্মেলনে এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর আবদুল গফর কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিলেন। এখানে তাঁর সম্পূর্ণ অন্য ধরনের অভিজ্ঞতা হলো। বিষয়নির্বাচনী সমিতিতে গান্ধীজী ভাষণ দিচ্ছিলেন। একজন উদ্ধত যুবক বারবার তাঁর ভাষণে বাধা দিচ্ছিল ও সমালোচনামূলক নানা মন্তব্য করছিল। কিন্তু গান্ধীজী তাতে ক্রুদ্ধ হওয়া দূরের কথা, অনেক সময় হাসিতে ফেটে পড়লেন এবং নিজের ভাষণ দিতে লাগলেন। মহম্মদ আলির ও মহাত্মা গান্ধীর দুটি বিপরীত চিত্র পাশাপাশি দেখে আবদুল গফর বিস্মিত হলেন এবং ঘটনার কথা তাঁর পাখতুন সহকর্মীদের কাছে বললেন। পাখতুন সহকর্মীরা মহম্মদ আলির বাড়িতে গিয়ে বললেন, "আপনি আমাদের নেতা; আপনার মর্যাদাবৃদ্ধিই আমাদের কাম্য। আপনি যদি একটু সহিষ্ণুতা ও সংযম দেখান, তা হ'লে কতোই না ভালো হয়!" শুনেই মহম্মদ আলি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, বললেন, "জংলী পাঠানরা এসেছে মহম্মদ আলিকে আদবকায়দা শেখাতে!" বলেই তিনি ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। আবদুল গফর এর পর আর খিলাফত-সম্মেলনে যোগ দেননি।

নাদির খানের পক্ষে সমর্থন সংগ্রহের জন্যে খান আবদুল গফর পাঞ্জাবেও গেলেন। তিনি পাঞ্জাবে বিখ্যাত কবি মহম্মদ ইকবাল ও কয়েকজন নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। লাহোর থেকে তিনি গেলেন লখ্‌নৌ। এখানে ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন চলছিল। এখানেই সর্বপ্রথম গান্ধীজী ও জওহরলালজীর সঙ্গে আবদুল গফরের ব্যক্তিগত পরিচয় হয়। ডাঃ খান্ সাহেবের সঙ্গে জওহরলালজীর বন্ধুত্ব ছিল। তাই আবদুল গফর দাদার কাছ থেকে একটি পরিচয়পত্র এনেছিলেন। আফগানিস্তান সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ

আলাপ হ'লো। লখ্‌নৌ থেকে আবদুল গফর গেলেন দিল্লী। এর পর তিনি স্বগ্রামে ফিরে গেলেন।

এই সময় হঠাৎ তিনি নাদির খানের কাবুলজয়ের সংবাদ পেলেন। স্থির হলো, উটমনজাইয়ে নাদির খানের এই বিজয়-উৎসব তাঁরা পালন করবেন। হস্তনগরের দক্ষিণপ্রান্ত থেকে একটি ও উত্তরপ্রান্ত থেকে একটি,—দুটি বিরাট মিছিল এসে উটমনজাইয়ে মিলিত হবে। হলোও তাই। বিশাল সমাবেশে নাদির খানের বিজয়োৎসব পালিত হলো। এই সুবিশাল জনসমাবেশে আবদুল গফর বললেন:

দুটি উপায়ে জাতির অগ্রগতি হতে পারে—এক, ধর্ম ; দুই, দেশপ্রেম। আমেরিকা ও ইউরোপ ধর্মের দিক্‌টা অবহেলা করেছে, কিন্তু তারা জাতীয়তাবোধে পূর্ণ। তাই তারা উন্নতি করেছে। আমাদের অবনতির কারণ, আমরা ধর্মীয় ও জাতীয় দুই দিকেই পেছনে পড়ে আছি। এক বিরাট বিপ্লব আসছে, কিন্তু আমরা সে সম্পর্কে আদৌ সচেতন নই। ভারতীয় উপমহাদেশে আমার সাম্প্রতিক সফরে আমি দেখেছি, সেখানে জাতির সেবার জন্যে কি পুরুষ কি নারী সকলেই পূর্ণভাবে প্রস্তুত। কিন্তু নারী তো দূরের কথা, আমাদের দেশের, আমাদের জাতির স্বার্থ কি, তা পুরুষরাও জানে না। বিপ্লব একটি বন্যার মতো। এর দ্বারা কোন জাতি উন্নতি করতে পারে, আবার কোন জাতি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। যে জাতি সদা-জাগ্রত, পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ, জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ, তারা বিপ্লবের দ্বারা নিশ্চিত উপকৃত হবে ; যে জাতির এইসব গুণ নেই, সে জাতি বন্যায় ভেসে যাবে। কোনও উন্নত জাতি আকাশ থেকে পড়েছে, তা যদি মনে করো, তবে সে ধারণা তোমাদের ভুল। যে জাতি এমন মানুষের জন্ম দিয়েছে যারা নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, নিজেদের সামাজিক মর্যাদা ও ভবিষ্যৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাতির অগ্রগতির জন্যে বিসর্জন দেয়, সেই জাতিই উন্নতি করে। কোনও জাতি যখন উন্নত হয়, তখন সকল নাগরিকই উপকৃত হয়। আমরা কেবল নিজের লাভটাই দেখি। কেবল নিজের অস্তিত্বের কথা পশুরাই ভাবে। জন্তুজানোয়ারেরা নিজেদের বাসা তৈরি করে, নিজেদের সঙ্গিনী যোগাড় করে, নিজেদের বাচ্চা লালন করে। আমরাও যদি তাই করি, তবে আমরা পশুদের চেয়ে উন্নত কিসে?

আবদুল গফরের এই ভাষণ সমবেত জনতার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করলো। পরদিন একটি যুবক এসে বললো, তারা পাখতুন সমাজের সেবা ও পাখতুন সমাজকে সংস্কারমুক্ত করবার জন্যে একটি সংগঠন গড়ে তুলতে চায়। পাখতুনসমাজে শিক্ষাবিস্তারের জন্যে 'আন্‌জুমান ইস্‌লাহ্-উল্-আফাগিনা' একটি সংস্থা তাঁরা আগেই গড়েছিলেন। নূতন সংগঠনের কাজ হবে ব্যাপকতর সমাজসেবা ও সমাজসংস্কার। এ নিয়ে অনেক আলোচনা হ'লো। পাখতুনদের মধ্যে যে আত্মঘাতী দ্বন্দ্ববিরোধ ও কুসংস্কার আছে, তা দূর করাই হবে এই সংস্থার লক্ষ্য। অবশেষে ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি নূতন সংস্থা স্থাপিত হলো—আবদুল গফর এর নাম দিলেন "খুদাই খিদমতগার" বা খোদার সেবক। ভগবানের নামে সমাজের ও দেশের সেবার মনোভাব পাখতুনদের মধ্যে জাগিয়ে তোলাই হলো খুদাই খিদমতগার সংস্থার আদর্শ। পাখতুনরা হিংসায় অভ্যস্ত, আবার সে হিংসা বিদেশীর বিরুদ্ধে নয়, নিজেদের ভাইয়ে ভাইয়ে। কতো আপন জনই না এই হিংসার বলি হয়েছে! বিবাদ-বিসংবাদ, বিদ্বেষ, হিংসা, প্রতিহিংসা পাখতুন সমাজকে ছিন্নভিন্ন করেছে। খুদাই খিদমতগার তাদের ঐক্যবদ্ধ করবে।

কেউ খুদাই খিদমতগার হ'তে হ'লে তাকে শপথ নিতে হয়:

আমি একজন খুদাই খিদমতগার, খোদার সেবক; খোদার নিজের সেবার কোন প্রয়োজন নেই। তাই নিঃস্বার্থভাবে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবা করেই আমি তাঁর সেবা করব। আমি কখনও হিংসার আশ্রয় নেব না। আমি প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা নেব না। কেউ আমার উপর অবিচার বা অত্যাচার করলে আমি তাকে ক্ষমা করব। আমি কোনও পারিবারিক দ্বন্দ্বে, ষড়যন্ত্রে ও বৈরিতায় লিপ্ত হব না। প্রত্যেক পাখতুনকে আমি আমার ভাই ও বন্ধু মনে করব। আমি ক্ষতিকর সংস্কার ও অভ্যাস ত্যাগ করব। আমি অনাড়ম্বর সরল জীবন যাপন করব, অপরের মঙ্গল করব, অন্যায় কার্য থেকে বিরত থাকব। আমি সৎ চরিত্র, সৎ অভ্যাস গড়ে তুলব। আমি অলস জীবন যাপন করব না। আমার সেবার জন্য আমি কোনও পুরস্কার প্রত্যাশা করব না। আমি নির্ভীক হব এবং সকল ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকব।

এইভাবে খুদাই খিদমতগার সংগঠন গ'ড়ে উঠলো। আবদুল গফর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ালেন। তাঁর সঙ্গীরা দেখলেন, এই সফরকালে তাঁদের সাদা পোশাক সহজেই নোংরা হয়ে যাচ্ছে। তাই তাঁরা তাঁদের পোশাক রং

করে নেবেন স্থির করলেন। তাঁদের একজন ট্যানারিতে চামড়া ডুবাবার জন্যে পাইনছালের যে রস ছিল, তাতে তাঁর পোশাক ডুবিয়ে দিলেন। পোশাকটা সঙ্গে সঙ্গে গাঢ়•লাল হয়ে গেল। তাঁর দেখাদেখি অন্যরাও ঐ ভাবে তাঁদের পোশাক রাঙিয়ে নিলেন। এই রং সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তাই সেদিক থেকেও খুবই উপযোগী হয়ে উঠলো। লাল পোশাক-পরা মানুষ দেখলেই লোকে বুঝতো, এরা খুদাই খিদমতগার। লোকে দলে দলে ছুটে আসতো। আবদুল গফর তাই খুদাই খিদমতগার সংস্থার উর্দি বা ইউনিফর্ম করলেন লাল। এইভাবে খুদাই খিদমতগাররা "লাল কোর্তা" নামেই পরিচিত হলো।

খুদাই খিদমতগাররা বন্দুক, পিস্তল, তরবারি, ছোরা, এমন কি এক গাছা লাঠিও ব্যবহার করতেন না। তাঁরা ছিলেন কঠোরভাবে অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত। কিন্তু খুদাই খিদমতগারদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা সৈন্যবাহিনীর চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। তাঁদের নিয়মিত কুচকাওয়াজ করা ও দীর্ঘ পথ মার্চ করে অতিক্রম করতে হতো। আবদুল গফর খুদাই খিদমতগার বাহিনীর গঠনে যে সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা ছিল বিস্ময়কর। সীমান্ত-প্রদেশের প্রতি গ্রামে তিনি খুদাই খিদমতগারদের জিরগা গঠন করেন। কতকগুলি ক'রে গ্রাম নিয়ে গঠিত হয় এক-একটি টপ্পা কমিটি। টপ্পা কমিটির উপর তহসিল ও জেলা কমিটি। কমিটিগুলির উপর প্রাদেশিক কমিটি। প্রাদেশিক কমিটিই ছিল প্রকৃতপক্ষে পাখতুনদের বেসরকারী সংসদ। আবদুল গফর ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে পূর্ণ বিশ্বাসী হলেও খুদাই খিদমতগারদের সাংগঠনিক কর্তারা ভোটে নির্বাচিত হতেন। কারণ, খুদাই খিদমতগার সংস্থা ছিল অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত একটি সৈন্যবাহিনী। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সেনানায়ক নির্বাচনের ব্যাপারে ভোটাভুটির ব্যবস্থা করলে, তাতে দলাদলি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাই এই খুদাই খিদমতগারদের সাংগঠনিক কর্মকর্তারা উপর থেকেই নিযুক্ত হলেন। আবদুল গফর নিজেই এই সংগঠনের সলার-এ-আজম বা প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করতেন। প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করতেন বিভিন্ন দলের অধস্তন সেনানায়কদের।

খুদাই খিদমতগার অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত হলেও কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে তখনো যুক্ত ছিল না। এঁদের উৎসাহী অনেকেই কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতেন, সর্বভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত হতেন, কংগ্রেসের কর্মসূচীকে

কার্যে রূপায়িত করতে চেষ্টা করতেন। পেশোয়ার প্রভৃতি স্থানে যে কংগ্রেস কমিটিগুলি গড়ে উঠেছিল, সেগুলিও এঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করতো। আবদুল গফর খিলাফত-সম্মেলনের সদস্য ছিলেন। কলকাতায় খিলাফত-সম্মেলনে নেতাদের হাতাহাতি তাঁকে খিলাফত-সম্মেলন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ ক'রে তুলেছিল। পরে তিনি খিলাফত-সম্মেলনেরও সদস্যপদ ত্যাগ করেন। এই সময়ে তাঁর নীতি ছিল এই যে, যে-ই পাখতুন জাতি তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবে, তা কংগ্রেসই হ'ক বা মুসলিম লীগই হ'ক, তারাই তাঁর ও খুদাই খিদমতগারদের সমর্থন পাবে। কিন্তু এই নীতি দীর্ঘদিন স্থায়ী হলো না।

৮

স্বাধীনতা-সংগ্রাম : কারাবাস : সীমান্তে বৃটিশের বর্বরতা

১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে তরুণ নেতারা দাবি তুলেছিলেন, স্বরাজ বা ডোমিনিয়ন স্টেটাস নয়, পূর্ণ স্বরাজ বা স্বাধীনতাই কংগ্রেসের সংগ্রামের লক্ষ্য ব'লে ঘোষিত হ'ক। পুরাতনপন্থী নেতারা এর বিরোধী ছিলেন, তাঁরা বললেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস পাওয়াই সংগ্রামের লক্ষ্য, এর বেশি অগ্রসর হ'তে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। এই নিয়ে পুরাতনপন্থী ও নব্যপন্থীদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর চেষ্টায় উভয়পক্ষে একটি আপোস হলো। যদি ইংরেজ সরকার এক বৎসরের মধ্যে ভারতকে স্বরাজ বা ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেয়, তবে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজ বা স্বাধীনতার দাবী তুলবে না। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে ইংরেজ-সরকার যদি ভারতকে স্বরাজ না দেয়, তবে কংগ্রেস ভারতের পূর্ণ স্বরাজ বা স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম শুরু করবে। সেই এক বৎসরের মেয়াদ পূর্ণ হ'তে চললো, কিন্তু ইংরেজ সরকার ভারতকে স্বরাজ বা ডোমিনিয়ন স্টেটাস দিলো না। এখন স্বাধীনতাই কংগ্রেসের লক্ষ্য, একথা ঘোষণা করবার সময় এলো।

১৯২৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর ভারতের নেতাদের সঙ্গে বড়লাট লর্ড

আরুইনের আলোচনার কথা ছিল। ঐদিন দিল্লীতে ফেরার পথে বড়লাটের ট্রেনে যাত্রাকালে রেলপথে বোমা বিস্ফোরণ ঘটলো। তবে লর্ড আরুইন নিরাপদে দিল্লীতে পৌছলেন। লর্ড আরুইন দিল্লীতে পৌছলে গান্ধীজী, মতিলাল নেহরু, বিঠলভাই প্যাটেল, তেজ বাহাদুর সপ্রু ও জিন্না তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হলো। তারপর বড়লাট আসল বিষয়ের আলোচনা সম্পর্কে বললেন, "আমরা কিভাবে আরম্ভ করবো ? আমরা কি বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন দিয়ে শুরু করব ?"

ঐ সময়ে ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্যে লণ্ডনে একটি গোল টেবিল বৈঠক হওয়ার কথা চলছিল। গান্ধীজী তাই সরাসরি বড়লাটকে জিজ্ঞাসা করলেন, লণ্ডনে যে গোল টেবিল বৈঠক হচ্ছে তা ডোমিনিয়ন স্টেটাসের ভিত্তিতে হবে কিনা। বড়লাট জানালেন, সে সম্পর্কে তিনি কোনও নিশ্চিত ভরসা দিতে পারছেন না। গান্ধীজী বললেন, তবে আলোচনায় লাভ নেই। কারণ, কংগ্রেসের ন্যূনতম দাবি স্বরাজ বা ডোমিনিয়ন স্টেটাস।

১৯২৯ সালের বড়দিনের সময়ে লাহোরের উপকণ্ঠে রাবী নদীর তীরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসলো। এই অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ত্রিশ হাজার প্রতিনিধি ও দর্শক যোগ দিয়েছিলেন। আবদুল গফরের নেতৃত্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকেও বহু দর্শক এই সম্মেলনে এসেছিলেন। জিন্না দীর্ঘকাল কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। মওলানা মহম্মদ আলি ও সওকত আলির সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক ভালো না থাকলেও তাঁরাও এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তরুণ জওহরলাল নেহরুই লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁকে হাজার হাজার নরনারী এক বিরাট মিছিল ক'রে অশ্বপৃষ্ঠে কংগ্রেসের অধিবেশন-মঞ্চে যখন আনলো, তখন জয়ধ্বনিতে কংগ্রেসের সারা অধিবেশন-প্রাঙ্গণ ফেটে পড়লো। তিনিই কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি প্রথম ঘোষণা করলেন :

"আমাদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ হলো বৃটিশ শাসন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ।" গান্ধীজী ঘোষণা করলেন : "এখন থেকে কংগ্রেস সংবিধানে 'স্বরাজ' শব্দের অর্থ হবে পূর্ণ স্বরাজ বা স্বাধীনতা।" সেই সঙ্গে তিনি এই প্রস্তাবও আনলেন যে, "বর্তমান অবস্থায় প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি পাঠিয়ে কোনও লাভ হবে না। স্বাধীনতা-সংগ্রামের অভিযানকে সুসংগঠিত করবার প্রথম পদক্ষেপ রূপে এবং পরিবর্তিত

আদর্শের সঙ্গে কংগ্রেসের নীতিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করবার জন্যে কংগ্রেস আইনসভা-সমূহ ও সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটিসমূহ বর্জন করতে এবং কংগ্রেসকর্মী ও অন্যান্য সকলকে ভবিষ্যৎ নির্বাচনসমূহ বর্জন করতে 'এবং বর্তমানে যাঁরা ঐরূপ সংস্থার সদস্য আছেন তাঁদের পদত্যাগ করে জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে আবেদন জানাচ্ছে। এই কংগ্রেস জাতির নিকট কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্মসূচীকে উদ্দীপনার সঙ্গে কার্যকর করতে আহ্বান জানাচ্ছে এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে, তাঁরা যেখানে উপযুক্ত বিবেচনা করবেন, তা কোন সুনির্বাচিত এলাকায় হ'ক বা অন্য কোথাও হ'ক, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদির দ্বারা খাজনা-বন্ধ সহ আইন-অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচীকে কার্যকর করবার অধিকার দিচ্ছে।"

এইভাবে কংগ্রেস কেবল ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতাই দাবি করলো না, স্বাধীনতা-সংগ্রামের সূচনাও করলো। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রি বারোটার পর যখন ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের নববর্ষ এলো, তখন রাবী নদীর তীরে নক্ষত্রখচিত শীতের আকাশের নিচে কংগ্রেসের সভাপতি জওহরলাল নেহরু অসংখ্য মানুষের 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা প্রথম উড্ডীন করলেন। সীমান্ত-প্রদেশের স্বেচ্ছাসেবকরা আনন্দে অধীর হয়ে নাচতে লাগলেন। জওহরলালও পাঠানদের পাগড়ি পরে তাঁদের সঙ্গে নাচলেন। সীমান্ত-প্রদেশের স্বেচ্ছাসেবকরা যে ভোজ দিলেন, তাতে জওহরলাল ও তাঁর পত্নী কমলাও যোগ দিলেন। লাহোর সীমান্ত-প্রদেশের কাছে হওয়ায় বহু পাঠান এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা এই অধিবেশন থেকে এক নূতন উদ্দীপনা ও প্রাণশক্তি নিয়ে নিজ নিজ প্রদেশে ফিরলেন। কংগ্রেস-ঘোষিত এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণের সংকল্প নিয়ে তাঁরা দেশে ফিরলেন। মওলানা মহম্মদ আলি ও সওকত আলি স্বাধীনতার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরা বলেছিলেন, তাঁরা কংগ্রেসের এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন এই কথা জানাতে যে, ভারতের মুসলমানরা এই সংগ্রামে যোগ দেবে না। ডাঃ আনসারিও এই সংগ্রামের পরিণাম সম্পর্কে সন্দেহ করেছিলেন। একমাত্র মওলানা আজাদই কংগ্রেসের স্বাধীনতা-প্রস্তাব ও সংগ্রামকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন। আবদুল গফর ও তাঁর সহকর্মীরা মুসলিম নেতাদের এই ভীরুতা ও ইংরেজ-তোষণের নীতিতে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। মুসলিম নেতারা সংগ্রামের পথ পরিহার ক'রে ভারতীয়

মুসলমানদের উপর যে কলঙ্ক আরোপ করেছেন, তা দূর করবার জন্যেই যেন পাঠানরা শতগুণ উৎসাহে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

আবদুল গফর খুদাই খিদমতগারদের সঙ্গে কখনও পদব্রজে কখনও অশ্বপৃষ্ঠে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ালেন। তিনি পাঠানজাতিকে তাদের গৌরবময় অতীত ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিলেন; বললেন, তারা নির্ভীক, মৃত্যুকে তারা ভয় করে না, তবু পাঠানরা আজ পদানত কেন, কেন তাদের এই দুঃখ-দৈন্য। তার মূল কারণ তাদের আত্মঘাতী কলহ। তিনি বললেন, আজ তাদের রক্তাক্ত কলহ ত্যাগ করতে হবে, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে, স্ত্রীজাতির প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে, বিবাহের জন্যে অকারণ অর্থব্যয় পরিহার করতে হবে, মামলামোকদ্দমা ছাড়তে হবে, সংঘবদ্ধ হ'তে হবে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। আবদুল গফর সীমান্ত-প্রদেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত প্রতি গ্রামে গ্রামে বারবার ঘুরলেন। সর্বত্রই মানুষ তাঁর পতাকাতলে এসে সমবেত হ'লো। তরুণরা দলে দলে খুদাই খিদমতগার দলে যোগ দিলো। আন্দোলন উপজাতীয় অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়লো।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি সারা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই সীমান্ত-প্রদেশেও স্বাধীনতা-দিবস মহা উদ্দীপনায় উদ্‌যাপিত হলো। পাঠানরা হাজারে হাজারে স্বাধীনতার শপথবাক্য পাঠ করলো।

আবদুল গফর ও তাঁর সহকর্মীদের পেছনে সর্বদাই গোয়েন্দা নিযুক্ত ছিল। অনেক সময় তাঁর সভায় সশস্ত্র বাহিনীও উপস্থিত থাকতো। জনসাধারণের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে তারা স্তম্ভিত হয়ে গেল। হিংসায় ও আত্মকলহে লিপ্ত পাঠানজাতি কী জাদুদণ্ডস্পর্শে এইভাবে রাতারাতি রূপান্তরিত হয়ে গেল, তা তাদের বোধগম্য হ'লো না। সীমান্ত-প্রদেশের চীফ কমিশনার মিঃ মেটকাফ আবদুল গফরকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে তাঁর কাজ বন্ধ করতে হুকুম করলেন। আবদুল গফর বললেন, তিনি যা করছেন তা মূলতঃ সামাজিক আন্দোলন; এতে সরকারের সাহায্য করা উচিত। মিঃ মেটকাফ বললেন, "এখন হয়তো সামাজিক স্তরেই এই আন্দোলন আছে, কিন্তু এই আন্দোলন যে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হবে না, তার নিশ্চয়তা কি?" আবদুল গফর বললেন, "পারস্পরিক বিশ্বাসের মধ্যে সে নিশ্চয়তা থাকতে পারে। আমি দেখছি, বিপ্লবের বন্যা আসছে। আমি পাঠানজাতিকে প্রস্তুত করছি, তারা যাতে সে বন্যায় ভেসে না যায়!"

১২মার্চ (১৯৩০) গান্ধীজী সবরমতী আশ্রম থেকে তাঁর বিখ্যাত ডাণ্ডি অভিযান শুরু করলেন। এপ্রিল মাসের গোড়াতেই সারা দেশে শুরু হলো লবণ সত্যাগ্রহ। আইন-অমান্য, বিদেশীপণ্য বর্জন প্রভৃতি ছিল এই আন্দোলনের অঙ্গ। ১৪ই এপ্রিল কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট জওহরলাল নেহরু গ্রেপ্তার হলেন। লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তার প্রভৃতি সরকারী দমনব্যবস্থা কঠোরভাবে চললো। ১৮ই ও ১৯শে এপ্রিল উটমনজাইয়ে খুদাই খিদমতগারদের একটি সম্মেলন আহূত হলো। এই সম্মেলনে আইন-অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচীকে কার্যে রূপায়িত করতে পাখতুনদের আহ্বান জানানো হলো। ২৩শে এপ্রিল তারিখে আবদুল গফর উটমনজাইয়ে এক জনসভায় দেশবাসীকে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্যে আহ্বান জানালেন। তারপর তিনি মোটরে ক'রে পেশোয়ার রওনা হলেন। কিন্তু পথে নাকি থানায় পুলিস তাঁকে গ্রেফতার করলো। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আফগান যুবসংঘের সেক্রেটারি মিঞা আমেদ শাহ্, প্রেসিডেণ্ট আবদুল আকবর খান্ ও সভার সংগঠক সলার সরফরাজ খান্ ও শাহ্ নওয়াজ খান্। তাঁরাও গ্রেফতার হলেন। নাকি থানার অধিবাসীরা তাদের এলাকায় বাদশা খান্কে গ্রেফতার করায় ক্রুদ্ধ হয়ে ঘোষণা করলো যে, তারা এখন থেকে সকলেই খুদাই খিদমতগার-সংস্থায় যোগ দিচ্ছে।

আবদুল গফর ও তাঁর সঙ্গীদের পুলিস ভ্যানে করে মর্দানে নিয়ে যাওয়া হলো। পথে জনসাধারণ রাস্তার উপর শুয়ে পড়ে পুলিস ভ্যান আটকালে আবদুল গফর তাঁদের শান্তিপূর্ণ থাকতে এবং পুলিসের গাড়ির পথ ছেড়ে দিতে অনুরোধ জানালেন। সন্ধ্যায় তাঁদের মর্দান জেলে আনা হলো। পরদিন তাঁদের রিসলপুরে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করলে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁদের সকলকেই সীমান্ত অপরাধ আইনের ৪০ ধারা অনুসারে তিন বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। তারপর তাঁদের পাঞ্জাবের গুজরাট জেলে স্থানান্তরিত করা হলো।

কিন্তু ২৩শে এপ্রিল তারিখে, আবদুল গফরের গ্রেফতারের দিন, পেশোয়ারে আগুন জ্বললো। পোশোয়ারের ঘটনার তদন্তের জন্যে সরকার একটি তাঁবেদার কমিশন নিযুক্ত করেছিল। কিন্তু কংগ্রেস বিঠলভাই প্যাটেলের সভাপতিত্বে একটি পৃথক তদন্ত কমিশন নিয়োগ করলো। এই কমিশনকে সরকার সীমান্ত-প্রদেশে প্রবেশ করতে না দিলে কমিশন রাওলপিণ্ডিতে থেকেই সপ্তাহকাল ধরে বিভিন্ন সূত্রে তথ্য ও সাক্ষ্য সংগ্রহ ক'রে একটি বিবরণ পেশ করেন। এই

বিবরণ সঙ্গে সঙ্গে সরকার নিষিদ্ধ ক'রে দিলেও তা গোপনে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং সীমান্ত-প্রদেশে সরকারী অত্যাচারের বীভৎস চিত্র দেশে-বিদেশে কারও অজ্ঞাত থাকে না। এই বিবরণ অনুসারে পেশোয়ারের ঘটনা এই রকম :

১৯৩০ সালের ৫ই এপ্রিল পেশোয়ারের স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি স্থির করলেন যে, তাঁরা পেশোয়ারের মদের দোকানগুলিতে পিকেটিং করবেন। কোন কোন মদ্যব্যবসায়ী তাঁদের কাছে মজুত যে মাল আছে তা বিক্রি করবার জন্যে ১৫ দিন সময় চাইলেন। কংগ্রেস কমিটি তাঁদের ২২শে এপ্রিল পর্যন্ত সময় দিলেন। স্থির হলো, ২৩শে এপ্রিল থেকে পিকেটিং শুরু হবে। সীমান্ত অপরাধ আইনের যথেচ্ছ প্রয়োগ সম্পর্কে তদন্তের জন্যে কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধিদল সীমান্ত-প্রদেশে যাচ্ছিলেন। ২২শে এপ্রিল সকালে তাঁদের আটকানো হলো এবং সীমান্ত-প্রদেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হলো না। এই সংবাদ পেশোয়ারে পৌছলে সরকারের এই কাজের প্রতিবাদে শহরে একটি বিরাট মিছিল বার করা হলো এবং সন্ধ্যায় শাহীবাগে এক বিশাল জনসভায় সরকারী কাজের নিন্দা করা হলো; পরদিন সকাল থেকে মদের দোকানগুলিতে পিকেটিং শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'লো। ঐদিন শেষরাত্রিতে সরকার পেশোয়ারের ন জন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মীকে গ্রেফতার করলেন। সকালে কংগ্রেসকর্মীরা এই গ্রেফতারের সংবাদ পেয়ে কংগ্রেসের অফিসে এসে সমবেত হ'লেন এবং পূর্বনির্ধারিত পিকেটিংও শুরু হলো। শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল হলো। যেসব স্বেচ্ছাসেবক পিকেটিংয়ের জন্য যাচ্ছিলেন, তাঁদের অভিনন্দন জানাবার জন্যে বহুলোক কংগ্রেস অফিসের সম্মুখে ভীড় করেছিল। সকাল ন'টায় কিছু পুলিস সঙ্গে নিয়ে একজন দারোগা কংগ্রেস অফিসে এলো এবং জানালো যে, আরও দুজন কংগ্রেসনেতার নামে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা আছে। ঐ দুইজন নেতা অফিস থেকে বেরিয়ে এসে পুলিসের গাড়িতে বসলেন। তাঁদের নিয়ে পুলিসের গাড়ি চলে গেল। কিছুপথ যাওয়ার পর পুলিসের গাড়ির চাকার টায়ার ফেটে গেলে গাড়ি অচল হলো। তখন বন্দী নেতারা বললেন, দারোগার আপত্তি না থাকলে তাঁরা স্বেচ্ছায় থানায় গিয়ে হাজির হবেন। দারোগা সম্মত হয়ে চলে গেলেন। তখন জনসাধারণ নেতাদের নিয়ে মিছিল ক'রে কাবুলী গেট থানায় পৌছলো। থানার গেট বন্ধ করা ছিল। অনেক চেঁচামেচিতেও থানার গেট খুললো না। সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘোড়ায় চড়ে এসে পৌছলে

জনতা জাতীয়তাবাদী ধ্বনি দিতে লাগলো। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ভেতরে চলে গেলেন। যে দারোগা নেতাদের গ্রেপ্তার করেছিলেন, তিনি জনতাকে শান্তিপূর্ণ থাকতে অনুরোধ করলেন এবং নেতারা থানার ভেতরে গেলেন। তখন জনতা 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' ও 'মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়' ধ্বনি দিতে দিতে চলে যেতে লাগলো। এই সময় হঠাৎ পেছন থেকে দু-তিনটি সাঁজোয়া গাড়ি এসে জনতাকে সতর্ক না ক'রেই জনতার ওপর দিয়ে চললো। অনেকেই গাড়ির তলায় পড়লো, কয়েকজন সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল ও অনেকে আহত হলো। লোকে সাঁজোয়াগাড়িগুলিকে থামবার জন্তে কাকুতিমিনতি করলো। ভীড় জমে গেলো। এই সময়ে একজন ইংরেজ মোটরসাইকেলে ক'রে দ্রুতগতিতে আসছিল। মোটরসাইকেল সাঁজোয়া গাড়িতে ধাক্কা দিলো। ইংরেজটি মোটর সাইকেল থেকে পড়ে গেল এবং সাঁজোয়া গাড়ি তার উপর দিয়ে চলে গেল। গাড়ির ভেতর থেকে গুলী চালানো হলো। দৈবাৎ একটি সাঁজোয়া গাড়িতে আগুন লেগে গেল। ডেপুটি কমিশনার তাঁর সাঁজোয়া গাড়ি থেকে বেরিয়ে থানায় চলে গেলেন এবং সিঁড়িতে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাঁজোয়া গাড়ির লোকদের গুলী চালাতে আদেশ দিলেন। গুলী চালনার ফলে কয়েকজন হতাহত হলো এবং জনতাকে দূরে ঠেকিয়ে রাখা গেল। বাইরের কিছু লোক জনতাকে চ'লে যেতে ও কর্তৃপক্ষকে সৈন্ত ও সাঁজোয়া গাড়িগুলি সরাতে অনুরোধ করলেন। কর্তৃপক্ষ সৈন্ত ও সাঁজোয়া গাড়ি সরিয়ে নিলে এবং মৃত ও আহত ব্যক্তিদের নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিলে জনতা চলে যেতে রাজী হলো। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সৈন্ত ও সাঁজোয়া গাড়ি সরাতে চাইলো না। ফলে জনতা স্থান ত্যাগ করলো না, গুলীতে প্রাণ দেওয়ার সংকল্প নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তখন গুলীচালনা শুরু হলো। এই গুলীচালনা কয়েক দফায় তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চললো। আনুমানিক দু-তিন শ লোক নিহত ও আরও অনেক বেশিসংখ্যক লোক আহত হ'লো। পাঁচ-ছ জন খিলাফত স্বেচ্ছাসেবক যারা মৃত ও আহতদের সরাবার কাজে ব্যস্ত ছিল, তারাও নিহত হলো। সরকার আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার কোনও সুযোগ দিল না। সন্ধ্যায় পুলিস কংগ্রেস অফিসে হানা দিলো। পরবর্তী দু-তিন দিন পেশোয়ারে সৈন্তবাহিনীর তাণ্ডব চললো। হঠাৎ কর্তৃপক্ষ শহর থেকে পুলিস ও সৈন্তবাহিনী সরিয়ে নিলো। ফলে সীমান্তের ওপার থেকে হানাদার ও দস্যুর দল শহরে এসে লুঠতরাজ শুরু করলো। কংগ্রেস ও খিলাফত

স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী মিলিতভাবে শহররক্ষা করতে লাগলো। ২৮শে এপ্রিল আবার পুলিস পৌছল এবং কংগ্রেস ও খিলাফত স্বেচ্ছাসেবকদের কাছ থেকে শহররক্ষার ভার নিলো। ৪ঠা মে তারিখে, হঠাৎ সামরিক বাহিনী পেশোয়ার শহর দখল করলো। ঐদিন সকালে সৈন্যরা কংগ্রেস ও যুবসংঘের অফিস-গুলিতে হানা দিলো এবং কংগ্রেস অফিসের পাশের দোকান লুঠ করলো। ঐদিন থেকে পেশোয়ারে কার্যত সামরিক শাসন চললো। জীবন, স্বাধীনতা বা সম্পত্তির নিরাপত্তা আর রইলো না। ৩১শে মে তারিখে ইংরেজ সৈন্যের গুলীতে নিহত দুটি শিশুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে যে মিছিল বেরিয়েছিল, সৈন্যদল তার উপর আবার গুলী চালালো। ঐদিন গুলীচালানোর ফলে কমপক্ষে দশজন নিহত ও বাইশজন আহত হয়েছিল। এইভাবে পেশোয়ারে সন্ত্রাসের রাজত্ব চললো। পেশোয়ারে এই গোলযোগের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক ছিল, গাড়োয়াল রাইফল্‌স্ বাহিনীর একটি পল্টনের নিরস্ত্র জনতার উপর গুলীচালনায় অসম্মতি। এই অসম্মতির ফলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার ও নিরস্ত্র করা হ'লো এবং সামরিক আইনে তাদের বিচার হ'লো। বিচারকালে এইসব নির্ভীক সৈন্য বললো : "আমরা আমাদের নিরস্ত্র ভাইদের ওপর গুলী চালাব না। কারণ ভারতীয় সৈন্যদল ভারতের বাইরের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে। আপনারা ইচ্ছা করলে তোপের মুখে আমাদের উড়িয়ে দিতে পারেন।" বিচারে সতের জন সৈনিকের দণ্ড হ'লো—একজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, একজনের পনের বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, অন্যান্যদের তিন থেকে দশ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড।

কেবল পেশোয়ার শহরে নয়, পেশোয়ার জেলার অন্যান্য স্থানে এবং সীমান্ত-প্রদেশের অন্যান্য জেলাতেও ইংরেজ সরকারের বীভৎস তাণ্ডবলীলা চলতে লাগলো। আবদুল গফরের স্বগ্রাম উটমনজাইয়েও ইংরেজ সরকার বর্বরতার চূড়ান্ত করলো।

আবদুল গফরের গ্রেফতারের পরদিন উটমনজাইয়ে একটি জনসভা হলো। তাদের প্রিয় নেতার গ্রেফতারে যে ক্ষোভ, ক্রোধ ও উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল, তাতে গোলযোগ ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় ডাঃ খান্ সাহেব পেশোয়ার থেকে দ্রুত স্বগ্রামে চলে এলেন এবং সমবেত সবাইকে শান্তিপূর্ণ ও অহিংসভাবে আন্দোলন চালাতে অনুরোধ করলেন। তিনি যার কাছে যা অস্ত্রশস্ত্র ছিল, সব নিয়ে নিলেন। তিনি নিজে সভায় বক্তৃতা করলেন এবং জনসাধারণকে

সকল অত্যাচার উপেক্ষা করে অহিংস অটল ও অবিচল থাকতে ও চরম সহিষ্ণুতা ও ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হতে বললেন। ডাঃ খান্ সাহেবের জীবনে এই প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতা। ডাঃ খান্ সাহেবের বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন এসে সংবাদ দিলো গাইড্স্ অশ্বারোহীবাহিনী এসে পৌছেছে। ডাঃ খান্ সাহেব ফৌজ আসবার কথা ঘোষণা ক'রে বললেন, যারা চরম বিপদের সম্মুখীন হতে ভয় পায়, তারা যেন অবিলম্বে সভাস্থল থেকে চলে যায়। কিন্তু একটি মানুষও নড়ল না। ডাঃ খান্ সাহেব লালকোর্তাদের সভামঞ্চে এসে দাঁড়াতে বললেন। অশ্বারোহীবাহিনীর সেনানায়ক বললেন, তিনি গুলী-চালাবার হুকুম দেবেন, সভা ছেড়ে সবাই চলে যাক। কিন্তু কেউ চলে গেল না। তখন ডাঃ খান্ সাহেবকে সেনানায়ক তাঁকে সাহায্য করতে বললেন। ডাঃ খান্ সাহেব তাঁকে বললেন, সভার কাজ শেষ হয়ে গেছে; আপনাদের সবচেয়ে ভালো কাজ হবে, আপনারা চলে যান; আমরাও চলে যাব। আর যদি গুলী চালাতে চান তবে এখুনি গুলী চালানো শুরু করা উচিত। কারণ, আমরা সভা ছেড়ে চলে যেতে শুরু করলে তখন গুলীচালানো খুব বীরত্বের কাজ হবে না। সেনানায়ক হুমকি দিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সৈন্যদল নিয়ে চলে গেলেন। লালকোর্তাবাহিনীও তাদের বাদ্য বাজাতে বাজাতে চলে গেল। কিন্তু পথে বৃটিশ অশ্বারোহীবাহিনীর একটি দল তাদের আক্রমণ করলো। লালকোর্তাদলের নায়ক মহম্মদ আসলাম খান্ লালকোর্তাদের মাটিতে শুয়ে পড়তে বললেন। অশ্বারোহীরা তাঁদের চার্জ করলো, কিন্তু প্রথম সারি পর্যন্ত এসে থেমে গেল। বার দুই এইরকম করবার পর অশ্বারোহীরা ফিরে গেল।

কিন্তু পাখতুনদের এই ঐক্যবদ্ধ দৃঢ়তা ইংরেজ সরকার ও কর্মচারীদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠলো। লালকোর্তা-সংগঠনকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো তারা। ১৩ই মে শেষরাত্রিতে সৈন্যদল উটমনজাই গ্রাম অবরোধ করলো। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটি কমিশনার ইংরেজ ও ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে গ্রামে ঢুকলো। গ্রামের বাইরে আট শ বৃটিশ অশ্বারোহী এবং শিখ, মুসলিম ও ডোগরাদের নিয়ে গঠিত একটি অশ্বারোহী দল মোতায়েন রইলো। তাছাড়া, প্রহারের জন্য বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু শিয়া-সম্প্রদায়ের মুসলিম সৈন্যকেও আনা হলো। এদের সীমান্তের ওপার থেকে আনা হয়েছিল। গ্রামের বাইরে কামানও বসানো হয়েছিল। ডেপুটি কমিশনার খুদাই খিদমতগারদের অফিসে গেলেন। অফিসটি একটি দোকানের

দোতলায় ছিল। ডেপুটি কমিশনার ঐ দোকানের গেট ভেঙে ফেলতে হুকুম দিলেন। অনেক চেষ্টা ক'রেও যখন তা সম্ভব হলো না, তখন তারা দেওয়াল টপকে ভেতরে ঢুকলো ও দোকানের তালা ভাঙলো। ডেপুটি কমিশনার উপরে উঠে কর্তব্যরত লালকোর্তাদের নিচে যেতে ও তাদের পোশাক খুলে ফেলতে হুকুম দিলেন। লালকোর্তারা বললে, তাদের নায়কের হুকুম ছাড়া তারা নিচে যাবে না এবং তারা মরবে কিন্তু পোশাক খুলবে না। তখন তাদের নায়ক রবনওয়াজ খান্ তাদের 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে দিতে নিচে যেতে বললেন। ডেপুটি কমিশনার তাদের ধ্বনি দেওয়া থেকে বিরত করতে চেষ্টা করলেন এবং একজন লালকোর্তার বুকে রিভলভার ঠেকিয়ে তাকে পোশাক খুলতে বললেন। লালকোর্তাটি নির্ভীক কণ্ঠে বললো : সাহেব, তা হয় না ; পাঠান যতোক্ষণ বেঁচে থাকে, তার পায়জামা কেউ খুলতে পারে না। তখন ডেপুটি কমিশনার তাকে ঘুষি মারতে লাগলেন এবং দুজন ইংরেজ সৈনিক বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তাঁকে বেদম মারতে লাগলো। লোকটি অজ্ঞান হয়ে পড়লে তার পোশাক কেড়ে নেওয়া হলো। তারপর ফৈজ মহম্মদ নামে আর একজন লালকোর্তাকে তার পোশাক খুলতে বলা হলো। সে অস্বীকার করলে তাকে আট জন সৈনিক বেদম প্রহার ক'রে অজ্ঞান ক'রে ফেললো। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে আট-নজন ইংরেজ সৈনিক পদাঘাত করতে লাগলো। এইভাবে একের পর এক ক'রে খুদাই খিদমতগারদের প্রহারে অজ্ঞান ক'রে উলঙ্গ করা হলো। কয়েকজন খুদাই খিদমতগারকে দোতলার বারান্দা থেকে নিচে পাকা রাস্তায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হলো। অনেকে সঙ্গীনের খোঁচায় গভীর ভাবে আহত হলো। লালকোর্তাদের একজন ক্যাপ্টেন, মহম্মদ নাকিব খান্‌কে নির্দয়ভাবে প্রহার ক'রে তার কামিজ খুলে নেওয়া হলো। কিন্তু সৈনিকরা যখনই তার পায়জামা খুলতে গেল, তখনই সে সকলকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বাড়ির দিকে ছুটলো তার নিজের রিভলভার আনতে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেনানায়ক রবনওয়াজ খান্ তাকে বাধা দিয়ে বললেন : "তোমার ধৈর্যের বাঁধ এতো সহজেই ভেঙে গেল যে, প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য ছুটছ! তুমি না শপথ করেছ, মৃত্যু পর্যন্ত অহিংস থাকবে!" বলবার সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদ নাকিব খান্ ফিরে দাঁড়ালেন। তাঁকে গ্রেফতার করা হলো।

এই নারকীয় ঘটনাবর্তের মধ্যে লালকোর্তা-পরা চৌদ্দ বছরের একটি বালক এক পাশে দাঁড়িয়েছিল। ডেপুটি কমিশনার হেঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি

কে ?" বালক নির্ভীককণ্ঠে বললো : "আমি ওয়ালি খান্ ; আবতুল গফর খানের ছেলে।" একজন ইংরেজ সৈনিক ওয়ালিকে সঙ্গীনের খোঁচা দিতে উদ্যত হলো। পাশ থেকে একটি মুসলমান সৈনিক লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ সে হাত বাড়িয়ে সঙ্গীন সরিয়ে দিলো। তখন আর একজন ইংরেজ সৈনিক সেদিকে এগিয়ে এলো। কিন্তু তার আগেই একজন পাঠান খুদাই খিদমতগার ওয়ালিকে তুলে নিয়ে নিচে লাফিয়ে পড়লো এবং পাশের মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিলো। এইভাবে ওয়ালিকে প্রাণে বাঁচালো।

সৈনিকরা খুদাই খিদমতগারদের অফিস জ্বালিয়ে দিলো। সারা গ্রামে অবাধ লুণ্ঠন চালালো। বাড়ির বাইরে পায়খানা করতে যাওয়ার উপায় রইলো না। এমনকি মাঠে পশুচরানোও বন্ধ হলো। লাল কোর্তাদের একে একে সবাইকে গ্রেফতার করলো এবং তাদের নির্মমভাবে প্রহার করলো। ডেপুটি কমিশনার হুঙ্কার ক'রে গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করলো : "আর কোনও লালকোর্তা আছে ?" কেউ ভয়ে জবাব দিলো না। গ্রামের অন্যতম খান্ মহম্মদ আব্বাস খান্ পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি এতোদিন ইংরেজ সরকারেরই অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু সরকারের এই বর্বরতা তাঁকেও ক্ষিপ্ত ক'রে দিলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে ছুটে গেলেন এবং এক বালতি জলে লাল রং গুলিয়ে তাঁর ও তাঁর বাড়ির চাকরদের সকলের পোশাক তাতে ডুবালেন। তারপর সেই ভিজা লাল পোশাক পরে তাঁরা ডেপুটি কমিশনার ও সৈন্যদলের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। বললেন : "এই যে আরও অনেক লালকোর্তা রয়েছে।"

কেবল উটমনজাই নয়, গ্রামে গ্রামে বৃটিশের এমনই নিপীড়ন নিগ্রহ চলতে লাগলো। ইংরেজ সৈন্যদলের সাহায্যে পুলিস গ্রামে গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের জোর ক'রে 'আমি খুদাই খিদমতগার নই—এইরকম স্বীকৃতিতে' আঙুলের ছাপ নিতে লাগলো। গ্রামবাসীদের অনেকেই খুদাই খিদমতগার ছিল না ; তারা সে কথা স্বীকার করলো, কিন্তু দস্তখত করতে কেউ রাজী হলো না। তখন তাদের উপর প্রচণ্ড নিপীড়ন চললো। তাদের রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এইরকম একটি ঘটনার কথা আবতুল গফর নিজে উল্লেখ করেছেন। যারাই এরকম আঙুলের ছাপ দিতো, গ্রামবাসীরা তাদের ঘৃণার চক্ষে দেখতো। একবার একজন গ্রামবাসী আঙুলের ছাপ দিয়ে বাড়ি ফিরলো। তার বউ তখন মুগুর দিয়ে কাপড় কাচছিল, স্বামীকে ফিরে আসতে দেখে বললো, "ফিরে এলে যে ?" লোকটি বললো, "আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।"

বউ বললো, "আর কাউকে ছাড়লো না, তোমাকে ছেড়ে দিলে? কই দেখি তোমার আঙুল?" আঙুলে কালির দাগ দেখে বউ স্বামীকে তাড়া করলো মুগুর নিয়ে। লোকটি আবার ফিরে গিয়ে অন্যান্য গ্রামবাসীদের সঙ্গে বসলো। জিজ্ঞাসা করলে বললো, তার বউ তাকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি। আবদুল গফর বলেছেন, তাঁর গ্রামের হাজী শাহ্ নওয়াজ খান্ জামানত দিয়ে জেল থেকে খালাস পেয়েছিলেন। তাই গ্রামবাসীরা সর্বদাই তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো; শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

সারা দেশে লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। কলকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ, লাহোর, এলাহাবাদ, বোম্বাই, পেশোয়ার, সর্বত্রই হাজার হাজার মানুষ আইন অমান্য করে লাঠি, গুলী ও কারাদণ্ড বরণ করছিল। প্রায় দশ লক্ষ মানুষ এক বোম্বাইয়ের সমুদ্রসৈকতে লবণ আইন ভঙ্গ করেছিল। সরকার গোড়ার দিকে লবণ সত্যাগ্রহকে কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল। কিন্তু একটি স্ফুলিঙ্গ যে অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে, তা প্রত্যক্ষ ক'রে তারা প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লো। তারা অর্ডিন্যান্সের পর অর্ডিন্যান্স জারী করলো। সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করলো। গান্ধীজী 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' ও আবদুল গফরের 'পাখতুন' নিষিদ্ধ ক'রে দিলো।

সীমান্ত প্রদেশে নির্যাতন প্রচণ্ডতম আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু এই আঘাত সুপ্ত পাখতুন দানবকে জাগ্রত ক'রে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করে নি। খুদাই খিদমতগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫০০ থেকে ৮০,০০০ হাজারে দাঁড়িয়েছিল। 'বাদশা খান্ জিন্দাবাদ', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'মহাত্মা গান্ধীজীকি জয়' ধ্বনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এমন ধ্বনিত হয়েছিল যে, উপজাতীয় অঞ্চল থেকেও তার প্রতিধ্বনি পৌঁছেছিল। হাজী তুরংজাই ঐ সময় উপজাতীয় অঞ্চলে ছিলেন। তিনি পাখতুনদের উপর বৃটিশের এই বর্বর আচরণের প্রতিবিধান করতে সশস্ত্র বাহিনী গঠন করলেন। উপজাতীয় অঞ্চলে এই গোলযোগ ইংরেজ সরকারকে আরও সন্ত্রস্ত ক'রে দিলো। ইংরেজ সরকার হাজী তুরংজাই ও তাঁর অনুগামীদের দমনের নামে উপজাতীয় অঞ্চলে নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করতে লাগলো। আগস্ট মাসে আফ্রিদিরা সীমান্ত অঞ্চলে অনেকদূর এগিয়ে এলো। আফ্রিদিদের গ্রামবাসীরা সাহায্য করায় অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠলো। এই অবস্থায় ইংরেজ সরকার একদিকে যেমন নিপীড়ন চালাতে লাগলো, অন্যদিকে তেমনি সাহায্যের জন্যে খান্, উপজাতীয় সর্দার ও ধনী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য

প্রার্থনা করলো। ১৯৩০ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯৩১ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সারা সীমান্ত প্রদেশে সামরিক আইন জারী রইলো।

সীমান্ত প্রদেশের কয়েকজন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি জেলে আবদুল গফরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে সরকারের এই অমানুষিক অত্যাচার-উৎপীড়নের সংবাদ দিলেন। আবদুল গফর তাঁদের মুসলমানদের উপর সরকারের এই অত্যাচারের প্রতিবিধান করতে মুসলিম লীগ নেতাদের সাহায্য নিতে বললেন। ঐ বিশিষ্ট নেতারা মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। লীগ নেতারা জানালেন, এ বিষয়ে তাঁরা কোনও সাহায্যই করতে পারবেন না, কারণ পাখতুনরা বৃটিশের বিরোধিতা করছে। ঐসব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তখন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। নেতারা জানালেন, কংগ্রেস তাঁদের সানন্দে সাহায্য করতে রাজী আছে, যদি তাঁরা বৃটিশবিরোধী সংগ্রামে যোগ দেন। তখন আবদুল গফর ঐ বিশিষ্ট নেতাদের কংগ্রেসে যোগদানের প্রশ্নটি খুদাই খিদমতগার সংস্থার প্রাদেশিক জিরগায় উত্থাপন করতে পরামর্শ দিলেন। জিরগা এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করলে খুদাই খিদমতগার সংস্থা কংগ্রেসে যোগ দিল।

খুদাই খিদমতগার সংস্থা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে জেনে ইংরেজ সরকার আরও উদ্বিগ্ন হলো। সরকারের পক্ষ থেকে আবদুল গফরকে জানানো হলো, আবদুল গফর যদি কংগ্রেস ত্যাগ ক'রে তাদের সঙ্গে আপোস-মীমাংসায় রাজী হন, তবে বৃটিশ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলকে যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে, তা সবই সীমান্ত প্রদেশকে দেওয়া হবে। কেবল তাই নয়, ভবিষ্যতে সে বৃটিশ ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। আবদুল গফর সীমান্ত প্রদেশের রাজবন্দীদের সকলকে ডেকে সরকারের এই প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করলেন। অধিকাংশ রাজবন্দীই তাঁকে এই সুযোগ নিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু আবদুল গফর বললেন, তাঁরা আগেই কংগ্রেসকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; এখন তিনি সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারবেন না। তাছাড়া বৃটিশকে বিশ্বাস করা যায় না। তিনি সরকারকে জানালেন "আপনারা যেমন আমাদের বিশ্বাস করেন নি, আমরাও তেমনি আপনাদের বিশ্বাস করতে পারছি না।"

এখন থেকে খুদাই খিদমতগার সংস্থা কংগ্রেসের শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে পরিণত হলো এবং আবদুল গফর হলেন কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা।

৯.

যুদ্ধবিরতি : আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতি : আবার কারাগারে

ভারতে যখন ব্যাপকভাবে আন্দোলন ও সরকারের কঠোর নিপীড়ন চলছিল, তখন লণ্ডনে প্রথম গোল টেবিল বৈঠক বসেছিল। কংগ্রেস যোগ না দেওয়ায় এই বৈঠক ব্যর্থ হয়েছিল। কংগ্রেস যাতে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেয়, সেজন্য বড়লাট লর্ড আরুইন ২৪শে জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের বিনা শর্তে মুক্তিদান ঘোষণা ক'রে একটি বিবৃতি দিলেন। গান্ধীজী বললেন, "কেবল ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তি দিয়ে একটি কঠিন পরিস্থিতিকে কঠিনতর করা হয়েছে এবং সদস্যদের পক্ষে কোনও ব্যবস্থাগ্রহণ প্রায় অসম্ভব হয়ে তুলেছে। স্পষ্টতঃ সরকার উপলব্ধি করতে পারেন নি যে এই আন্দোলন জনমানসকে এমনভাবে প্রকাশিত করেছে যাতে কংগ্রেসনেতারা তাঁরা যতোই বিশিষ্ট ব্যক্তি হন না কেন, কোন বিশেষ কার্যক্রম নির্দেশ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমার নিজের কথা বলতে, মর্যাদার সঙ্গে হলে শান্তিই আমি চাই।" এর পর গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান ও সাময়িক সংগ্রাম-বিরতি সম্পর্কে লর্ড আরুইন ও গান্ধীজীর মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হলো। এতে বলা হলো, এখন আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রাখা হবে এবং সরকারও তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। তবে ভারতীয় শিল্পের উন্নতির জন্য বিদেশী বর্জন আন্দোলন চালানো যাবে।

গান্ধী-আরুইন চুক্তি অনুসারে গুজরাট জেল থেকে আবদুল গফর ছাড়া অন্যান্য সব রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলো। সীমান্ত প্রদেশের চীফ কমিশনার স্যার স্টিউয়ার্ট পিয়ার্স বড়লাটকে জানালেন, হয় তিনি নয় আবদুল গফর, একজন মাত্র সীমান্ত প্রদেশে থাকবেন। কিন্তু গান্ধীজী বড়লাটকে জানালেন, আবদুল গফর একজন কংগ্রেস-কর্মী; তাঁকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হ'ক। বড়লাট বললেন, "পাখতুনরা আপনাকে প্রতারণা করছে। তারা হিংসায় বিশ্বাসী। আপনি নিজে ঐ প্রদেশ ঘুরে প্রকৃত অবস্থা দেখে আসতে পারেন।" শেষ পর্যন্ত আবদুল গফরকে মুক্তি দেওয়া হলো।

১১ই মার্চ মুক্তি পেয়েই আবদুল গফর হঠাৎ পেশোয়ারে পৌছলেন। তাঁর আগমনবার্তা বিদ্যুদ্‌গতিতে ছড়িয়ে পড়লো। তাঁকে অভ্যর্থনার জন্যে হাজার হাজার লোক ছুটে এলো। আবদুল গফর গান্ধী-আরুইন চুক্তিকে সাময়িক যুদ্ধবিরতি বলে বর্ণনা করলেন এবং জনসাধারণকে আসন্ন তীব্রতর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। তিনি খুদাই খিদমতগারের সংখ্যা এক লক্ষ করবার সংকল্প ঘোষণা করলেন। তিনি উটমনজাই গ্রামে ফিরে মুহূর্তকাল নষ্ট না ক'রে খুদাই খিদমতগার সংস্থাকে আরও শক্তিশালী ক'রে তোলার কাজে মন দিলেন। তিনি ঐ সময় যেসব জনসভায় বক্তৃতা দিলেন, তাতে তিনি বলতে লাগলেন, "ফিরিঙ্গিদের একটা শিং ভেঙে গেছে। এখন তার অন্য শিংটা ভাঙবার জন্য প্রস্তুত হও।" এই শিং ভেঙে যাওয়ার কথাটা ইংরেজ সরকারের মনঃপূত হলো না; তারা আবদুল গফরের সহকর্মীদের কাছে তাঁকে খাটো করবার চেষ্টা করতে লাগলো। বললো, আপনারা শিক্ষিত ব্যক্তি, আবদুল গফর আপনাদের মতো শিক্ষিত নন; আপনারা কাজ করেন, আর তার জন্য খ্যাতি লাভ করেন তিনি। তিনি তাঁর কার্যকলাপে আপনাদের বিপন্ন করবেন। ইংরেজদের প্রচার কিছুটা কার্যকর হলো। তাঁর সহকর্মীরা মর্দানে একটি বৈঠকে মিলিত হয়ে তাঁকে 'ফিরিঙ্গিদের একটা শিং ভেঙে গেছে' এই প্রসঙ্গ বারবার তুলতে নিষেধ করেন। তিনি বললেন, "তাহলে কি বলব?" তাঁরা বললেন, "বলা উচিত, এখন আমাদের সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধি হয়েছে, এখন আমরা পরস্পরকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করব।" আবদুল গফর বললেন, "তাতে পাখতুনজাতির মধ্যে উপযুক্ত মনোভাব সঞ্চার করা যাবে না। তাছাড়া এই সন্ধি স্বল্পস্থায়ী হবে। ভগবান আমাদের কাজ করবার একটা সুযোগ দিয়েছেন। তা আমরা হেলায় হারাতে পারি না।"

মার্চ মাসের শেষে করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হলো। তাতে কংগ্রেসের সদস্যরূপে সর্বপ্রথম আবদুল গফর ও খুদাই খিদমতগাররা আমন্ত্রিত হলেন। খুদাই খিদমতগাররা তাঁদের লালকোর্তা ও বাদ্যভাণ্ডসহ কংগ্রেস-অধিবেশনে যোগ দিলেন। তাঁদের জন্য কংগ্রেসনগরে পৃথক শিবিরের ব্যবস্থা হলো। করাচী কংগ্রেস গান্ধী-আরুইন চুক্তি অনুমোদন করলো।

যেদিন কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হয়, সেদিনই ইংরেজ সরকার বিখ্যাত বিপ্লবী ভগৎ সিংয়ের ফাঁসির দিন স্থির করেছিল। সম্প্রতি যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটেছিল, তাতে কংগ্রেস-নেতা গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী দাঙ্গা রোধ

করতে গিয়ে নিহত হয়েছিলেন। তাছাড়া আন্দোলন যখন চরম পর্যায়ে পৌছেছিল, তখন হঠাৎ সাময়িক সন্ধি ক'রে কংগ্রেস ভুল করেছে বলে তরুণ নেতারা মনে করছিলেন। গান্ধাজী যখন করাচী স্টেশনে পৌছেছিলেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছিল। তাই কংগ্রেসের অধিবেশন শান্তিপূর্ণ হবে কিনা সে বিষয়ে সংশয় ছিল। গান্ধীজী মুক্ত আকাশের নিচে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে প্রায় ৫০০০০ প্রতিনিধি ও দর্শকদের উদ্দেশে বললেন:

"আপনারা যদি আমার সেবা চান, তবে আমাকে ত্যাগ করবেন না। আপনাদের জানা প্রয়োজন যে, খুনী, চোর বা ডাকাত কাউকেই শাস্তি দেওয়া আমার আদর্শের বিরোধী। তাই আমি ভগৎ সিংকে বাঁচাতে চেষ্টা করিনি, এরকম সংশয় আপনাদের পোষণ করা উচিত হবে না। তবে আমি চাই, ভগৎ সিং কি ভুল করেছিলেন, তা-ও আপনাদের বুঝে দেখা উচিত। আমি যদি ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীদের সাক্ষাৎ পেতাম, তবে তাঁদের বলতাম তাঁরা যে পথ অনুসরণ করছেন, তা ভ্রান্ত ও ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমি দৃঢ়ভাবেই বলছি, তরবারির সাহায্যে আমরা আমাদের ক্ষুধিত, অন্ধ, বধির, পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য স্বরাজ আনতে পারব না।...যে সমস্ত নারী ও শিশু বিগত অভিযানে নিজেদের গৌরবমণ্ডিত করেছেন, আমরা যদি হিংসার পথ গ্রহণ করতাম, তবে কি তা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হতো?...আমরা অহিংসার শপথ নিয়েছি, তাই কোটি কোটি নরনারী ও শিশুকে আমাদের সৈনিকরূপে পেয়েছি।"

২৯শে মার্চ কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হলো। অধিবেশনস্থলে প্রায় সাড়ে তিন হাজার প্রতিনিধি ও কয়েক হাজার দর্শকে পরিপূর্ণ ছিল। কংগ্রেসের সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেলকে বিরাট শোভাযাত্রা করে সভামঞ্চে আনা হলো। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, সুভাষচন্দ্র বসু ও আবদুল গফর। গান্ধী-আরুইন চুক্তির সমর্থনে প্রস্তাব উত্থাপিত হলে যাঁরা গান্ধীজীকে সমর্থন জানালেন, তাঁদের মধ্যে আবদুল গফরও ছিলেন। তিনি সভামঞ্চে উঠে দাঁড়ালে সমগ্র সভাস্থল 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে উত্তাল হয়ে উঠলো। আবদুল গফর তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বললেন, তিনি সৈনিক মাত্র; সেনাপতি তাঁকে যদি প্রশ্ন করেন যে, তিনি কি জানেন, তবে তিনি বলবেন, তিনি জানেন শুধু হুকুম তামিল করতে। সমস্ত পাখতুন

জাতি মহাত্মা গান্ধীকে বিশ্বাস করে। তিনি পাঠানজাতিকে ভারত ও ভারতবাসীর বন্ধুতে পরিণত করেছেন। কংগ্রেসের অধিবেশনে আবদুল গফরের এই প্রথম ভাষণ।

আবদুল গফরের পর গান্ধীজী সভায় ভাষণ দিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বারবার সীমান্তবাসী পাখতুনদের অতুলনীয় আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করলেন। কংগ্রেসে সীমান্ত প্রদেশ সম্পর্কে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হলো। একটি প্রস্তাবে বলা হলো, ভারতের অন্যান্য অঞ্চল যে সংবিধান লাভ করবে, সীমান্ত প্রদেশেও সমানভাবে তা প্রযোজ্য হবে। আর একটি প্রস্তাবে সীমান্ত অঞ্চলে বৃটিশের ক্রমাগত সম্প্রসারণের নীতির নিন্দা করা হলো। এই প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে জওহরলাল বললেন, "বিগত বহু বৎসর ধরে ইংরেজরা আফগানদের খুন-জখম ও লুণ্ঠনে অভ্যস্ত বর্বর রূপে চিত্রিত করেছে। বৃটিশ চলে গেলেই সর্বত্র লুঠতরাজ শুরু হয়ে যাবে, ঐ রকম একটি মিথ্যা চিত্র তারা আফগানদের কাছেও তুলে ধরেছে। আমি পাঠানদের জানি, যাঁরা সৎ, সাহসী ও অনুরাগী বন্ধু। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, স্বরাজ পেলে সীমান্ত অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত হৃদ্য হয়ে উঠবে। বৃটিশ সরকার ক্রমাগত সম্প্রসারণ-নীতি অনুসরণ করে সীমান্তের স্বশাসিত উপজাতীয় অঞ্চলকে পদানত করতে চেষ্টা করছে। ভারত নিজেই পরপদানত, অপরে পরপদানত হক, ভারত তা চায় না। কিন্তু এ বিষয়ে ভারত নীরব থাকলে তার ভুল অর্থ করা হতে পারে। তাই আমি উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দকে এই সভায় উত্থাপিত এই প্রস্তাবটি অনুমোদন করতে অনুরোধ করছি।"

আবদুল গফর এই প্রস্তাবের সমর্থনে বললেন, "সরকার ইচ্ছা করেই সীমান্ত সম্পর্কে ভারতবাসীদের অন্ধকারে রেখেছে। এতদিন তারা আফগান জুজুর ভয় দেখিয়ে ভারতকে বিচ্ছিন্ন রেখেছিল। সেদিন আর নেই। এখন পাখতুনরা মহাত্মা গান্ধীর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখে। ভবিষ্যতে আবার যদি আইন অমান্য শুরু হয়, তখন পাখতুনরা বিন্দুমাত্র পেছনে থাকবে না। পাখতুনরা কি, তার পূর্ণ পরিচয় তারা দেবে। গোলামের কোনও ধর্ম নেই ; হিন্দু ও মুসলমানের সামান্য বিষয় নিয়ে আত্মকলহ শোভা পায় না।"

আবদুল গফর আফ্রিদিদের কাছ থেকে প্রেরিত একটি বার্তাও গান্ধীজীকে দিলেন। আফ্রিদিরা গান্ধীজীকে সীমান্ত অঞ্চলে গিয়ে স্বচক্ষে তাদের অবস্থা দেখে আসতে আমন্ত্রণ করেছে। আবদুল গফর বললেন, মহাত্মা গান্ধীই

সীমান্তে শান্তি স্থাপন করতে এবং সামরিক খাতে যে কোটি কোটি টাকা অনর্থক ব্যয়িত হচ্ছে তা রোধ করতে পারেন।

এই অধিবেশনকালে গান্ধীজী, জওহরলাল ও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আবদুল গফর ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হলেন। তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সহজেই সকলকে মুগ্ধ করলো।

করাচী কংগ্রেস গান্ধীজীকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গোল টেবিল বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করবার অধিকার দিলো।

আবদুল গফর উনিশজন লালকোর্তাকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে করে করাচী থেকে বোম্বাই এলেন। বোম্বাইয়ে তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানানো হলো। বোম্বাইয়ে তিনি দুদিন ছিলেন। ঐ দুদিনে তিনি দশ-বারোটি সভায় ভাষণ দিলেন। তিনি তাঁর এই ভাষণগুলিতে হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর কথা বার বার বললেন। তিনি মুসলমানদের দলে দলে কংগ্রেসে যোগ দিতে এবং পাঠান-জাতি সম্পর্কে তাঁদের যে ভুল ধারণা আছে তা ত্যাগ করতে বললেন। এখানে ডোংচি ময়দানে পাঠানদের এক সভাতেও তিনি বক্তৃতা দিলেন। বোম্বাই থেকে আবদুল গফর গেলেন দিল্লী।

দিল্লীতে ঐ সময়ে মুসলিম সম্মেলন হচ্ছিল। গান্ধীজী লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়ার আগে ভারতেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা করে যেতে চাইছিলেন। করাচীতে করাচী কংগ্রেসের পরেই তিনি তার সূত্রপাত করেছিলেন। ঐ সময় করাচীতে জমিয়েত্-উল্-উলেমা-ই-হিন্দ্-এর বার্ষিক অধিবেশন হচ্ছিল। মওলানা আজাদ এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করছিলেন। গান্ধীজী এই সম্মেলনে ভাষণদানকালে আগ্রা, বেনারস, কানপুর, মিরজাপুর ও অন্যান্য স্থানে হিন্দু-মুসলমানে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল, তার উল্লেখ করলেন। বললেন, "সুপণ্ডিত ইসলাম শাস্ত্রবিদ্গণ, আপনারা মুসলমানদের মন থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিষয় দূর করে তাঁদের পরস্পর প্রীতি ও শুভেচ্ছার বাণী শিক্ষা দিন। আমিও হিন্দুদের কাছে ঐভাবে আবেদন করছি, তাঁরা যেন আঘাতের বিনিময়ে আঘাত না দেন, তাঁরা যেন মুসলমানরা ভুল করলেও তাঁদের ভাই বলেই মনে করেন। তিনি বললেন, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ভারতকে স্বরাজ দিতে পারে। হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান না হলে গোল টেবিল বৈঠকে গিয়ে তাঁর কোন লাভ নেই। দিল্লীতে মুসলিম সম্মেলনে উপস্থিত মুসলিম নেতাদের কাছেও তিনি ঐ প্রস্তাবই রাখলেন। কিন্তু মুসলিম

নেতাদের তিনি স্বমতে আনতে অক্ষম হলেন না। মুসলিম সম্মেলন পৃথক নির্বাচন-ক্ষেত্রের দাবিতে অটল রইলো এবং তাদের কংগ্রেসবিরোধিতা তারা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলো।

১৮ই এপ্রিল বোম্বাইয়ে গান্ধীজী বিদায়ী বড়লাট লর্ড আরুইনকে বিদায়-অভিনন্দন জানালেন। নূতন বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড উইলিংডন। গান্ধীজী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবেন এবং সীমান্ত প্রদেশ সম্পর্কে আলোচনা করবেন ভেবে ভারত সরকারের দপ্তর থেকে সীমান্তের চীফ কমিশনারকে জানানো হলো, গান্ধীজীর দ্বারা আবদুল গফরকে সংযত করা যেতে পারে, কারণ আবদুল গফর গান্ধীজীর অনুরাগী ভক্ত। সুতরাং আবদুল গফর ও তাঁর সংগঠনের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বে গান্ধীজীকে জানানোই ভালো। তবে গান্ধীজীর বিনা মধ্যস্থতায় যদি সীমান্ত সরকার কোনও আপোস-মীমাংসায় আসতে পারে, তা সর্বোত্তম হবে ।

সীমান্ত সরকার ভারত সরকারকে জানালেন, চীফ কমিশনার ব্যক্তিগত ভাবে বা আমলদের সাহায্যে আবদুল গফরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন ; আবদুল গফর প্রতিবারই সাক্ষাৎকারে অসম্মত হয়েছেন। অন্যপক্ষে তিনি সভা-সমিতির নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সীমান্ত প্রদেশের সর্বত্র ঘুরছেন এবং বক্তৃতা দিচ্ছেন। বক্তৃতার সুরে শ্বেতাঙ্গ-বিদ্বেষ ও রাজদ্রোহ সুস্পষ্ট। তিনি প্রকাশ্যেই বলছেন, তাঁর লক্ষ্য হলো ইংরেজদের ভারত থেকে বিতাড়ন।

লর্ড উইলিংডনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার পর গান্ধীজী জওহরলাল নেহরু ও আবদুল গফরকে বারদৌলিতে ডেকে পাঠালেন। আবদুল গফর একটি হাতব্যাগ হাতে নিয়ে বারদৌলি স্টেশনে নামলেন। তাঁর ঐ ব্যাগে একপ্রস্ত পোশাক ও কাগজপত্র ছাড়া কিছুই ছিল না ; এমন কি বিছানাও না। তিনি বারদৌলির স্বরাজ-আশ্রমে পৌছলে অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজের সহজ সরল ব্যবহারে আশ্রমেরই একজন হয়ে গেলেন। তিনি আশ্রমবাসীদের কাছে সীমান্ত প্রদেশে তাঁরা কিভাবে যুদ্ধবিরতি পালন করছেন, তা বর্ণনা করে বললেন :

> গান্ধীজীর আদেশমত আমরা বর্তমানে আমাদের ক্রিয়াকলাপ প্রায় কার্যত বন্ধ রেখেছি। আমরা খুদাই খিদমতগার সংগ্রহ করছি বটে, তবে তাদের কাজ একটু-আধটু পিকেটিং ছাড়া প্রায় কিছুই নেই। যেখানে আমাদের আন্দোলন আছে, সেখানে সাধারণ কর্মসূচী হলো

আমাদের কর্মীদের জুম্মা উপাসনার সপ্তাহে একবার করে মিলিত হওয়া। স্বেচ্ছাসেবকদের কুচকাওয়াজ করানো হয় এবং বলা হয় যে, কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে, তার বিরুদ্ধে যায় এমন কিছু কেউ যেন না করে। এমন কি ধ্বনি দেওয়াও বন্ধ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও সরকারের দিক থেকে প্ররোচনার অন্ত নেই। একমাস আগে চরসদ্দায় দশ-বারোজন ছাত্রকে একটি নাটক মঞ্চস্থ করবার অপরাধে গ্রেফতার করা হলো।...এই গ্রেফতার করবার সময় বিরাট সামরিক বৈভব দেখানো হলো। সাঁজোয়াগাড়ি ও সৈন্যদল এসে গরীব মানুষের ব্যবহার্য জিনিসপত্র, এমন কি পশুর খাদ্য পর্যন্ত নিয়ে গেল। অনেক সৈন্য ঘোড়ায় চড়ে অলিতেগলিতে ঢুকে পড়লো। মানুষ এতে বিক্ষুব্ধ হলো। কিন্তু গান্ধীজীর যে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার অধীনে পাঠানরা নিজেদের সমর্পণ করেছে, তা তাদের সংযত রাখলো।

গান্ধীজীর কনিষ্ঠ পুত্র দেবদাস গান্ধী জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর প্রদেশে এই অহিংস আন্দোলন কতোদিন চলবে বলে আবদুল গফর মনে করেন। আবদুল গফর বললেন, "আমরা ভারতে নিজেদের গান্ধীশিষ্যদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ করতে পারব। আমার অহিংসা আমার কাছে প্রায় ধর্মে পরিণত হয়েছে। অনেকদিন আগে থেকেই আমি গান্ধীজীর অহিংসায় বিশ্বাসী। তবে আমাদের প্রদেশে অহিংসার পরীক্ষায় এই অতুলনীয় সাফল্য আমাকে অহিংসার দৃঢ় প্রচারকে পরিণত করেছে।"

আবদুল গফর বারদৌলির গ্রামগুলি ঘুরে দেখলেন, যে বারদৌলি অহিংস সংগ্রামের ইতিহাসে অমর হয়েছে। বোম্বাইয়ে ৯ই জুন ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হচ্ছিল। তাতে যোগদানের জন্যে গান্ধীজী বোম্বাই গেলেন। সঙ্গে গেলেন আবদুল গফর। তিনি বোম্বাই থেকে দেবদাস গান্ধীর সঙ্গে আমেদাবাদে সত্যাগ্রহ-আশ্রম দেখতে গেলেন। সেখান থেকে দেবদাস তাঁকে বরসাদ জেলা ও বরোদা রাজ্যের গ্রামগুলি দেখাতে নিয়ে গেলেন। জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আবদুল গফর আজমীর ও দিল্লী হয়ে সীমান্ত প্রদেশে ফিরলেন। তিনি যেখানেই গেলেন, সেখানেই হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও অহিংসার আদর্শ সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরলেন।

আবদুল গফর সীমান্ত প্রদেশে ফিরলে ২৫শে জুন তাঁর সম্মানে দেহ্ বাহাদুরে খুদাই খিদমতগাররা এক সভার আয়োজন করলেন। এই সভায় প্রায়

ছয় হাজার নরনারী সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে তিন হাজার খুদাই খিদমতগার ও দু হাজার মহিলা। আবদুল গফর ইতিমধ্যে সরকার কর্তৃক তাঁর দুজন সহকর্মীকে গ্রেফতারের কথা উল্লেখ করে বললেন, "সরকার যুদ্ধবিরতির শর্ত ভঙ্গ করছে, উদ্দেশ্য, যদি এতে প্ররোচিত হয়ে আমরা হিংসাত্মক কিছু করি, তবে তাদের অত্যাচার উৎপীড়ন পুরোদমে চালাবার সুযোগ হয়।" তিনি জনসাধারণকে শত প্ররোচনা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ থাকতে আহ্বান জানালেন। তিনি নারীজাতিকেও এই আন্দোলনে যোগদানের জন্য ডাক দিলেন।

এর পর আবার তিনি সীমান্ত প্রদেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, সকালে বিকালে, সন্ধ্যায়, মধ্যরাত্রিতে রোজ সভাসমিতি করতে লাগলেন। মানুষের উদ্দীপনা উৎসাহ ও তাঁর প্রতি অবিচল আস্থা দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। তাঁর পরিবারের প্রতিটি মানুষ এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তার কিশোর পুত্ররা, এমন কি তাঁর দিদি পর্যন্ত সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। ডাঃ খান্ সাহেব এই আন্দোলনে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। আবদুল গফর পাখতুন নারীদের মধ্যে যে জাগরণ আনলেন, তা ছিল অভাবিতপূর্ব। সরকার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠলো।

আবদুল গফরের সীমান্ত প্রদেশের সর্বত্র বিশেষতঃ কোহাট শহরে প্রবেশে সীমান্ত সরকার স্থির থাকতে পারলো না। কারণ, কোহাট ছিল সৈন্য-সংগ্রহ-কেন্দ্র। সীমান্ত সরকার বড়লাট লর্ড উইলিংডনকে জানালো যে, আবদুল গফর কোহাটে এলে তাঁকে তারা গ্রেফতার করবে। গান্ধীজীকে একথা বড়লাট জানালে গান্ধীজী বললেন, তাতে সন্ধির চুক্তি ভঙ্গ হবে। তিনি সীমান্ত প্রদেশের অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে চান। কিন্তু সরকার তাঁকে সীমান্ত প্রদেশ সফরে অনুমতি দিল না। তখন গান্ধীজী বললেন, জওহরলালজীকে যেতে দেওয়া হ'ক। বড়লাট তাতেও রাজী হলেন না। শেষ পর্যন্ত বড়লাট দেবদাস গান্ধীকে সীমান্ত প্রদেশে যেতে অনুমতি দিতে রাজী হলেন। দেবদাস গান্ধী জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে পেশোয়ারে পৌছলেন। এই সময়কার একটি ঘৃণ্য চক্রান্তের বর্ণনা দিয়াছেন আবদুল গফর :

> আমরা পেশোয়ার থেকে একটি ট্রাকে ক'রে উটমনজাই রওনা হলাম। আমরা যখন শাহীবাগ পার হয়ে যাচ্ছি, তখন জাতীয় পতাকা উড়িয়ে আমাদের এক বন্ধুর গাড়ি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। আমরা ট্রাক থেকে নেমে কারে উঠলাম।······চরসদ্দায় পৌছে, আমরা শুনলাম

ম, কাজী নামে এক কুখ্যাত ডাকাত সরদরিয়ার সেতুর কাছে বনে অপেক্ষা করছিল ; সে ঐ ট্রাক লক্ষ্য করে গুলী চালিয়ে ট্রাকটিকে থামায় ও তল্লাস ক'রে দেখে। ট্রাকের একজন লোক গুলীতে আহত হয়েছিল। তাকে চরসদ্দা হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তার সঙ্গে কথা বললাম। আসলে আমাদের গুলী করবার জন্যেই কাজীকে ভাড়া করা হয়েছিল। আমরা যে ট্রাকে আসছি সে সংবাদ দিয়েছিল নাকি থানা। ভগবানের ইচ্ছায় আমরা গাড়ি বদল করায় বেঁচে গিয়েছিলাম। কাজী আফ্রিদি অঞ্চলে পৌছলে আফ্রিদিরা তাকে হত্যা করেছিল।

দেবদাস গান্ধী সীমান্ত প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সফর ক'রে ফিরে এসে ওয়ার্কিং কমিটির কাছে যে রিপোর্ট দিলেন, তাতে তিনি পাখতুনদের প্রতি সরকারী কর্মচারীদের প্ররোচনামূলক আচরণকেই সেখানকার অশান্ত অবস্থার জন্য দায়ী করলেন। পূর্ব বৎসর শস্যমূল্য অত্যধিক হওয়ায় কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। করাচী কংগ্রেস সেজন্য যুক্তপ্রদেশ, গুজরাট, ও সীমান্ত প্রদেশের কৃষকদের খাজনা হ্রাস ও কোন কোন ক্ষেত্রে খাজনা-মকুবের দাবি করেছিলেন। সীমান্ত প্রদেশে সরকারী কর্মচারীরা এবার খাজনা আদায়ের জন্য অত্যন্ত জুলুম করছিল—বিশেষত খুদাই খিদমতগাররা এই জুলুমের শিকার হয়েছিল। তারা স্ত্রীলোকদের বাড়ির বাইরে সারাদিন রোদে দাঁড় করিয়ে রাখতো, পুরুষদের প্ররোচনা দেওয়ার জন্যে পুরুষদেরও নানাভাবে নির্যাতন করতো। দেবদাস তাঁর রিপোর্টে অন্যান্য নির্মম ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনারও উল্লেখ করেছেন—একটি কুঠরিতে ভিমরুলের চাক ছিল। সেখানে একটি লোককে আটক রেখে ভিমরুলের চাকের তলায় আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হলো, লোকটির সারা গায়ে ভিমরুল দংশন করায় লোকটির যন্ত্রণার সীমা রইলো না। দেবদাস জানালেন, খান্ আবদুল গফরের নির্দেশে খুদাই খিদমতগাররা সম্পূর্ণরূপে হিংসা ত্যাগ করেছে, দস্যু-তস্করের বিরুদ্ধে তাদের আত্মরক্ষার জন্যে যে অস্ত্রশস্ত্র ছিল তাও তারা ত্যাগ করেছে। পাঠানরা একবার সংকল্প করলে তাদের ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার ক্ষমতা অসীম।

৩০শে জুলাই তারিখে সীমান্ত প্রদেশের চীফ কমিশনার স্যার স্টিউয়ার্ট পিয়ার্স কয়েক ঘণ্টাব্যাপী একটি সাক্ষাৎকারে আবদুল গফরকে কংগ্রেসের সম্পর্ক ত্যাগ করতে বললেন এবং পাখতুনদের সকল সুযোগ-সুবিধা দানের প্রলোভন দেখালেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হলেন। গান্ধীজী সরকারের প্ররোচনাদানের

এবং সীমান্ত প্রদেশে অত্যাচারের অসংখ্য ঘটনা উল্লেখ ক'রে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি অভিযোগপত্র ভারতসরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব এমার্সনের হাতে দিলেন। তিনি বড়লাটের সঙ্গেও দেখা করলেন। সরকার ও গান্ধীজীর মধ্যে দীর্ঘ পত্রবিনিময় হলো—তাতে চুক্তিভঙ্গের জন্যে পরস্পর পরস্পরের উপর দোষারোপ করলেন। গান্ধীজী সর্দার প্যাটেল, জওহরলাল নেহরু ও আবদুল গফরকে সঙ্গে নিয়ে সিমলায় বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এই আলোচনার ফলে স্থির হলো, উভয় পক্ষ চুক্তি রক্ষা ক'রে চলবেন; বারদৌলিতে যেসব দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে সরকার সে বিষয়ে তদন্ত করবেন; অন্যান্য অভিযোগের প্রশাসনিক পর্যায়ে তদন্ত করা হবে। গান্ধীজী ও তাঁর সঙ্গীরা সীমান্ত প্রদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে তদন্ত করতে সরকারকে সম্মত করাতে অসমর্থ হলেন। গান্ধীজী বললেন, প্রাদেশিক সরকারগুলি যদি এতোই নির্দোষ, তবে তারা নিরপেক্ষ তদন্তে ভীত কেন?

সিমলায় অবস্থানকালে একটি পত্রযোগে ভারতের পররাষ্ট্রসচিব মিঃ হাউয়েল আবদুল গফরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। আবদুল গফর প্রথমে অসম্মত হ'লেও গান্ধীজীর পরামর্শে তিনি হাউয়েলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। হাউয়েল তাঁকে বোঝাতে চাইলেন যে, পাখতুনদের সঙ্গে বৃটিশের সুসম্পর্ক ছিল, আবদুল গফরের জ্বালাময়ী বক্তৃতাই তা নষ্ট করেছে। আবদুল গফর প্রতিবাদ ক'রে বললেন, না সরকারের দুর্ব্যবহারই তা নষ্ট করেছে। মিঃ হাউয়েলের সহকারী মিঃ উইলি পেশোয়ারে ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। আবদুল গফরের সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল। তিনিও এই সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ছিলেন। আবদুল গফর তাঁকে বললেন, "আপনি নীরব কেন? আপনি তো এক সময় পেশোয়ারে ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। আপনারাই তো আমাদের কংগ্রেসে যোগ দিতে বাধ্য করেছেন।" এই সময়ে টেলিফোনে স্বরাষ্ট্রসচিব এমার্সন আবদুল গফরের সঙ্গে আলাপ করতে চান ব'লে জানালেন।

আবদুল গফর মিঃ এমার্সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "মীরাটে আপনি আপনার বক্তৃতায় বলেছেন, বৃটিশের মুখ সাদা কিন্তু মন কালো। আপনার এই বক্তৃতা ইংলণ্ডে প্রকাশ হ'লে আমরা আপনাদের যেসব সুযোগ-সুবিধা দিতে চেষ্টা করছি, তা কি বন্ধ হবে না?" আবদুল গফর বললেন, "আমি বক্তৃতায় আরও অনেক কথা বলেছিলাম। আপনারা পুরো বিবরণ ছাপতে দিলে আমার কোনও আপত্তি নেই। আমি বলেছিলাম,

ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক ছিল। আমরা তাদের অনুরাগী ছিলাম। আমাদের সবচেয়ে ভালো খাদ্য আমরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত ক'রে তাদের দিতাম। কিন্তু তাতেও তাদের সন্তুষ্ট করতে পারি নি। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলকে তারা যেটুকু সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, তাও আমাদের দেয় নি। তাই আমাদের এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, বৃটিশদের মুখ সাদা, কিন্তু মনটা কালো।"

মিঃ এমার্সন্ এ সম্পর্কে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, তাতে বলেন: আবদুল গফর বললেন, এই আন্দোলন গোড়ার দিকে বৃটিশবিরোধী ছিল না; ১৯৩০-এর ঘটনাবলীই তাকে বৃটিশবিরোধী করে তুলেছে। ১৯৩০-এর এপ্রিল পর্যন্ত তাঁর স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা ছিল ১০০০; এখন ঐ সংখ্যা তিনি দাবি করেন দু লক্ষে দাঁড়িয়েছে। আমি অস্বীকার করলেও তিনি দাবি করেন, তাঁদের পক্ষ থেকে শান্তি-চুক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। তিনি সমস্ত আন্দোলনের অহিংস প্রকৃতির উপর জোর দেন, কোনও ক্ষেত্রে লালকোর্তারা হিংসার আশ্রয় নিয়েছে তিনি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, ভারত সরকার যেসব সংবাদ পেয়েছেন, তা অসত্য।...তিনি অমায়িক ও তাঁর রসবোধ আছে। আমার মনে হয়, তিনি অন্ধবিশ্বাসী ও ঘটনার একটি দিক্ দেখতেই অভ্যস্ত। তিনি বিশ্বাস করেন, প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীরা সকলেই তাঁদের বিরুদ্ধে একজোট এবং বিনা কারণেই তাঁদের বিরুদ্ধে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। আমার ধারণা, তিনি গান্ধীজীর পরামর্শমতো আস্তে চলতে চেষ্টা করবেন, কিন্তু তাতে তিনি সমর্থ হবেন না; কারণ, কোনও ঘটনা ঘটলেই তিনি মনে করেন তা লাল-কোর্তাদের উপর আক্রমণ এবং তখন তিনি নিজেকে সংযত রাখতে পারেন না। তবে আমার মনে হয়, তিনি প্ররোচনামূলক ও বিরক্তিকর কার্যকলাপ বন্ধ রাখবেন। সেই সঙ্গে তিনি যদি তাঁর সংগৃহীত স্বেচ্ছাসেবকদের সুসংগঠিত করে তুলতে সচেষ্ট না হন, তবে আমি বিস্মিত হব। তাঁর কার্যকলাপের এই দিকটা সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সিমলার একটি জনসভায় আবদুল গফর বক্তৃতা দিলেন। তাতে তিনি বললেন, তিনি এমন এক ভাগ্যহত প্রদেশের অধিবাসী যেখানে মানুষ সরকারের হাতে নিয়ত নিগৃহীত হচ্ছে। তিনি আকবরপুরা গ্রামে ঐ সময়ে সেনাবাহিনী যে নির্মম অত্যাচার করে, তার উল্লেখ করে বলেন, সীমান্ত প্রদেশ সম্পর্কে সরকারের মনোভাবটা উকিলের মতো, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী জেনেও সে তার পক্ষ সমর্থন করে।

সিমলার একটি ভোজসভায় মুসলিম লীগ নেতা ফিরোজ খান নুনের সঙ্গে তাঁর দেখা হলে স্যার ফিরোজ তাঁকে বলেন, "আপনারা পাখতুনরা মুসলমানদের ভয়ানক ক্ষতি করেছেন।" আবদুল গফর বললেন, "আমাদের অপরাধ কি? আমরা প্রথমে আপনাদের কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনারা সাহায্য দিতে অস্বীকার করলেন। তখন আমরা কংগ্রেসের কাছে গেছি। আমরা দাসত্ব অনেক সয়েছি; এখন চাই মুক্তি। আপনারাও যদি চান, তবে আমরা আপনাদের সঙ্গেই থাকব।" ফিরোজ খান নুন বললেন, তিনি এ বিষয়ে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে জানাবেন। কিন্তু সে জানানো আর হয়ে ওঠে নি।

সিমলা থেকে সীমান্তপ্রদেশে ফিরে আবদুল গফর দেখলেন, বৃটিশ প্রচারকার্য তাঁর সহকর্মীদের অনেককে বিভ্রান্ত করতে সমর্থ হয়েছে। বোম্বাইয়ে কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে স্থির হয়েছিল যে, সীমান্তপ্রদেশের কংগ্রেস ও খুদাই খিদমতগার-সংস্থা এখন থেকে এক হয়ে যাবে এবং জিরগাগুলি কংগ্রেসের সংবিধান অনুযায়ীই গঠিত হবে। নবনির্বাচিত প্রদেশ কমিটি সীমান্তপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটি বা সীমান্তপ্রদেশ জিরগা উভয় নামেই অভিহিত হ'তে পারবে। জেলার জিরগাগুলি জেলা কংগ্রেস কমিটি বা জেলা জিরগা এবং অন্যান্য নিম্নতর সংগঠনগুলিও অনুরূপভাবে অভিহিত হবে। খুদাই খিদমতগাররা এখন থেকে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে পরিণত হবে; তার নাম খুদাই খিদমতগারই রাখা চলবে। এই সংস্থার কাজ কংগ্রেসের সংবিধান অনুসারেই হবে। এখন থেকে কালো পতাকার পরিবর্তে পতাকা হবে ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা। আবদুল গফরের বিভ্রান্ত সহকর্মীরা খুদাই খিদমতগার-সংস্থার এইভাবে কংগ্রেসের পূর্ণ অন্তর্ভুক্তিকে তাদের বিরোধের কারণ রূপে গ্রহণ করলেন। অনেকে এই মতদ্বৈধ দূর করবার জন্যে মিঞা জাফর শাহ্‌র বাসভবনে একটি বৈঠকের আয়োজন করলেন। আবদুল গফরের বিরোধীরা বললেন, হিন্দুদের ওপর তাদের কোনও বিশ্বাস নেই, তারা গোল টেবিল বৈঠকে পাঠানদের সম্পর্কে দাবি না তুলতেও পারে। সুতরাং সে সম্পর্কে একটি প্রস্তাব নেওয়া উচিত। আবদুল গফর বললেন, হিন্দুরা এ পর্যন্ত তাঁদের ঠকায় নি; সুতরাং এই মুহূর্তে এ ধরনের প্রস্তাব নেওয়া উচিত নয়। তিনি বললেন, "তারা যদি আমাদের প্রতারণা করে, তবে আমরা খুদাই খিদমতগাররা আপনাদের নেতৃত্বেই চলব।" সেদিন আবদুল গফরের মত মেনে নিয়ে সকলে বন্ধুর মতো বিদায় নিলেও

প্রাদেশিক জিরগার সভাপতি খান্ আবদুল আকবর খান ও সেক্রেটারি মিঞা আমেদ শাহ্ সেপ্টেম্বর মাসে এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে খুদাই খিদমতগার-সংস্থাকে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করবার নিন্দা ক'রে নিজ নিজ পদ ত্যাগ করলেন। আবদুল গফরের বিরোধিতা করাই এখন তাঁদের একমাত্র কাজ হয়ে উঠলো।

২৯শে আগস্ট (১৯৩১) গান্ধীজী গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্যে লণ্ডনে রওনা হলেন। সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে আবদুল গফর সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেসের সংগঠন ও কার্যসূচীকে রূপায়িত করবার জন্যে সফর শুরু করলেন। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে পিকেটিংয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলো। পেশোয়ার শহরে প্রায় তিন হাজার খুদাই খিদমতগার পিকেটিংয়ে নিযুক্ত হলেন। অক্টোবরে আবদুল গফর সীমান্তপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে সভাসমিতি করতে লাগলেন। অনেক জায়গায় সরকার সভাসমিতি নিষিদ্ধ করলে হয় আবদুল গফর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলেন, নয় মসজিদে সভা করলেন। তিনি সমস্ত সভাতেই আসন্ন সংগ্রামের জন্যে জনসাধারণকে প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানালেন। তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশে বললেন, "আমি হয়তো শীঘ্রই গ্রেফতার হব। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেমন আছে, তেমনি আমাদের চাই বলবার ও লিখবার স্বাধীনতা; আমরা চাই ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে আমাদের সমান অধিকার।"

অক্টোবরের শেষে দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটির যে বৈঠক হলো, তাতে আবদুল গফরকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হলো। সরকার বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও সীমান্তপ্রদেশে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছে, ওয়ার্কিং কমিটিতে তার তীব্র নিন্দা করা হলো। জওহরলাল আবদুল গফরকে ফাঁকে ডেকে বললেন, "আমরা থেকে ৫০০ টাকা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিকে তাদের খরচ চালাবার জন্যে পাঠাচ্ছি। এখন থেকে আপনার জিরগাকে আমরা এক হাজার টাকা করে দেব।"

আবদুল গফর বললেন, "পণ্ডিতজী, আমরা আপনাদের কাছ থেকে টাকা নেব কেন? ভারতবর্ষ কি কেবল আপনাদের দেশ? তা আমাদের সকলেরই মাতৃভূমি। আপনারা আপনাদের বোঝা বইছেন, আমাদের বোঝা আমরা বইব। যদি আপনারা আমাদের সাহায্য করতে চান, তবে মেয়েদের জন্যে একটি স্কুল ও একটি হাসপাতাল তৈরী করে দেন।"

আবদুল গফরের চরিত্র তখনও জওহরলাল ঠিকমতো বুঝতেন না, তিনি

বিরক্ত হলেন এবং ডাঃ আনসারিকে বললেন, আবদুল গফর দাম্ভিক ও উদ্ধত। আবদুল গফর তা শুনে বললেন, "আমি তো তাঁকে অন্যায় কিছু বলিনি। খুদাই খিদমতগারের মধ্যে দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের স্থান নেই।" পরে এ সম্পর্কে আবদুল গফর বললেন :

> তখন পর্যন্ত জওহরলালজী ও আমি পরস্পরকে ভালো করে জানতাম না। পরস্পরের মেজাজও বুঝতাম না। পরে যখন আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম, তখন আমাদের স্নেহ ভালোবাসা এতোই গভীর হয়ে উঠলো যে, তা সহোদর ভাইদের মধ্যেও দেখা যায় না। এই টাকার ব্যাপারটা আমার কাছে বিশ্রী লাগতো। আমার জীবনে আমি কখনও কারও কাছে অর্থ চাইনি। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা কংগ্রেস সংগঠন থেকে রেলভাড়া নিতেন। কিন্তু আমি কখনও নিই নি। এ নিয়ে আমার সঙ্গে জওহরলালজীর প্রবল বিতর্ক হতো।

দিল্লী থেকে ফিরে আবদুল গফর আবার সীমান্তপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে কংগ্রেসের কার্যসূচীকে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হলেন। ২২শে ডিসেম্বর সীমান্তপ্রদেশের চীফ কমিশনার স্যার র‍্যাল্ফ্ গ্রিফিথ একটি দরবার করলেন। তাতে যোগদানের জন্যে তিনি আবদুল গফরকে আমন্ত্রণ জানালে আবদুল গফর তা প্রত্যাখ্যান করলেন। আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করায় চীফ কমিশনার আবদুল গফরকে এই মর্মে আদেশ দিলেন যে, তিনি যেন অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আবদুল্ল গফর এই আদেশ অমান্য করলে চীফ কমিশনার পুলিস পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে আনলেন। এইভাবে চীফ কমিশনার-আবদুল গফর সাক্ষাৎকার ঘটলো। সাক্ষাৎকারকালে চীফ কমিশনার বললেন, দেশের সম্মুখে তিন দিক্ থেকে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে—এক, উপজাতীয়রা ; দুই, আফগানিস্তান ; তিন, সোভিয়েট ইউনিয়ন। তিনি সব বিষয়ে আবদুল গফরের সহযোগিতা চান।

আবদুল গফর বললেন, সরকার যদি সত্যই উপজাতীয়দের সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হন এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা দিতে চান, তবে তিনি তাতে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। তাতে সরকারকে বর্তমান উপজাতীয় নীতি ত্যাগ করতে হবে এবং উপজাতিগুলির সঙ্গে শত্রুর মতো নয়, বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে হবে। সরকার উপজাতিগুলিকে বিধ্বস্ত করবার জন্যে এখন যে পরিমাণ টাকা ব্যয় করছে, তার অর্ধেক পরিমাণ টাকা যদি সরকার উপজাতীয় অঞ্চলে কুটির-

শিল্প নির্মাণে ব্যয় করতো, তবে উপজাতীয়রা সসম্মানে নিজেদের জীবিকার্জন করতে পারতো, শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য শিখতো। উপজাতীয় অঞ্চলে ছেলে-মেয়েদের আধুনিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত করবার জন্যে স্কুল খুলতে হবে। হাসপাতাল খুলতে হবে উপজাতীয়দের চিকিৎসার জন্যে। এইসব নানা সুযোগ-সুবিধা থেকেই নির্ভীক উপজাতীয়রা পাখতুন সমাজের উপযুক্ত অংশে পরিণত হবে। আফগানিস্তানের দিক থেকে বিপদ সম্পর্কে আবদুল গফর বললেন, আফগান-সরকার ইংরেজ-সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ নীতিই সর্বদা অনুসরণ করছে। কারণ, ইংরেজ-সরকারের সন্তুষ্টি ছাড়া আফগান-সরকার টিকে থাকতে পারে না। তাছাড়া, আফগানরা পাখতুনদের রক্ত-সম্পর্কের ভাই; ইংরেজ-সরকার ভারতে পাখতুনদের প্রতি সুবিচার করলে আফগানিস্তানের পাখতুনরা সহজেই বন্ধুত্বপূর্ণ থাকবে। রুশ-বিপদ সম্পর্কে আবদুল গফর বললেন, "রুশ-বিপদ নিবারণের সর্বোত্তম পন্থা হলো আমাদের ভূমিতে আমাদের মনিব হতে দেওয়া। আমরা পাঠানরা একটি বিরাট সমাজ, আমুদরিয়া থেকে পাঞ্জাবের মধ্যস্থল পর্যন্ত আমাদের বাস। এমন কেউ নেই, যে আমাদের পদানত করে রাখতে পারে। কেউ যদি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায়, বেশ, আমরা সর্বস্ব দিয়ে আমাদের দেশকে রক্ষা করব।"

স্যার র‍্যাল্‌ফ্‌ আবদুল গফরের বক্তব্যগুলি টুকে নিলেন এবং বললেন, তিনি দিল্লী যাচ্ছেন, এ বিষয়ে বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা করবেন। তারপর বললেন, "আবার আমাদের দেখা হবে আশা করি।"

"নিশ্চয় হবে। এবার যেভাবে হলো সেইভাবে", বললেন আবদুল গফর। তখন স্যার র‍্যাল্‌ফ্‌ বললেন, "ওখানে দেখুন অনেকে বসে আছেন, কেউ খান্‌, কেউ খান্‌ বাহাদুর। ওঁরা আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে দিনের পর দিন অপেক্ষা করছেন। কিন্তু আমি ওঁদের সঙ্গে দেখা করি না। আর আপনাকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনি দেখা করতে চান না।"

আবদুল গফর হেসে বললেন, "স্যার র‍্যাল্‌ফ্‌, এইসব লোক নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে এসেছে। নিজের কার্যসিদ্ধির কোনও মতলব আমার নেই। তবে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে চেষ্টা করব কেন?"

স্যার র‍্যাল্‌ফ্‌ টেবিল চাপড়ে বললেন, "হতভাগ্য সেই সরকার যার থেকে সৎলোকেরা দূরে সরে থাকে ও যাকে অসৎ লোকেরা সর্বদা ঘিরে থাকে। তার ধ্বংস অনিবার্য। ভগবান বৃটিশ সরকাকে রক্ষা করুন!"

স্যার র‍্যাল্‌ফের সঙ্গে আলাপে স্যার র‍্যাল্‌ফ্‌কে আবদুল গফরের সৎ ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তি বলে মনে হলো। স্যার র‍্যাল্‌ফ্‌ বড়লাটের সঙ্গে আলোচনার জন্যে দিল্লী গেলেন। আবদুল গফর মনে করলেন, হয়তো পাখ্‌তুনরা কিছুটা সুবিচার পাবে। কিন্তু বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরে ফিরে এসেই স্যার র‍্যাল্‌ফ্‌ অবিলম্বে আবদুল গফরের গ্রেফতারের ব্যবস্থা করলেন। ১৯৩১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর আবদুল গফরকে গ্রেফতার করা হলো। যুদ্ধবিরতির পর সমগ্র ভারতে আবদুল গফরই সর্বপ্রথম গ্রেফতার হলেন। ঐদিন ডাঃ খান সাহেব ও পেশোয়ার জেলার সমস্ত কংগ্রেস-নেতাদেরও গ্রেফতার করা হলো। পরদিন ২৫শে ডিসেম্বর যিশুখ্রীষ্টের জন্মদিন। ঐদিন বৃটিশ সৈন্যরা সারা পেশোয়ার শহর ছেয়ে ফেললো এবং গ্রামাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ঘাঁটি গাড়লো। চললো খুদাই খিদমতগারদের বিরুদ্ধে অভিযান। এইভাবে খ্রীষ্টান ইংরেজ সরকার ভারতবাসীকে বড়দিনের উপহার দিলো।

ডাঃ খান সাহেবের জ্যেষ্ঠপুত্র সাদুল্লা খান্‌ সদ্য ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসে প্রদেশ কমিটির সদস্য হয়েছিলেন। তাঁকেও গ্রেপ্তার ক'রে তাঁর বাবার ও কাকার সঙ্গে একই ট্রেনে তোলা হলো। ডাঃ খান্‌ সাহেবের দুই পত্নী ছেলেমেয়েদের নিয়ে গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। গভীর রাত্রিতে পুলিস তল্লাসি চালাবার জন্যে সবাইকে বাড়ির বার ক'রে দিলো। ডাঃ খান্‌ সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র ওবেইদুল্লাহ্‌ সেই সবে রোগশয্যা থেকে উঠেছিলেন। তাঁর প্রতিও কোনও করুণা পুলিস দেখালো না। তাঁকেও গ্রেফতার করা হলো। অবশ্য ডাঃ খান্‌ সাহেবের দুই পত্নী তাঁদের নাবালক ছেলেমেয়েদের নিয়ে অব্যাহতি পেলেন। আবদুল গফরের দুই ভগিনী অন্যান্য হাজার হাজার পাখতুন মহিলার মতো আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পুলিস তাঁদের গ্রেফতার করলো না বটে, তবে তাঁদের ছেলেদের সবাইকে গ্রেফতার করলো। ডাঃ খান্‌ সাহেব ও আবদুল গফরের আত্মীয়স্বজন কেউ বাদ গেলেন না। তারপর খুদাই খিদমতগারদের গ্রেফতার চলতে লাগলো। অনেক স্থানে গুলী চালানোও হলো।

ডাঃ খান্‌ সাহেব, আবদুল গফর ও সাদুল্লা খান্‌কে একটি বিশেষ ট্রেনে তুললেও সরকার কিন্তু তাঁদের একত্র থাকতে দিলো না। তারা ডাঃ খান্‌ সাহেবকে পাঠালো নৈনি জেলে, আবদুল গফরকে হাজারিবাগ জেলে ও সাদুল্লা খান্‌কে বেনারস জেলে।

লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক থেকে মহাত্মা গান্ধী রিক্তহস্তে ফিরে এলেন।

তিনি ১৯৩১ সালের ১৮ই ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে অবতরণ করলেন। তিনি ভারতে প্রায় ছয় মাস অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটেছিল। যুদ্ধবিরতি কংগ্রেস পালন করলেও সরকার তার দমননীতি চালিয়ে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচটি অর্ডিন্যান্স জারী হয়েছিল। গান্ধীজী জাহাজ থেকে নেমেই ঘোষণা করলেন, এইসব অর্ডিন্যান্স কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ করার সমতুল্য। তবে তিনি একথাও বললেন, পুনরায় অগ্নিপরীক্ষায় নামবার আগে তিনি সহযোগিতার সমস্ত পথই সন্ধান ক'রে দেখবেন। সমস্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবার জন্যে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকও বসলো। কমিটির অধিকাংশ সদস্য অবিলম্বে আবার সংগ্রাম শুরু করবার পক্ষে হ'লেও গান্ধীজী সরকারের মতামত যাচাই করবার জন্যে কিছুদিন তাঁদের ধৈর্য ধরতে বললেন। তখন কংগ্রেস কমিটির পরামর্শমতো তিনি বড়লাটকে ২৯শে ডিসেম্বর একটি তারবার্তা পাঠালেন। তাতে বললেন, "আমি কাল যখন জাহাজ থেকে নামলাম, তখন বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স ছাড়াও সীমান্ত ও যুক্তপ্রদেশের অর্ডিন্যান্সসমূহ, সীমান্তপ্রদেশে গুলীচালনা এবং সীমান্তপ্রদেশে ও যুক্তপ্রদেশে প্রিয় সহকর্মীদের গ্রেফতার প্রভৃতির সংবাদ শুনবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। এইসব ঘটনাকে আমি আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের অবসানের পূর্বাভাস বলে মনে করব, না, এখনও আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আমি কংগ্রেসকে কি পরামর্শ দেব, সে সম্পর্কে আপনার কাছে পথনির্দেশ নেব, আপনি এরূপ প্রত্যাশা করছেন কিনা বুঝতে পারছি না। তারবার্তায় উত্তর আশা করি।"

৩১শে তারিখে বড়লাটের ব্যক্তিগত সচিব গান্ধীজীর তারবার্তার জবাবে একটি তারবার্তা পাঠালেন। তাতে বলা হলো, সহযোগিতা পারস্পরিক হওয়া চাই। যুক্তপ্রদেশে ও সীমান্তপ্রদেশে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাবের সংগতি মহামান্য বড়লাট ও তাঁর সরকার দেখতে পাচ্ছেন না।...সীমান্তপ্রদেশে আবদুল গফর খান্ ও তাঁর নিয়ন্ত্রিত সংস্থাসমূহ অবিরাম সরকারবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে এবং জাতিবিদ্বেষে প্ররোচনা দিচ্ছেন। আবদুল গফর ও তাঁর বন্ধুরা ক্রমাগত সরকারের সকল আপোসমূলক প্রচেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। দলীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাকে অগ্রাহ্য করেছেন এবং পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য প্রচার চালাচ্ছেন। আবদুল গফর খান্ এমন অসংখ্য বক্তৃতা দিয়েছেন যার অর্থ বিপ্লবে প্ররোচনা দেওয়া ছাড়া কিছু নয় এবং তাঁর অনুগামীরা উপজাতীয়

এলাকায় গোলযোগ সৃষ্টি করছে।...সরকার আবদুল গফর ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থাগ্রহণে বিরতই ছিল। তবে তাঁদের সরকারের সঙ্গে আসন্ন সংঘর্ষের জন্যে প্রকাশ্য ও প্রচার-প্রস্তুতি প্রদেশের ও উপজাতীয় এলাকার পক্ষে যে অতীব আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, তাতে আর বিলম্ব করা সম্ভব ছিল না।..." তিনি তারবার্তায় আরও জানালেন যে, বড়লাট গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত থাকলেও বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও সীমান্তপ্রদেশে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা বৃটিশ সরকারের পূর্ণ অনুমোদন নিয়েই নেওয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে বড়লাট গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা করতে প্রস্তুত নয়।

সুতরাং এই অবস্থায় বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাৎকারের কোনও অর্থ রইলো না। তিনি ১লা জানুয়ারি, ১৯৩২, এর জবাবে যে তারবার্তা পাঠালেন, তাতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তিনি বললেন, "সীমান্তপ্রদেশ সম্পর্কে এ বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, আপনার তারবার্তায় যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাতে আপাতঃদৃষ্টিতে জনপ্রিয় নেতাদের গ্রেফতার করা, বিধিবহির্ভূত অর্ডিন্যান্সসমূহ পাস করা, জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করা, বিশ্বাসভাজন নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্যে নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ জনতার উপর গুলীচালনা প্রভৃতির উপযুক্ত কারণ মেলে না। খান্ সাহেব আবদুল গফর খান্ যদি পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে বলেই থাকেন, তবে ঐ দাবি তো কংগ্রেস ১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনে বিনা শাস্তিতেই করেছে এবং আমিও লণ্ডনে বৃটিশ সরকারের সম্মুখে ঐ দাবিই প্রবলভাবে উত্থাপন করেছি। তাছাড়া, আমি বড়লাটকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কংগ্রেসের আদর্শের মধ্যে ঐরূপ দাবি আছে একথা জানা সত্ত্বেও সরকার আমাকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। দরবারে যোগদান করতে অসম্মত হওয়ার মধ্যেও আমি এমন কিছু দেখি না, যার জন্যে কাউকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা যায়। যদি খান্ সাহেব জাতিবিদ্বেষে প্ররোচনা দিয়ে থাকেন, তবে তা দুঃখজনক সন্দেহ নেই...কিন্তু তা সত্য বলে ধরে নিলেও সেজন্য তাঁর প্রকাশ্য বিচার দাবি করবার অধিকার আছে, সেখানে তিনি অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মসমর্থন করতে পারতেন।..."

ওয়ার্কিং কমিটির একটি প্রস্তাবে বলা হলো: "সীমান্তপ্রদেশ সম্পর্কে সরকারের নিজস্ব বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, অর্ডিন্যান্স জারী করবার, খান্

আবহুল গফর খান্ ও তাঁর সহকর্মীদের গ্রেফতার ও বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করবার মতো উপযুক্ত কোনও কারণ নেই। ঐ প্রদেশে নিরপরাধ ও নিরস্ত্র মানুষকে গুলী করাকে ওয়ার্কিং কমিটি স্বেচ্ছাচারমূলক ও অমানুষিক মনে করে। কংগ্রেস সীমান্তপ্রদেশের নির্ভীক মানুষদের তাঁদের সাহস ও সহনশক্তির জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এইসব নির্ভীক মানুষ যদি গুরুতর প্ররোচনা সত্ত্বেও অহিংসার মনোভাবে অবিচল থাকেন, তবে তাঁদের রক্ত ও দুঃখবরণ দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।…"

ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন আসন্ন দেখে ভারতসচিব স্যামুয়েল হোর ও বড়লাট লর্ড উইলিংডন চণ্ডনীতির দ্বারাই এই আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে সচেষ্ট হলেন। ৪ঠা জানুয়ারি (১৯৩২) সালের ভোরে গান্ধীজী গ্রেফতার হলেন। তাঁকে যারবেদা জেলে অন্তরীণ রাখা হলো। কারাগারে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে তাঁর অনুরাগী একজন ইংরেজকে সীমান্ত প্রদেশ সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা জানতে তিনি অনুরোধ করে গেলেন। এই ইংরেজটি হলেন ভেরিএর এলুইন।

সীমান্ত প্রদেশে সরকার তখন খুদাই খিদমতগার আন্দোলনের উপর নৃশংস আঘাত হানা হয়েছিল। সেখানে কোনও সাংবাদিককে যেতে দেওয়া হচ্ছিল না ; সংবাদপত্রে সেন্সর-করা ছাড়া সীমান্ত প্রদেশের কোনও সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছিল না। এলুইন সর্বপ্রথম সাংবাদিক যিনি ব্যবসায়ী-সংস্থার জনৈক প্রতিনিধির ছদ্মবেশে সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ করলেন। তিনি সীমান্ত প্রদেশের ইংরেজশাসনের যে বীভৎস চিত্র তাঁর রিপোর্টে তুলে ধরলেন, সমগ্র বিশ্বে তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হলো। বিশ-পৃষ্ঠাব্যাপী এই রিপোর্টটিকে সরকার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে নিষিদ্ধ করে দিলো।

ভেরিএর এলুইন পেশোয়ার থেকে খাইবার পাস পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে গোপনে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে অসংখ্য তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি তাঁর বিবরণীতে বলেছেন :

> ২৪শে ডিসেম্বর চীফ কমিশনার তিনটি অর্ডিন্যান্স জারী করে সরকারী কর্মচারীদের ব্যাপকতম অধিকার দিলেন। একটি অর্ডিন্যান্স অনুসারে তারা সন্দেহমাত্রেই লোককে গ্রেফতার করতে, আটক করতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে অধিকারী হলো। জনসাধারণের নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর এমন কোনও কাজ কেউ করেছে, করছে বা করতে যাচ্ছে এমন বিশ্বাস

করবার কারণ আছে বলে সরকার মনে করলে ঐ ব্যক্তিকে কোনও বিশেষ এলাকায় ঢুকতে, বাস করতে বা থাকতে সরকার না দিতে পারে। এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে শাস্তি দু বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, বা জরিমানা, বা কারাদণ্ড ও জরিমানা, দু-ই হতে পারে। যে কোন গৃহ অধিকার করবার, সাধারণের ব্যবহার্য কোনও পণ্যসরবরাহ বন্ধ করবার, বিশেষ আদালত স্থাপন করবার, বিপজ্জনক মনে করলে কোন সংস্থাকে অবৈধ ঘোষণা করবার ব্যাপক অধিকার রাজকর্মচারীদের দেওয়া হয়েছিল। তাই এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে ৪১২৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, তার মধ্যে পেশোয়ার শহর থেকেই ছিল ৩৫৩১ জন।

২৫শে ডিসেম্বর থেকে লালকোর্তাদের প্রধান কাজ হয়েছিল পিকেটিংয়ের জন্যে গ্রাম থেকে শহরে লোক পাঠানো। পুলিস এইসব পিকেটারের নামধাম টুকে নেয়, পিকেটাররা নিয়ম অনুসারে তাদের নামধাম গোপন করে না। তারপর গভীর রাত্রিতে একদল সৈন্য পিকেটারের গ্রামে যায়। সৈন্যরা সাধারণতঃ রাত তিনটেয় পৌঁছে সারা গ্রামটিকে ঘিরে ফেলে এবং বিশিষ্ট লোকদের লালকোর্তাদের হাজির করতে হুকুম দেয়। তাঁরা অস্বীকার করলে তাঁদের বেদম প্রহার করে। কোনও লালকোর্তাকে পেলে তাকে গ্রেফতার করে, প্রহার করে, তার পোশাক খুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। স্থানীয় কংগ্রেস অফিস পুড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। কোনও গ্রামে খাজনা বাকী পড়লে বা গ্রামবাসীরা কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল হলে সারা গ্রামের উপর পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হয়। সেক্ষেত্রে পুলিস গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে হানা দেয়, যা পায় তাই নেয়। অনেক ক্ষেত্রে তারা জেনানায় ঢুকে পড়ে, মেয়েদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে, তাদের গয়নাগাঁটি ছিনিয়ে নেয়। সৈন্যদলের সারিবদ্ধ মার্চ গ্রামবাসীদের কাছে সন্ত্রাসের ব্যাপার। তারা ঘুমুতে পর্যন্ত পারে না। কেউ নিজেকে নিরাপদ মনে করে না। কেউ নিজে নিরপরাধ হলে তার কোনও আত্মীয়ের 'অপরাধের' জন্যে তাকে গ্রেফতার করা হয়। জমির মালিকদের উপর অনেক সময় স্পেশ্যাল পুলিস সরবরাহের জন্যে হুকুম আসে। তারা অস্বীকার করলে, তাদের জেলে ঢুকানো হয়। একটি গ্রামে লালকোর্তাবাহিনীর একজন নায়কের দাদাকে পঁচিশজন

পুলিসের থাকবার খরচ দিতে হুকুম হয়েছিল। তাঁর সে সামর্থ্য ছিল না, তাই তাঁকে জেলে পাঠানো হলো।

কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই দেখলেন যে, বন্দীদের জন্য স্থানসংকুলান করা যাচ্ছে না। তাই তাঁরা পিকেটারদের প্রহারের ব্যবস্থা করলেন। বেদম প্রহার। একজন পুলিস আমাকে বলেছিল, বৃষ্টির মতো লাঠির ঘা পড়ে। আর একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছিল, ঐ মার গাধার পক্ষে সহ্য করাও কঠিন। পিকেটারদের পিটিয়ে সংজ্ঞাহীন করে ফেলা হয়। তখন সঙ্গীরা তাকে বয়ে নিয়ে যায়। গ্রামে এই প্রহার আরও ভয়াবহ। সাধারণত কাউকে পিটিয়ে সংজ্ঞাহীন করে তাকে পুকুর বা নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়।…

সামরিক শক্তি জাহির করেও গ্রামবাসীদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়। রাজকীয় বিমানবাহিনী আকাশ থেকে নানারূপ ভীতি প্রদর্শন করে। সৈন্যবাহিনী গ্রাম ও শহরের পথে মার্চ করে বেড়ায়। কংগ্রেসের নীতির নিন্দা করে বিমান থেকে রাশি রাশি প্রচারপত্র ছড়ানো হয়।

মহান্ পাঠানজাতি অহিংসার প্রকৃত মনোভাব নিয়ে কি সহ্য করছেন, তার কাহিনী আমি বহু প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শুনেছি। স্বেচ্ছা-সেবকদলগুলির দেহ থেকে পাগড়ি, জামা ও জুতো খুলে ফেলা হয়; তারপর তাদের কেবল পায়জামা-পরা অবস্থায় সৈন্যরা পেশোয়ারের পথে পথে মার্চ করায়। উটমনজাইয়ে লোকদের হুকুম দেওয়া হয়, ইউরোপীয় মাত্রকে দেখলেই স্যালুট করতে হবে। তারা তা না করলে তাদের বেদম প্রহার করা হয়। সৈন্যেরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে টাকাপয়সা সংগ্রহ করে, যেন তারা এক-একজন মোগল। তারা প্রত্যেক গ্রামবাসীর কাছ থেকে দেড় টাকা করে নেয়; বলে, দেড় টাকা দিতে যদি না পারিস, তবে তোর বউ টাকা রোজগার করবে, তাকে পাঠিয়ে দিস। এক জায়গায় পুলিস লালকোর্তাদের পরস্পরকে মারপিট করাতে এবং তাদের গ্রামবাসীদের কাছে হাস্যাস্পদ ক'রে তুলবার চেষ্টা করে।

লালকোর্তা আন্দোলন দমনের জন্যে সরকার প্রধানত এইসব উপায় নিয়েছে। লালকোর্তাদের নিজেদের কোনও হিংসাত্মক কাজের

মধ্যে কি তারা এর ন্যায়সংগত কারণ পেয়েছে? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এটি পুরোপুরি বিবেচনা করা দরকার। প্রত্যেকটি লালকোর্তা অহিংসার শপথ নিয়েছে। এই আন্দোলনের নেতারা অবিরাম অহিংসার কথা প্রচার করেছেন। আফ্রিদিরা লালকোর্তাদের ঘৃণা করে, কারণ লালকোর্তারা অহিংস। লোকে যে অসীম ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে লাঠিচার্জ ও গুলী সহ্য করেছে, তার কথা আমাকে অনেক প্রত্যক্ষদর্শীই বলেছেন।···

······বন্দীদের শীতে ভয়ঙ্করভাবে কষ্ট দেওয়া হয়। গ্রেফতার করে তাদের গরম পোশাক ও কম্বল ছিনিয়ে নিয়ে পুরস্কাররূপে পুলিসদের দেওয়া হয়। একটি জেলে বন্দীদের বরাদ্দ কম করে দেওয়া হয়, তাদের চারদিন মাত্র একখানি কম্বল দেওয়া হয়, উদ্দেশ্য নাকি জেলের নিয়ম মেনে চলতে তাদের বাধ্য করা।···কিন্তু একটি কাহিনী আমি শুনেছি – কোহাটের কাছে একটি ফাঁকা জায়গায় একশ বিশজন বন্দীকে সারা রাত্রি বরফ-জমা ঠাণ্ডায় রেখে দেওয়া হয়। সকালে তাদের মার্জনা ভিক্ষা করতে বললে তারা অস্বীকার করে। তখন তাদের বেদম প্রহার করা হয়। তাদের দেহ অসাড় হয়ে গিয়েছিল, তারপর পাহাড় থেকে বইছিল সূচের মতো তীক্ষ্ণ হিমেল হাওয়া—তাদের পক্ষে এ ছিল সহ্যের অতীত; তারা শেষ পর্যন্ত মার্জনা চায়। সংবাদপত্রে যে লালকোর্তাদের মার্জনা-ভিক্ষার এতো সংবাদ বেরোয়, সেগুলি এই ভাবেই আদায় করা হয়।

বর্তমানে লালকোর্তা আন্দোলন আত্মগোপন করেছে। তার মনোবল ভেঙে ফেলা সম্ভব নয়। এমন কি এর সমস্ত সংগঠন আশ্চর্যজনক ভাবে টিকে আছে।···আমার নিজের ধারণা, দমনমূলক ব্যবস্থা কখনই সফল হবে না। সরকার সাময়িকভাবে এখানে মরুভূমির নীরবতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে মাত্র।···

আফ্রিদিরা 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিটির অর্থ আদৌ বোঝে না। তারা মনে করে বুঝি ইনকিলাব একজন জীবন্ত মানুষ, একজন মহান্ নেতা, যিনি মানুষকে মুক্তির পথে নিয়ে যেতে আবির্ভূত হয়েছেন। একদিক থেকে তা সত্য। নেতৃত্বহীন, সংগঠনহীন, কল্পনাতীতভাবে নিপীড়িত নির্ভীক পাঠানরা তাদের নেতারূপে আজ 'ইনকিলাবের'—

রক্তপাতহীন বিপ্লবের—এক অশরীরী আত্মার আশ্রয় নিয়েছে। একে ধ্বংস করা সম্ভব নয়; সত্য, সহন, প্রেম ও দুঃখবরণের মধ্য দিয়ে এ জাতি জয়যাত্রাপথে এগিয়ে যাবে।"

কংগ্রেস ও তার অন্তর্ভুক্ত বা সহযোগী সংস্থাসমূহ অবৈধ ঘোষিত হয়েছিল। ১০ই জানুয়ারির মধ্যে কংগ্রেস-নেতাসহ প্রায় ১০০০ লোক গ্রেফতার হয়েছিলেন। সরকারের দমননীতি কঠোরতম পর্যায়ে পৌছেছিল। ছেলে-মেয়েদের অপরাধের জন্যে তার পিতা ও অভিভাবককেও শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। ব্যাপকভাবে ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত চলছিল। কারাগারে বন্দীদের অবস্থা জঘন্য অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তির চেয়েও দুঃসহ করে তোলা হয়েছিল। বেত্রাঘাত একটি সুপ্রচলিত দণ্ডে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু সরকারের দমন-নীতি যতোই কঠোরতর হচ্ছিল, আন্দোলনে ততোই দলে দলে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। সর্বত্রই নেতৃত্বহীন মানুষ অহিংস সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম চার মাসে প্রায় আশি হাজার লোক কারাবরণ করেছিলেন। বিদেশীবর্জন উচ্চতম পর্যায়ে পৌছেছিল। সমস্ত ইংরেজ ও সরকারী সংস্থাকে বয়কট করা হচ্ছিল। ব্যাঙ্ক, ইনস্যুরেন্স প্রভৃতিও বয়কটের আওতায় পড়েছিল। অনেক স্থানে খাজনা-বন্ধ আন্দোলন চলছিল।

সীমান্ত প্রদেশে যে ব্যাপক দমননীতি চালানো হচ্ছিল, তার ফল সম্পর্কে সরকারের স্বরাষ্ট্রদপ্তর লিপিবদ্ধ করেছিল যে, পেশোয়ার জেলার বাইরে কংগ্রেসের বা লালকোর্তার রিপোর্ট করবার মতো কোনও কার্যকলাপ নেই। ১৯৩২ সালে সংবিধানের কিছু রদবদল করে সীমান্ত প্রদেশকে সরকার চীফ কমিশনার-শাসিত প্রদেশ থেকে গভর্নর-শাসিত প্রদেশে পরিণত করলো। এপ্রিল মাসের গোড়ায় সীমান্ত প্রদেশে নির্বাচন হলো। সরকার সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস ও লালকোর্তার প্রভাব হ্রাস পেয়েছে মনে করেছিল, কিন্তু নির্বাচনের সময়ে তারা লক্ষ্য করলো, এ প্রভাব প্রায় অক্ষুণ্ণই আছে। সরকারী সংস্থা ও আইনসভা বর্জনের যে নীতি কংগ্রেস সংগ্রামের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছিল, পাখতুনরা বিপুল সংখ্যায় তা কার্যকর করলো। সরকারী রিপোর্টে বলা হলো—"তাদের (লালকোর্তাদের) ক্রিয়াকলাপ যে এমন ব্যাপকভাবে দেখা দেবে, তা আশা করা যায় নি। ৭ই এপ্রিল নওশেরা মহকুমায় ভোট-গ্রহণ হলো; লালকোর্তারা বিভিন্ন স্থানে ভোটগ্রহণ-কেন্দ্রে পিকেটিংয়ের চেষ্টা

করলো। তাদের সর্ববৃহৎ বিক্ষোভ-প্রদর্শন ঘটেছিল পাব্বিতে। তিনচার শত স্ত্রীলোক কোরান মাথায় নিয়ে ভোটদাতাদের ভোটদানে বিরত হওয়ার জন্যে অনুরোধ করলো। ১১ই এপ্রিল চরসদ্দাতে ভোটগ্রহণ হলো। এখানে কয়েক হাজার লালকোর্তা হাজির হয়েছিল। মাত্র একজন ভোট দিয়েছিল। পরদিন চরম অবস্থা দেখা দিলো মর্দান মহকুমায়। কাটলাং, হোটি, মর্দান, কালু খান্ ও রুস্তমে বিরাট বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শন ঘটলো। প্রায় ত্রিশ হাজার লোক এইসব বিক্ষোভ প্রদর্শনে অংশ গ্রহণ করেছিল।…"

কংগ্রেস ও লালকোর্তা আন্দোলনের কেশস্পর্শ করতেও যে সরকার সক্ষম হয়নি তা মর্মে মর্মে বুঝলো। ২০শে এপ্রিল তারিখে বড়লাট অনুষ্ঠানিকভাবে সীমান্ত প্রদেশকে গভর্নর-শাসিত প্রদেশে পরিণত করে তার আইনসভার উদ্বোধন করলেন। সীমান্ত প্রদেশকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো কিছুটা স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দেওয়ার ভান করা হলো। স্যার আবদুল কোয়াইয়ুম নামে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ানের নেতৃত্বে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠিত হলো।

কিন্তু বৃটিশ ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সীমান্ত প্রদেশের সমান অধিকার যিনি দাবি করেছিলেন, সেই আবদুল গফর খান্ হাজারিবাগ জেলে পচতে লাগলেন।

বিহারের হাজারিবাগ সেণ্ট্রাল জেলে একটি নির্জন ব্যারাকে আবদুল গফরকে রাখা হয়েছিল। তিনি খুনী আসামী নয়, রাজবন্দী। তবু তাঁর সঙ্গে কাউকে দেখা করতে দেওয়া হতো না। এমন কি তাঁর ব্যারাকের সামনে দিয়েও কাউকে হাঁটতে দেওয়া হতো না। তিনি যেসব চিঠিপত্র লিখতেন, তা কর্তৃপক্ষ আটকে রাখতো। তিনি তাঁর ছেলেমেয়েকে ও দাদাকে যে চিঠি লিখতেন, সেগুলিই কেবল অনেক বিলম্বে ও কাটছাঁটের পর তাঁদের দেওয়া হতো। তাঁর তিন ছেলের মধ্যে বড় ছেলে ছিলেন পড়বার জন্যে আমেরিকায় ও মেজ ও ছোট ছেলে পড়তেন দেরাদুনের স্কুলে ও মেয়ে থাকতেন মুরীতে একটি কনভেণ্টে। তাঁকে লেখা চিঠিপত্র তাঁকে দেওয়া হতো না। তাঁকে খবরের কাগজ দেওয়া হতো না। তাই তিনি বাইরের জগৎ থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তিনি নিজেকে কোন কাজে ব্যস্ত রাখবার জন্যে ছোট্ট একটি শাকসবজি ও পেঁপের বাগান গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু নির্জনতা ক্রমেই তাঁর পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। একবার হাজারিবাগের ডেপুটি কমিশনার জেল

পরিদর্শন করতে এলে আবদুল গফর তাঁর এই দুঃসহ নির্জনতা সম্পর্কে অনুযোগ করলেন। ফলে ডেপুটি কমিশনার বিহার ও উড়িষ্যার চীফ সেক্রেটারিকে লিখলেন :

> আজ সকালে হাজারিবাগ জেলে খান্ আবদুল গফর খানের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি জেলকর্তৃপক্ষকে কোন অসুবিধায় ফেলেন নি; সংবাদপত্র ও দেখাসাক্ষাতের ব্যাপারে তবু অন্যান্য বন্দীদের থেকে তাঁর ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হচ্ছে; সেজন্য তিনি যে সত্যই ক্ষুব্ধ তা তিনি আমাকে ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জানিয়েছিলেন। চিঠিপত্র আটক করার ব্যাপারে তিনি তীব্র ক্ষোভ পোষণ করেন। পৃথক ভাবে আটক রাখায় তিনি নিঃসঙ্গ বোধ করছেন। আমি এটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করি যে, তাঁর চিঠিপত্র, সংবাদপত্র সরবরাহ ও সাক্ষাৎকারের প্রশ্নে আশু অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। তিনি জেলে আসবার পর থেকে কোন চিঠিপত্র পান নি; সম্ভবতঃ তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত চিঠিপত্র সবই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল সব পুলিসের কাছে এখনও রয়েছে।"

এ বিষয়ে বিহার ও উড়িষ্যা সরকারের সেক্রেটারি ভারতসরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিবকে এ বিষয়ে অনুমতি চেয়ে লিখে পাঠালেন। তাঁরা এ-ও জানালেন যে, কাজী আতাউল্লাহ্ খান্ গয়া জেলে আটক আছেন। তাঁকে আবদুল গফরকে সঙ্গদানের জন্যে হাজারিবাগ জেলে পাঠানো যাবে কিনা। সরকার কাজী আতাউল্লাকেও আবদুল গফরের মতোই বিপজ্জনক ব্যক্তি মনে করতো। কারণ আবদুল গফর উটমনজাইয়ে যে আজাদ হাইস্কুল গড়ে তুলেছিলেন, কাজী আতাউল্লাহ্ ছিলেন তাতে শিক্ষক এবং পরবর্তীকালে খুদাই খিদমতগার-সংস্থার অন্যতম প্রধান সংগঠক। কাজী আতাউল্লাহ্‌কে হাজারিবাগ জেলে না পাঠিয়ে ভারত সরকার নৈনি জেল থেকে ডাঃ খান্ সাহেবকে এনে হাজারিবাগ জেলে আবদুল গফরের সঙ্গে একত্র রাখবার ব্যবস্থা করলো। শেষ পর্যন্ত আবদুল গফরের ভয়াবহ নিঃসঙ্গ দিনগুলির অবসান হলো।

ডাঃ খান্ সাহেব ও আবদুল গফর দুজনেই রাজবন্দী। অথচ নৈনি জেলে ডাঃ খান্ সাহেব রাজবন্দীর সকল সুযোগ-সুবিধাই পাচ্ছিলেন। তাঁদের উভয়কে একই আইনে আটক করা হলেও খান্ সাহেবের পরিবারের জন্য সরকার যখন মাসিক সাত শ টাকা ভাতা দিচ্ছে, তখন তাঁর সম্পর্কে তারা নীরব। অথচ

অর্থাভাবে তাঁর ছেলেমেয়েরা কে কোথায় কিভাবে কাটাচ্ছে, তা-ও তিনি জানতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে তিনি সরকারকে জানালেন। জবাবে সরকার বললো, আবদুল গফর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আগেই তিন পুত্রকে দান করে দিয়েছেন। ঐ সম্পত্তির আয় থেকে তাঁর প্রত্যেক পুত্রের আয় মাসে এক হাজার টাকা। সুতরাং আবদুল গফরকে পারিবারিক ভাতা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। অথচ প্রকৃত অবস্থা ছিল অন্যরূপ। আবদুল গফরের পুত্রকন্যা সকলেই ছিলেন সীমান্ত প্রদেশের বাইরে। সীমান্ত প্রদেশে ফিরে যাওয়া তাঁদের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। ফলে জমিদারির আয় তাঁরা কিছুই পাচ্ছিলেন না। সরকারের উসকানিতে প্রজারাও জমিদারকে তাঁর প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করছিল।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি ডাঃ খান্ সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র ওবেইদুল্লাহ্ খান্ তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল কোনও স্থানে না রাখায় মুলতান জেলে অনশন ধর্মঘট করলেন। সংবাদপত্রের মারফত এই অনশন-ধর্মঘটের সংবাদ পিতা ও পিতৃব্য দুজনেই পেলেন। ওবেইদুল্লাহ্ খানের ধর্মঘট বা তাঁর স্বাস্থ্যের সম্পর্কে কোনও সংবাদ সরকার তাঁর পিতা বা পিতৃব্যকে দেয় নি। তাঁরাও সরকারের কাছে ঐ সম্পর্কে কোনও আবেদন-নিবেদন করেন নি। পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্রকে তাঁরা কেউ অনশন ভঙ্গ করতেও পরামর্শ দিলেন না। ওবেইদুল্লাহ্ তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্য সত্ত্বেও দিনের পর দিন অনশন করে গেলেন। জেল-কর্তৃপক্ষ তাঁর দাবির প্রতি সুবিচার না করে তাঁকে বলপ্রয়োগে খাদ্যগ্রহণে বাধ্য করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হলো। ওবেইদুল্লাহ্‌র অনশন আড়াই মাস অতিক্রম করে গেল। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে পিতা ও পিতৃব্য তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কে কতকগুলি নির্দেশ পাঠালেন। কিন্তু এই নির্দেশগুলি পাঠাবার দু-একদিনের মধ্যেই সংবাদ এলো যে, ওবেইদুল্লাহ্ তাঁর দাবি আদায় করেছেন। তাঁকে মুলতান থেকে শিয়ালকোট জেলে আবার স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানেই আটাত্তর দিন অনশনের পর তিনি অনশন ভঙ্গ করেছেন।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চমাসে বিহার ও উড়িষ্যা সরকার ভারত সরকারকে লিখে জানালো যে, হাজারিবাগ জেলে আবদুল গফর ও ডাঃ খান্ সাহেবকে দীর্ঘকাল একস্থানে আটক রাখায় তাঁদের মানসিক অবস্থার অবনতি ঘটছে। তাঁদের অন্য কোথাও বদলি করা বা জেল থেকে মুক্তি দিয়ে কোথাও অন্তরীণ রাখা যায় কিনা বিবেচনা করা উচিত।

প্রকৃতপক্ষে, ডাঃ খান্ সাহেব হাজারিবাগ জেলে আসবার পর আবদুল গফরের নিঃসঙ্গতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল। তাঁরা এখন দুজনে একটু-আধটুকু বেড়াতেও পেতেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আচার্য কৃপালনী প্রভৃতি রাজনৈতিক নেতারাও অনেকে এই জেলে ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগও তাঁরা করে নিতেন। আবদুল গফর এই জেলের ছোট সাহেব বা জেলর সম্পর্কে বলেছেন, তিনি মানুষটি ভালো ছিলেন, দেশ-প্রেমিকদের সম্পর্কে তাঁর দরদ ছিল। তাঁর সঙ্গে তাঁরা এই ব্যবস্থা করে ছিলেন যে, কোনও রাজবন্দী যখন মুক্তি পাবেন, তখন যেন তাঁদের জানানো হয়, তাঁরা তাঁকে চা-পানে আপ্যায়িত করবেন। এই রকম চা-পানের বর্ণনা দিয়েছেন আবদুল গফর :

> আমাদের একটি টী-পার্টিতে আমাদের অতিথির জন্যে আমি নিজে চা ঢেলে তাঁকে চায়ের কাপ ও পকৌড়িভাজার প্লেট দিয়েছিলাম। ডাঃ খান্ সাহেব তাঁর পাতে একখানা বেগুন ভাজাও দিলেন। আমাদের অতিথি চা ও ভাজাভুজি খেলেন, তারপর তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললেন, "ভাবুন তো! একদিন একজন মুসলমান পিয়ন আমার বাড়িতে চিঠি বিলি করতে এসেছিল। সে চিঠিখানার এক কোণে ধরে ছিল, আমি আঙুলের ডগা দিয়ে চিঠিখানার অন্য কোণ ধরে খুবই সন্তর্পণে নিচ্ছিলাম। আমার ভাই আমার এই কাজ দেখে অবিলম্বে আমার হাতে জল ঢেলে দিয়ে বললো, তুমি অশুচি হয়েছ!"

বিহারীদের এই গোঁড়ামি সত্ত্বেও বিহারী নরনারীর দেশপ্রেম আবদুল গফরকে মুগ্ধ করেছিল।

১৯৩৪ সালের ১৭ই আগস্ট আবদুল গফর জেলে গান্ধীজীর অনশনের সহানুভূতিতে সপ্তাহকাল অনশন করেন। এই সময়ে সীমান্ত সরকার ভারত সরকারকে লিখে জানালো যে, মহাত্মা গান্ধী তাঁর অনশনশেষে সীমান্ত প্রদেশ সফরে আসবেন। তিনি সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আবদুল গফর খানের মুক্তির জন্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। এ ব্যাপারে তিনি অনশন করতেও পারেন। এই পরিস্থিতি এড়াবার জন্যে ভারত সরকার যদি আবদুল গফর খান্ ও ডাঃ খান্ সাহেবকে মুক্তি দেন এবং তাঁদের উত্তর-পশ্চিম

সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে প্রবেশ করতে না দেন, তবে তাতে সীমান্ত-প্রদেশ সরকারের কোনও আপত্তি নেই।

ভারত সরকার এই পরামর্শ অনুসারেই কাজ করলেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে আগস্ট তারিখে আবদুল গফর ও ডাঃ খান্ সাহেব মুক্তি পেলেন। তবে তাঁদের উপর পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রইলো।

১০.

শুভদিবসের মুক্তি : বিচার ও কারাদণ্ড : মুক্তিলাভ :

আবদুল গফরকে মুক্তি দেওয়া হলো, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে সরকারের দুশ্চিন্তার অন্ত রইলো না। এই সময়ে স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ হ্যালেট তাঁর গোপন নোটে লেখেন :

> মুক্তি পেলে আবদুল গফর খান্ কি করবেন, বা তাতে সীমান্ত-প্রদেশে কি প্রতিক্রিয়া হবে, তার কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। এটা খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচ্য ছিল যে, তাঁকে সকলে দেবতার মতো কিছু একটা মনে করে। মহামান্য গভর্নর এ বিষয়ে দৃষ্টান্তও দিয়েছেন; আবদুল গফর খানের পরামর্শে যেসব কূপ খনন করা হয়েছিল, সেইসব কূপের জল লোকে অশুভনিবারক ও রোগপ্রতিষেধক বলে মনে করে ও বহু দূর দূর স্থান থেকে সেগুলির জল নিয়ে যায়। এটা খুবই সম্ভব ছিল যে, তিনি এসে পৌছলে তা প্রসুপ্ত আন্দোলনকে প্রেরণা যোগাবে। উটমনজাইয়ের মতো স্থানগুলিতে তিনি গেলে অসংখ্য নরনারী ভীড় করে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে আসবে এবং তখন কি ঘটবে, বলা যায় না।...এটাও খুবই সম্ভব যে, তিনি যদি রাজদ্রোহমূলক কাজ না-ও করেন, তিনি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে লাল কোর্তাদের একটি প্রচার-বাহিনীতে পরিণত করবেন, তার ফলে তারা নির্বাচনকে করায়ত্ত করে ফেলবে।...তাঁকে যদি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব থেকে বহিষ্কার করা হয়, তবে তিনি কিভাবে সীমান্ত প্রদেশবাসীর দ্বারা

অভিনন্দিত হচ্ছেন, তাঁর প্রভাব অক্ষুণ্ণ আছে কি না, তা লক্ষ্য করা সহজ হবে।

কিন্তু সরকার এই রকম লক্ষ্য করেই ক্ষান্ত হলো না। তাঁকে শীঘ্র আবার কিভাবে কারারুদ্ধ করা যায়, তার ফিকির খুঁজতে লাগলো। হাজারিবাগ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আবদুল গফর ও ডাঃ খান্ সাহেব বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে পাটনা গেলেন। এখানে তাঁদের বিপুল ভাবে সংবর্ধনা জানানো হলো। আবদুল গফর তাঁর বিহারী ভাইবোনদের উদ্দেশে একটি ভাষণ দিলেন।

এই প্রথম বক্তৃতার উপরই ভারত সরকারের আইনসচিব কড়া নজর দিলেন। তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন :

> আমি একাধিকবার বক্তৃতাটি সযত্নে পড়েছি। একথা সত্য যে, বক্তা দাসত্ব ও 'বিদেশী শাসনের' অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্যে হিংসার কথা বলেন নি। আমার অভিজ্ঞতায় আমি লক্ষ্য করেছি যে, এমন কি সরকারী কৌঁসুলিরাও প্রায়ই ১২৪-ক ধারার অন্তর্গত মামলা-গুলিতে এই বিষয়টি লক্ষ্য করেন না যে, হিংসার প্ররোচনাদান' বা হিংসাত্মক উপায় অবলম্বনের জন্য প্রচার ১২৪-ক ধারার অন্তর্গত অপরাধের প্রয়োজনীয় উপাদান নয়। ১২৪-ক ধারার অন্তর্গত অপরাধের জন্য প্রয়োজন হলো এই যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তার বক্তৃতা, রচনা বা সংকেতাদির দ্বারা বৃটিশ ভারতে আইনানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা বা বিদ্বেষ জাগিয়েছে বা জাগাতে চেষ্টা করেছে বা আনুগত্য ত্যাগ করাতে প্ররোচিত করেছে বা চেষ্টা করেছে।···(আইন-সদস্য এখানে তিলকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের বিখ্যাত মামলাটিরও উল্লেখ করেন।)···এখানে সমগ্র বক্তৃতাটির দ্বারা শ্রোতার মনে এই বিশ্বাস জন্মাতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, বর্তমান বিদেশী শাসন একটি অভিশাপ, বর্তমান সরকার স্বৈরাচার ও অত্যাচারের অপরাধে অপরাধী এবং হিন্দু ও মুসলমানের কর্তব্য হলো এইরকম সরকারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য এবং নিজেদের তাদের বর্তমান দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মিলিত হওয়া।···

এইরকম বিশ্লেষণের দ্বারা সুযোগ্য আইনসচিব বোঝাতে চাইলেন যে, সরকার আবদুল গফরকে এই ধরনের যে কোনও বক্তৃতা বা রচনার জন্যে

সহজেই জেলে পুরতে পারেন। তবে পাটনার বক্তৃতার জন্যে আবদুল গফরের বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না ক'রে ভারত সরকার তাঁর সমস্ত বক্তৃতাগুলির উপর প্রাদেশিক সরকারগুলিকে কড়া নজর রাখতে এবং তার পুরো বিবরণ ভারত সরকারের কাছে পাঠাতে নির্দেশ দিলো। এইভাবে সরকার আবদুল গফরের বিরুদ্ধে আবার তার ভয়াবহ জাল বিস্তার ক'রে চললো।

৩০শে আগস্ট তারিখে আবদুল গফর গয়া গেলেন এবং সেখানে কিষাণ-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন। গয়া থেকে তিনি গেলেন এলাহাবাদে। ২রা সেপ্টেম্বর এলাহাবাদে তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হ'লো। সেখানে পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি ভাষণ দিলেন। এলাহাবাদ থেকে আবদুল গফর ও ডাঃ খান্ সাহেব যমুনালাল বাজাজের অতিথিরূপে ওয়ার্ধা গেলেন। ইচ্ছা, তাঁরা সেখানে গান্ধীজীর কাছে কিছুদিন থাকবেন।

ঐ বৎসর বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি কংগ্রেসের অনেক নেতা ঐ বৎসর আবদুল গফরকে কংগ্রেসের সভাপতি করবার জন্যে প্রস্তাব করলেন। তাঁকে এ বিষয়ে জানানো হ'লে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "আমি একজন সৈনিক, আমি খোদার সেবক। আমি কেবল সেবা করতেই পারি।" এ বিষয়ে ৪ঠা সেপ্টেম্বর তিনি একটি বিবৃতি দিয়ে বললেন :

"এই বছরের কংগ্রেস অধিবেশনে আমাকে সভাপতি করবার জন্যে বোম্বাইয়ে একটি চেষ্টা চলছে দেখছি। যেসব বন্ধু এই চেষ্টা করছেন, তাঁদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের আমি প্রশংসা করি। আমার মতো একজন মুসলমানের উপর গুরুত্বপূর্ণ সম্মান আরোপ করে তাঁরা হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের আদর্শকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন। এটাও নিঃসন্দেহ যে, আমাকে এই সম্মান দেখিয়ে তাঁরা আমার প্রদেশ স্বাধীনতা-সংগ্রামে যে ত্যাগ স্বীকার করতে সমর্থ হয়েছে, সেজন্য দেশের পক্ষ থেকে তাকে উপযুক্ত মর্যাদাদানের ইচ্ছাও এতে আছে। কিন্তু আমি আগেও বহুবার বলেছি, এখনও বলছি, আমি সামান্য সৈনিকমাত্র। আমার জীবনের উচ্চাশা হ'লো সেনাপতিরূপে নয়, সৈনিকরূপেই, জীবন অতিবাহিত করা।...আমি তাই দয়া করে যাঁরা এই চেষ্টা করছেন, তাঁদের আন্তরিক-

ভাবে জানাচ্ছি, তাঁরা যেন অনুগ্রহ ক'রে এই প্রস্তাব ত্যাগ করেন। তবে সেই সঙ্গে একথাও আমি বলব যে, আমার প্রদেশকে সাহায্য করবার আরও অনেক উপায় আছে।"

প্রায় তিন বছর পরে গান্ধীজীর সঙ্গে আবদুল গফর ও ডাঃ খান্ সাহেবের সাক্ষাৎ হ'লো। তাঁরা গান্ধীজীর কাছেই রইলেন এবং নানা আলোচনায় ও আনন্দে দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন। গান্ধীজী তাঁর উপাসনা-সভায় প্রায়ই আবদুল গফরকে কোরান পাঠ করে শোনাতে বলতেন। তাঁরা প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় একসঙ্গে ভ্রমণে যেতেন। ভ্রমণশেষে ফিরে এলে আবদুল গফর রোজ গান্ধীজীর পা ধোয়ায় সাহায্য করতেন—ও কাজটি সাধারণত কস্তুরবাঈ করতেন।

এই সময়ে আবদুল গফরের মেয়ে মেহেরা তাজ ছিলেন লণ্ডনে একটি কনভেণ্টে। ডাঃ খান্ সাহেবের ইংরেজ পত্নী ও তাঁর গর্ভজাত সন্তানরাও লণ্ডনে ছিলেন। আবদুল গফর তাঁর মেয়েকে দেশে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। মীরাবেন ছিলেন বিলাতে, তাঁর শীঘ্রই ভারতে আসবার কথা ছিল। গান্ধীজী মীরাবেনকে এক পত্রে জানালেন যে, তিনি যেন ভারতে আসবার সময়ে আবদুল গফরের কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন।

ওয়ার্ধায় সেপ্টেম্বর মাসে ওয়ার্কিং কমিটির যে বৈঠক হ'লো, তাতে মওলানা আজাদও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন যে, বাংলাদেশের মুসলমানরা তাঁকে দেখবার জন্যে উৎসুক। তাছাড়া, কলকাতায় বহু পাঠান দোকানদারও আছেন, যাঁরা আবদুল গফরের সঙ্গে মিলিত হতে চান। গান্ধীজী কিন্তু আবদুল গফরের বাংলা সফর সম্পর্কে উৎসাহ দেখালেন না, কারণ তাঁর ভয় ছিল বাংলা দেশে গেলে কোন-না-কোন ছুতায় সরকার আবদুল গফরকে গ্রেফতার করবে। কিন্তু আবদুল গফরের ইচ্ছা ও মওলানা আজাদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তিনি রাজী হলেন। তবে তাঁর বক্তব্যাদি সম্পর্কে গান্ধীজী তাঁকে সতর্ক ক'রে দিলেন।

আবদুল গফর ও ডাঃ খান্ সাহেবের সংবর্ধনার জন্যে ৩০শে সেপ্টেম্বর কলকাতায় টাউনহলে এক বিরাট জনসভা হ'লো। এই সভায় ভাষণপ্রসঙ্গে আবদুল গফর হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করলেন। ২রা অক্টোবর এলবার্ট হলে ছাত্রদের পক্ষে আবদুল গফরকে সংবর্ধনা জানানো হ'লো। এই সভায় তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বললেন: "আমি অনুরোধ করি, আপনারা

আমাকে সীমান্ত-গান্ধী বলবেন না, কারণ, গান্ধী একজনই আছেন। যদি দুজন থাকেন, তবে কলহ অনিবার্য। মহাত্মা গান্ধী আমাদের সেনাপতি, সেনাপতি একজনই থাকা উচিত। আমার নামের সঙ্গে গান্ধী নামটি যোগ করবেন না। আপনারা আমার উপর যে সম্মান বর্ষণ করছেন, আমি তার উপযুক্ত নই।" তিনি বাংলার যুবকদের খুদাই খিদমতগার আন্দোলনের মতো আন্দোলন শুরু করতে এবং নিজেদের হৃদয়কে কলুষমুক্ত ক'রে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গ'ড়ে তুলতে আহ্বান জানালেন।

তিনি কলকাতার সভাগুলিতে বারবার দৈন্যদুঃখপীড়িত গ্রামবাসীদের কথা চিন্তা করতে, তাদের সেবা করতে বললেন। তিনি নিজেও বাংলার গ্রামে যেতে চাইলেন। তিনি ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকটি গ্রামে গেলেন। তারপর গেলেন বোলপুরে শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ছাত্র ও আশ্রমিকদের এক সভায় সাদর সম্ভাষণ জানালেন। আবদুল গফরের জ্যেষ্ঠপুত্র অর্থাভাবে আমেরিকায় পড়া বন্ধ ক'রে ফিরে এসেছিলেন এবং বিশ্বভারতীতে পড়াশুনো করছিলেন। শান্তিনিকেতনে আবদুল গফর মাত্র একদিন ছিলেন। তবু তিনি ঐ স্বল্পসময়ে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের সকল বিভাগ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। উত্তরায়ণের প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথ উর্দু-ভাষায় তাঁকে বিদায়-অভিনন্দন জানালেন।

শান্তিনিকেতন থেকে আবদুল গফর ও ডাঃ খান্‌সাহেব রায়পুর হয়ে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানের জন্যে ১৯শে অক্টোবর বোম্বাই ফিরলেন। স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকারা বাদ্যভাণ্ডসহ তাঁদের সাদর অভিনন্দন জানালো। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি কে. এফ. নরিম্যান তাঁদের মাল্যভূষিত করলেন। আবদুল গফর ও ডাঃ খান্‌সাহেব কংগ্রেসনগরে গান্ধীজীর জন্য নির্মিত বিশেষ কুটিরে গান্ধীজীর সঙ্গেই রইলেন।

এবার বোম্বাইয়ে আবদুল গফরের নামেই কংগ্রেসনগরের নামকরণ হয়েছিল। ২৬শে অক্টোবর দীর্ঘ সাড়ে তিন বৎসর পরে কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হ'লো। প্রায় ষাট হাজার প্রতিনিধি ও দর্শক এই অধিবেশনে যোগ দিলেন। এই কংগ্রেসেই একটি নিখিল ভারত গ্রামীণ শিল্প সংস্থা গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হলো। এই প্রস্তাবের সমর্থনে আবদুল গফর বললেন :

> রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া দেশের অগ্রগতি অসম্ভব। আমরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে করছি এবং করতে থাকব। কিন্তু কংগ্রেস এমন

একটি প্রতিষ্ঠান, সমগ্র ভারতকে সেবা করাই তার কাজ। তাই এটা উপলব্ধি করা চাই যে, ভারতের সমগ্র অধিবাসীর শতকরা আটানব্বই ভাগ গ্রামে বাস করে। গ্রামে বাসকারী এই বিশাল জনসমাজের কথা কংগ্রেসকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে। গ্রামবাসীদের অসুবিধা ও প্রয়োজন কি, তা জানবার জন্যে আমাদের গ্রামে গ্রামে যেতে হবে। গ্রামবাসীরা অনাহারে ও প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় রয়েছে। তাদের অবস্থা না দেখলে উপলব্ধি করা যায় না। তাদের ছেলেমেয়েরা এতো ভীতু যে, তাদের কাছে গেলে তারা পালিয়ে যায়। আমি ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশে যা দেখেছি, তা-ই বলছি। যেসব গ্রামে চরকা-সংঘের কর্মীরা গেছেন এবং যেখানে চরকা চলছে, কেবল সেখানেই লোকে দুবেলা অন্ততঃ একবার পেট ভরে খেতে পাচ্ছে। আমি তাদের বাড়িতে গেছি, বাড়িগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। যেখানে চরকা চলছে না, সেখানে দেখেছি, লোকে অনাহারে মুখ লুকিয়ে আছে। চরকার মাধ্যমে লোকে কেবল জীবিকার্জন করছে না, তাদের রাজনৈতিক চেতনাও বাড়ছে। তারা নিজেদের অন্তর থেকে ভয়কে দূর করেছে। কিন্তু যেসব স্থানে কোনও গঠনমূলক কাজ করা হচ্ছে না, সেখানে গ্রামবাসীদের অবস্থা শোচনীয়। আমরা যতোক্ষণ না তাদের মধ্যে বাস করছি এবং তাদের উন্নতির জন্যে কাজ করছি, ততক্ষণ স্বরাজলাভ অসম্ভব।…”

নিখিল ভারত গ্রামীণ শিল্প সংস্থা গঠিত হ'লে গান্ধীজী আবদুল গফরকে তার কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য করলেন। তিনি গান্ধীজীর অনুরোধে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হলেন।

আবদুল গফর দশদিন বোম্বাইয়ে ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি কয়েকটি জনসভায় ভাষণ দেন। ২৭শে অক্টোবর তিনি ভারতীয় খ্রীষ্টান এ্যাসোসিয়েসন কর্তৃক আয়োজিত সভায় পাঠানদের প্রতি ইংরেজ সরকারের অবিচার ও খুদাই খিদমতগার আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা করলেন। বোম্বাই সরকার ভারত-সরকারকে জানালো যে, ২৭শে ও ২৯শে অক্টোবরের বক্তৃতাগুলি কিছুটা আপত্তিকর এবং ১২৪-ক ধারাবলে অভিযুক্ত করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

নভেম্বরের গোড়ার দিকে আবদুল গফর বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে গিয়ে স্থায়িভাবে তাঁর কাজ করবার পরিকল্পনা সম্পর্কে গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা

করলেন। তিনি গ্রামবাসীদের অবস্থা ভালোভাবে বুঝবার জন্যে ওয়ার্ধার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতেও ঘুরলেন এবং গ্রামাঞ্চলে অনেকগুলি জনসভাতে বক্তৃতাও দিলেন। নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি একবার কয়েকদিনের জন্য যুক্ত প্রদেশে গেলেন। ২৭শে নভেম্বর তিনি মথুরায় এক জনসভায় বক্তৃতা দিলেন এবং ঐ দিন মোটরে করে আলিগড় গেলেন। আলিগড়ে তাঁকে এক বিরাট শোভাযাত্রা করে লায়াল লাইব্রেরিতে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে তিনি বিরাট জনসাবেশে ভাষণ দিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানকে বিরোধ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের জন্য আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, হিন্দুই হোক, মুসলিমই হোক, তারা কোন ধর্ম ও সংস্কৃতির বড়াই করতে পারে না। কারণ ক্রীতদাসের কোন ধর্ম বা সংস্কৃতি থাকতে পারে না।

আবদুল গফরের এই সক্রিয়তা ও জনপ্রিয়তা সরকারকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুললো। সীমান্ত প্রদেশকে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত করবার জন্যে সরকার তাঁকে সীমান্ত প্রদেশের বাইরে রেখেছিল। কিন্তু এখন বোম্বাই থেকে বাংলা পর্যন্ত তাঁর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়ায় তা সরকারের পক্ষে আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠলো। ৪ঠা ডিসেম্বর আবদুল গফর ওয়ার্ধায় ফিরে এলেন।

এই সময়ে আবদুল গফরের চতুর্দশবর্ষীয়া কন্যা মেহেরা তাজ মীরাবেনের সঙ্গে ইংলণ্ড থেকে ওয়ার্ধায় এসে পৌঁছেছিলেন। তাঁর ছেলেরা—গনি, ওয়ালি ও আলি—তাঁরাও ওয়ার্ধায় এসেছিলেন। ওয়ার্ধা এখন আবদুল গফরের স্বগৃহ হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘকাল পরে আবদুল গফর তাঁর পুত্র-কন্যাদের একসঙ্গে কাছে পেয়ে খুশী হয়ে উঠলেন।

কিন্তু তাঁর এই আনন্দ স্বল্পকাল স্থায়ী হ'লো। ৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ওয়ার্ধার জেলা পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পুলিস কর্মচারীসহ ওয়ার্ধায় সত্যাগ্রহ-আশ্রমে এসে আবদুল গফরের খোঁজ করলেন। তখন আবদুল গফর দোতলায় গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপ করছিলেন। পুলিস আসবার সংবাদ দিলেন মীরাবেন। গান্ধীজী পুলিস অফিসারদের উপরে আনতে বললেন। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উপরে এসে জানালেন যে, তিনি ১২৪-ক ধারাবলে একটি অভিযোগক্রমে আবদুল গফরকে গ্রেফতার করতে এসেছেন। আবদুল গফর কখন প্রস্তুত হতে পারবেন, পুলিস-সুপার জিজ্ঞাসা করলে, আবদুল গফর বললেন, তিনি সর্বদাই প্রস্তুত। গান্ধীজী বললেন, পুলিস-সুপার যদি অনুমতি দেন, তবে আবদুল গফর যমুনালাল বাজাজের গৃহে তাঁর দাদা ও পুত্রকন্যাদের সঙ্গে একবার দেখা করে যাবেন।

গান্ধীজী ও আশ্রমবাসীরা পুলিস ভ্যানে ওঠা পর্যন্ত আবদুল গফরের সঙ্গে এলেন। পুলিস ভ্যান আবদুল গফরকে নিয়ে যমুনালালজীর গৃহে গেল। পুত্র-কন্যারা কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু আবদুল গফরের চোখে জল দেখা দিলো না। পুলিসের সঙ্গে তিনি বিদায় নিলেন।

১৩ই ডিসেম্বর তাঁকে বোম্বাইয়ের চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হলো। সরকার পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হলো, ২৭শে অক্টোবর তিনি ভারতীয় খ্রীষ্টান এ্যাসোসিয়েনের সভায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা রাজদ্রোহমূলক এবং ১২৪-ক ধারাবলে দণ্ডনীয়। ভুলাভাই দেশাই, কে. এম. মুন্সী প্রভৃতি বিখ্যাত আইনজীবীরা আবদুল গফরের পক্ষ সমর্থন করলেন। বিচারের প্রহসন হলো। ১৫ই ডিসেম্বর চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল গফরকে ছ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

আবদুল গফর এ সম্পর্কে বলেন :

> আমি রাজদ্রোহমূলক কিছুই করিনি। কারণ খ্রীষ্টানরা ইংরেজদের সমধর্মী, তাঁদের সভায় আমি কিভাবে রাজদ্রোহের কথা বলতে পারি? আমার আসল রাজদ্রোহটা ছিল এই যে, বাংলাদেশের পদদলিত মুসলমান-দের জন্যে আমার মনে দরদ ছিল, তাদের আমি ভালোবাসতাম, তাদের সেবা করবার, সুখী করবার জন্যে আমার প্রাণ কাঁদতো। এই পাপের জন্যই আমাকে গ্রেফতার করা হলো। সরকার জানতো, ৮ই ডিসেম্বর নাগাত আমি বাংলাদেশে যাব। বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে আমি কাজ করি, সেটা এদের সহ্য হলো না।

আবদুল গফরকে কয়েকদিন বোম্বাইয়ের বাইকুলার হিজ ম্যাজেষ্টিজ হাউস অব করেকশনে রাখা হ'লো। তারপর তাঁকে ২৯শে ডিসেম্বর সবরমতী জেলে স্থানান্তরিত করা হলো। জেলের রান্না ও এখানকার জলবায়ু আবদুল গফরের সহ্য হচ্ছিল না। শীঘ্রই তাঁর ক্ষুধামান্দ্য দেখা দিল এবং তিনমাসে তাঁর ওজন ১৬৮ পাউণ্ড থেকে ১৪৯ পাউণ্ডে নেমে গেল। আবদুল গফর তাঁকে এই জেল থেকে স্থানান্তরিত ক'রে সীমান্ত প্রদেশের কোন জেলে বা পাঞ্জাবের গুজরাট জেলে রাখবার জন্যে অনুরোধ করলেন। ভারত সরকার সীমান্তপ্রদেশ সরকার ও পাঞ্জাব সরকারকে জানালে তারা আপত্তি করলো। তখন ভারত সরকার যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের সরকারগুলির দ্বারস্থ হলো। তারা বললো, গান্ধীজী তাদের প্রদেশে আশ্রম করায় এমনিতে তারা শশব্যস্ত, সুতরাং তারা আবদুল

গফরের মতো একজন বিপজ্জনক বন্দীকে রাখতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যুক্তপ্রদেশ সরকার তাদের বেরিলি জেলে আবদুল গফরকে ঠাঁই দিতে রাজী হলো।

আবদুল গফর তাঁর এইবারের জেলে অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেছেন :

সবরমতী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খুব কড়া লোক ছিলেন; তিনি আমাকে এমন একটি ওয়ার্ডে আটক রেখেছিলেন, যেখানে ওয়ার্ডারকে পর্যন্ত ঢুকতে দেওয়া হতো না। ওয়ার্ডার ওয়ার্ডে তালা বন্ধ করে বাইরে থেকে আমাকে নজর রাখতো। আমাকে 'বি' ক্লাস দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু খাবার ও সুযোগ-সুবিধা যা দেওয়া হতো তা আমাদের প্রদেশের 'সি' ক্লাসের সমতুল্য। আমাকে মেঝেয় ঘুমুতে হতো। কথা বলবার মতো কেউ ছিল না। কাছে-পিঠে অনেকগুলো বানর ছিল, সেগুলোর সঙ্গেই খেলা করতাম। আমার একবার ভয়ানক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হলো, আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দূরের কথা, একটা খাটিয়াও দেওয়া হলো না। সিমেণ্টের মেঝেতে শুতে হতো, মাত্র দু-খানা খাটো কম্বল দেওয়া হয়েছিল, শীতের দিনে তা পর্যাপ্ত ছিল না। ভগবানের কৃপায় আমি সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম।

১৯৩৫ সালের মে মাসে গান্ধীজী একবার দেখা করতে এলেন। তাঁর চেষ্টায় আমাকে 'এ' ক্লাসে তোলা হলো। একবার ইন্‌স্‌পেক্টর-জেনারেল অব প্রিজন্‌স্‌ আমাকে দেখতে এলে আমি তাঁকে বোম্বাই থেকে একজন অপরাধী পাচককে আনিয়ে দিতে অনুরোধ করেছিলাম। কারণ, আমার জন্যে রাঁধবার কেউ ছিল না। আমেদাবাদের জলবায়ু আমার সহ্য হচ্ছিল না। ইন্‌স্‌পেক্টর-জেনারেল লোকটি ভালো ছিলেন, তিনি সীমান্তপ্রদেশেও কিছুদিন ছিলেন। তিনি বললেন, তিনি আমাকে পাঞ্জাবের কোনও জেলে বদলি করে দেবেন এবং পেশোয়ার থেকে একজন পাঠান অপরাধীকে পাচক হিসাবে পাঠাবেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম, পাঞ্জাব সরকার আমাকে কখনও নেবে না, তাই আমি তাঁকে বোম্বাই থেকে একজন পাচক পাঠাতে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি সরল মনেই বিশ্বাস করতেন, পাঞ্জাব জেল ও পাঠান পাচক হলেই আমার পক্ষে ঠিক হবে। পাঞ্জাব সরকার সত্যিই আমাকে নিতে চাইলো না, তবে পেশোয়ার জেল থেকে একজন পাচক এলো। আসলে সে পাচক ছিল

না, সে ছিল একজন যক্ষ্মারোগী। মতলব, আমাকে যক্ষ্মারোগে সংক্রামিত করা। ১৯৩৫ সালে আমাকে বেরিলির একটি ছোট্ট জেলা জেলে বদলি করা হলো, সঙ্গে পাচকটিও রইলো। বেরিলি সেণ্ট্রাল জেলে পাঠানো হলো না। কারণ, সেখানে কিছুসংখ্যক রাজবন্দী আটক ছিলেন। সরকারের মতলব ছিল আমাকে অসুবিধায় ফেলা ও তাঁদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করা। সরবমতী জেলের মতো এখানেও আমাকে একটি নির্জন সেলে আটক রাখা হলো। ইন্‌স্‌পেক্টর অব প্রিজন্‌স্‌ কর্নেল সালামতুল্লাহ্‌ খান্‌ বেশ ভদ্র ছিলেন। তিনি একবার জেল দেখতে এলে তাঁকে ঐ পাচকটিকে সরিয়ে নিতে অনুরোধ করলাম, বললাম, "আমার যক্ষ্মারোগী পাচকে দরকার নেই। এতে আমাদের দুজনেরই অসুবিধা হচ্ছে।" শেষ পর্যন্ত পাচকটিকে সরানো হলো।

গরমের দিনে বেরিলি জেলে আবদুল গফরের দুঃসহ কষ্ট হতো ; সারা গা ফোঁড়ায় ভরে গেল। এই দুঃসহ গ্রীষ্মটা যখন কাটলো, তখন বৃষ্টি নামলে তাঁকে আলমোড়া জেলে বদলি করা হলো। দিনের পর দিন একটানা বৃষ্টি হতো, এক পা-ও বেরোনো যেত না। এখানে জওহরলাল যখন আটক ছিলেন, তখন তিনি একটুকরো বাগান করেছিলেন। সেই অসমাপ্ত বাগানের কাজে আবদুল গফর নিজেকে নিযুক্ত করলেন।

জেলে সন্তোষজনক আচরণের জন্যে তাঁর দণ্ডকাল সাড়ে চার মাস মকুব হয়েছিল। তাই তিনি ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসেই মুক্তি পেলেন। কিন্তু আগের মতোই সীমান্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবপ্রদেশে প্রবেশ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রইলো। তাই তিনি আবার ওয়ার্ধায় ফিরে এলেন। তিনি ওয়ার্ধায় যমুনালাল বাজাজের গৃহেই অতিথিরূপে রইলেন। ঐ সময়ে গান্ধীজী ওয়ার্ধা থেকে পাঁচ মাইল দূরে সেগাঁওয়ে (সেবাগ্রামে) থাকতেন। আবদুল গফর রোজই ঐ পাঁচ মাইল পথ হেঁটে যেতেন ও আসতেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়েছিল, তাতে গান্ধীজী কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করেছিলেন। এর পর অন্ততঃপক্ষে তিন বছর গান্ধীজী রাজনীতি থেকে যথাসম্ভব দূরে থেকে অস্পৃশ্যতা-বর্জন ও গ্রামোন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। গ্রামোন্নয়ন এখন আবদুল গফরেরও অন্যতম প্রধান চিন্তা ও কাজ হয়ে উঠেছিল।

স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন : অতিথি : নেহরু ও গান্ধী

আবদুল গফর যখন জেলে ছিলেন, তখন ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পাস হয়েছিল এবং ১৯৩৭ সাল থেকে এই আইন অনুযায়ী নূতন সংবিধান চালু হওয়ার কথা ছিল। এই সংবিধানে দুটি অংশ ছিল, একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ও একটি প্রাদেশিক। জওহরলাল নেহরু এই সংবিধানকে 'দাসত্বের সনদ' বলে বর্ণনা করেছিলেন। কংগ্রেস বলেছিল, এই সংবিধান ভারতবাসীকে দায়িত্ব দিচ্ছে, কিন্তু ক্ষমতা দিচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ও ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি এই সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশকে গ্রহণ না ক'রে এর প্রাদেশিক অংশকে গ্রহণ করেছিল। আবদুল গফর যখন জেল থেকে বেরুলেন, তখন কংগ্রেস আসন্ন নির্বাচনের জন্য সারা দেশে প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু গান্ধীজী এই নির্বাচন অভিযান থেকে দূরে রইলেন, আবদুল গফরও রইলেন দূরে।

১৯৩৬ সালের ২রা অক্টোবর গান্ধীজীর ৬৭-তম জন্মদিবস পালিত হলো। এর পক্ষকাল পরে গান্ধীজী প্রস্তরে খোদিত ভারতের বিশাল মানচিত্র "ভারত-মাতা"-র উদ্বোধনের জন্যে বেনারস গেলেন। আবদুল গফরও ঐ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্যে গান্ধীজীর সঙ্গে বেনারস গেলেন। ৩০শে অক্টোবর থেকে ২রা নভেম্বর পর্যন্ত তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে আমেদাবাদে রইলেন। আমেদাবাদ পৌরসভার পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হলো। এখানে তিনি কয়েকটি জনসভায় ভাষণ দিলেন। ভাষণগুলিতে তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা ও খুদাই খিদমতগার আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। এই সময়ে তাঁর ওপর থেকে সীমান্তপ্রদেশে প্রবেশ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্যে সীমান্তপ্রদেশ আইনসভায় একটি প্রস্তাব এসেছিল। তার প্রতিবাদে সীমান্তপ্রদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন যে, আবদুল গফর অহিংসায় প্রকৃত বিশ্বাসী নন, ওটা তাঁর ছদ্মবেশ মাত্র। গান্ধীজীর সঙ্গে ওয়ার্ধায় ফিরে আবদুল গফর স্বরাষ্ট্রসচিবের এই বিবৃতির প্রতিবাদে একটি দীর্ঘ বিবৃতি দিলেন। তাতে তিনি খুদাই খিদমতগার আন্দোলন যে সম্পূর্ণ অহিংসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং সরকারের শত শত

প্ররোচনা সত্বেও নির্ভীক খুদাই খিদমতগাররা যে ত্যাগ ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, তা তুলে ধরলেন। খুদাই খিদমতগার-সংস্থা তখনও নিষিদ্ধ ছিল। সরকার জওহরলাল নেহরুর মতো ব্যক্তিদেরও নির্বাচনী অভিযানের জন্যে সীমান্তপ্রদেশে প্রবেশ করতে দিল না। কেবল তারা বল্লভভাই প্যাটেল ও ভুলাভাই দেশাইকে নভেম্বর মাসের শেষে সীমান্তপ্রদেশে মাত্র কয়েকদিনের জন্যে যেতে দিয়েছিল।

১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজীর পরামর্শমতো কংগ্রেসের অধিবেশন মহারাষ্ট্রের একটি গ্রামে, ফৈজপুরে, অনুষ্ঠিত হলো। আবদুল গফরও এই অধিবেশনে যোগ দিলেন। ফৈজপুর কংগ্রেসে তিনি উপস্থিত থাকার সময়েই ভারত সরকার সীমান্তপ্রদেশে প্রবেশ সম্পর্কে তাঁর ওপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তার মেয়াদ ১৯৩৭ সালের ২৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করে একটি আদেশ জারী করলো।

ফৈজপুর কংগ্রেস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসের নেতারা নির্বাচনী অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু গান্ধীজীর মতোই আবদুল গফর গঠনমূলক কাজে ডুবে রইলেন। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলো। তাতে দেখা গেল, এগারোটি প্রদেশের মধ্যে ছটিতে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। মুসলিম-প্রধান সীমান্তপ্রদেশে মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষিত ৩৬টি আসনের মধ্যে ১৫টি আসন কংগ্রেস পেয়েছে। মুসলিম লীগ একটি আসনও পায় নি। সাধারণ আসনগুলিতেও কংগ্রেস ৪টি আসন পেয়েছে। এইভাবে সীমান্তপ্রদেশে ৫০টি আসনযুক্ত আইনসভায় কংগ্রেস বা খুদাই খিদমতগাররা সরকারের শত ভীতিপ্রদর্শন ও বাধাসৃষ্টি সত্বেও ১৯টি আসন পেলো এবং একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলরূপে আত্মপ্রকাশ করলো।

নবগঠিত আইনসভাসমূহে বিপুলসংখ্যক আসন অধিকার করায় এখন কংগ্রেস প্রদেশসমূহে মন্ত্রিসভা গঠন করবে কিনা তা নিয়ে কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলো। ১৯৩৭ সালের মার্চমাসে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসলো। ওয়ার্ধা থেকে আবদুল গফর গান্ধীজীর সঙ্গে দিল্লী গেলেন। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা বললেন, কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করলে তাতে নূতন সংবিধানের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সংগ্রাম চালাবার সুবিধা হবে। জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি বামপন্থী নেতারা

বললেন, গভর্নরের হাতে যেহেতু চূড়ান্ত ও স্বেচ্ছাচারমূলক অধিকার আছে, তাতে মন্ত্রিসভাগুলি জনস্বার্থসাধনে সক্ষম হবে না এবং কংগ্রেস লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হবে। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর মধ্যস্থতায় স্থির হলো যে, কংগ্রেস যেসব প্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে, সেখানে মন্ত্রিসভা গঠন করবে এবং প্রধান মন্ত্রীরা নিজ নিজ প্রদেশের গভর্নরের কাছে প্রতিশ্রুতি দাবি করবেন যে, মন্ত্রিসভার সংবিধান-সম্মত কোনও কাজে গভর্নররা তাঁদের বিশেষ অধিকার প্রয়োগ করবেন না। মার্চমাসের শেষে গভর্নররা প্রাদেশিক আইন-সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলিকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্যে আহ্বান করলে কংগ্রেসের সংসদীয় দলের নেতারা গভর্নরের কাছে ঐ প্রতিশ্রুতি দাবি করলেন। গভর্নররা ঐ প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী হলেন না। ফলে অচল অবস্থা দেখা দিলো। এখন নূতন সংবিধানের প্রাদেশিক অংশ চালু করাও কঠিন হয়ে উঠলো। ১লা এপ্রিল ঐ সংবিধান চালু হওয়ার দিন ছিল। ঐদিন কংগ্রেস সারাদেশে এই দাসত্বের সনদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-দিবস পালন করলো। শেষ পর্যন্ত বড়লাট লিন্‌লিথগো গভর্নররা মন্ত্রিসভার সংবিধানসম্মত কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না, এই প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন ৮ই জুলাই ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতি দিলো। ফলে জুলাই মাসের শেষে কংগ্রেস বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যায় মন্ত্রিসভা গঠন করলো। সীমান্ত-প্রদেশে ৮ জন অকংগ্রেসী সদস্য কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সম্মত হওয়ায় ডাঃ খান্ সাহেব সীমান্তপ্রদেশেও কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠন করলেন।

আবদুল গফর এই সময় বোম্বাই, পাটনা, লখনৌ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে ঘুরে অনেকগুলি জনসভায় ভাষণ দিলেন এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলার জন্যে আহ্বান জানালেন। আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে সীমান্তপ্রদেশের নূতন মন্ত্রিসভা তাঁর ওপর থেকে সীমান্তপ্রদেশে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলো। এইভাবে দীর্ঘ ছ বছর পরে ১৯৩৭ সালের আগস্ট মাসের শেষাশেষি আবদুল গফর আবার সীমান্তপ্রদেশে ফিরলেন। তাঁকে পেশোয়ারে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হলো। তিনি তাঁর ভাষণে বললেন: "ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে আমি আবার আপনাদের আনন্দে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু প্রকৃত আনন্দ আসতে এখনও বাকি; আমরা যতোক্ষণ না আমাদের স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি, ততোদিন আমাদের আনন্দ অর্থহীন।"

এতোদিন আবদুল গফরের মতোই জওহরলালেরও সীমান্তপ্রদেশে প্রবেশ

নিষিদ্ধ ছিল। এখন সীমান্তপ্রদেশে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কংগ্রেস-সভাপতি রূপে জওহরলাল সীমান্তপ্রদেশ সফরে গেলেন। ১৪ই অক্টোবর তিনি পেশোয়ারে পৌছলে সুবিশাল জনতা তাঁকে বাদ্যভাণ্ড ও আতসবাজি সহকারে বিপুল অভ্যর্থনা জানালো। খুদাই খিদমতগার বাহিনী তাঁকে 'গার্ড অব অনার' দিলো। একটি সুসজ্জিত মোটরে করে তাঁকে ও আবদুল গফরকে নিয়ে প্রায় একমাইল দীর্ঘ একটি মিছিল পথিপার্শ্বে জনারণ্যের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললো; শহরের সর্বত্র ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা উড়তে লাগলো। শতাধিক সুসজ্জিত তোরণ পার হয়ে মিছিল কাবুল গেটে পৌছলে জহওরলাল ও তাঁর সঙ্গীরা ডাঃ খান্‌সাহেবের বাসভবনে গেলেন। পেশোয়ারে এক বিশাল জনসমাবেশে জওহরলাল আবদুল গফর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললেন, "খান্ সাহেব আবদুল গফর খান্ কেবল ফখ্‌র্‌-এ-আফগান (আফগান-গৌরব) নন, তিনি ফখ্‌র্‌-এ-হিন্দ্-ও (ভারত গৌরবও)। মহাত্মা গান্ধী ছাড়া ভারতে আর কোনও ব্যক্তি নেই, যাঁর কাজ এমন সুদূরপ্রসারী হয়েছে। তিনি সত্যই ভারতের সাহস ও বীরত্বের মূর্ত প্রতীক।" জওহরলাল সীমান্তবাসী পাঠানদের উপর ইংরেজ সরকারের বোমাবর্ষণের ও সম্প্রসারণ-নীতির তীব্র নিন্দা করলেন। পরদিন তিনি আবদুল গফরের সঙ্গে উটমনজাই যাত্রা করলেন। উটমনজাইয়ের জনসভায় জওহরলাল বললেন, "আমাকে আপনারা যখন আমার দুঃখবরণ ও ত্যাগের কথা বলেন, তখন আমি লজ্জা পাই। আপনারা হাজার হাজার মানুষ যে দুঃসহ দুঃখবরণ করেছেন, তার সঙ্গে তুলনা করলে আমার ত্যাগ ও দুঃখসহন নিতান্তই নগণ্য।" জওহরলাল খাইবার পাস ভ্রমণ করে ১৬ই অক্টোবর পেশোয়ারে ফিরে এলেন। পরদিন তিনি সীমান্তপ্রদেশবাসীর কাছে বিদায় নিলেন। এই তিনদিনব্যাপী স্বল্পস্থায়ী সফর সম্পর্কে তিনি ডাঃ রামমনোহর লোহিয়াকে লেখেন: "সীমান্তে এই স্বল্পস্থায়ী সফরে আমি ব্যক্তিভাবে ভারতের ঐক্য গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি।"

পাখতুন জাতির দেশপ্রেম, বীরত্ব ও আত্মত্যাগ জওহরলালকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাই তিনি ১৯৩৮ সালের গোড়ার দিকে আবার সীমান্ত-সফরে গেলেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে তাঁর সীমান্ত-সফর শুরু হলো। সর্বত্রই 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়ে অগণিত মানুষ তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। হাভেলিয়ান রেলস্টেশনে আবদুল গফর তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন এবং জওহরলালের সীমান্ত-সফরে তাঁর সঙ্গে রইলেন। জওহরলাল কারে ও ট্রাকে

ও অনেক সময় টোঙায় করে ভ্রমণ করলেন। টোঙা আবদুল গফর নিজেই চালালেন। জহওরলাল পেশোয়ার, কোহাট, বান্নু ও ডেরা ইসমাইল খাঁ জেলার বহুস্থানে ভ্রমণ করলেন। তাঁর সপ্তাহব্যাপী সফরে তিনি বহু জনসভায় বক্তৃতা দিলেন। তিনি খুদাই খিদমতগারদের কর্মকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করলেন; সীমান্তের ওপারে উপজাতীয়রাও তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানালো। আফ্রিদিরা তাঁর সম্মানে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় অনির্বাণ মশাল জ্বালিয়ে রাখলো। ২৬শে জানুয়ারি জওহরলাল স্বাধীনতা-দিবসের এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে বান্নুতে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। আবদুল গফর পাখতু ভাষায় স্বাধীনতার শপথবাক্য পাঠ করলেন। জওহরলালও আবদুল গফরের অনুসরণে শব্দের পর শব্দ উচ্চারণ করে পাখতু ভাষায় শপথবাক্য উচ্চারণ করলেন। একটি জনসভায় বক্তৃতাকালে নেহরু বললেন, "এই প্রদেশ এমন এক মহাপুরুষের জন্ম দিয়েছে, যাঁর জন্যে সমগ্র ভারত গৌরববোধ করে। তিনি সীমান্তের মানুষকে পঙ্কশয্যা থেকে উদ্ধার করেছেন এবং সমগ্র পরিবেশ পরিবর্তন করেছেন। তিনি খুদাই খিদমতগারদের বিশাল বাহিনী গড়ে তুলেছেন এবং এই অস্ত্রপ্রিয় জাতিকে অহিংস সংগ্রামে অবতীর্ণ করিয়েছেন। এ এক অলৌকিক ব্যাপার। অহিংসা এক শক্তিশালী অস্ত্র। কেবল নির্ভীক ও দুঃসাহসী মানুষই এই অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে।..."

২৬শে জানুয়ারি ডেরা ইসমাইল খাঁয় তাঁর শেষ বক্তৃতা দিয়ে নেহরু সীমান্ত-প্রদেশবাসীদের কাছে বিদায় নিলেন।

মহাত্মা গান্ধীও এই মহান্ জাতির মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছিলেন। এপ্রিল মাসে তাঁর সীমান্তপ্রদেশ সফরে যাওয়ার কথা ছিল। তিনি উড়িষ্যা ও বাংলাদেশে ব্যস্ত থাকায় তাঁর কিছুটা বিলম্ব হলো। ১লা মে তারিখে তিনি সীমান্তপ্রদেশের নওশেরায় পৌছলে আবদুল গফর ও খুদাই খিদমতগার বাহিনী তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা জানালো। গান্ধীজী ইদানীং যেখানেই যেতেন সেখানেই তিনি তাঁর জয়ধ্বনি ও দর্শনার্থীদের ভীড়ে কাতর হয়ে পড়তেন। কিন্তু এখানে তিনি তেমন কিছু দেখলেন না। অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত নবজাগ্রত পাখতুনজাতির শৃঙ্খলাবোধ দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। পথের দুই পার্শ্বে হাজার হাজার মানুষ শান্তভাবে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন জানালো। কোথাও এতোটুকু হৈচৈ বিশৃঙ্খলা তাঁর চোখে পড়লো না। হাজার হাজার মানুষ ডাঃ খান্ সাহেবের বাসভবনে সকালে ও সন্ধ্যায়

তাঁর উপাসনাসভায় এসে যোগ দিতো। কিন্তু তাঁর কাজের বা বিশ্রামের এতোটুকু ব্যাঘাত ঘটাতো না। গান্ধীজী এই সময় সাধারণতঃ মানপত্র বা অভিনন্দন নিতেন না। তবু তিনি দুর্বল শরীরেও পেশোয়ারে ইসলামিয়া কলেজ ও এডোয়ার্ডস্ কলেজের পক্ষ থেকে মানপত্র নিতে দ্বিধা করলেন না। ইসলামিয়া কলেজের মানপত্রে বলা হলো, "আপনি আমাদের সর্বোত্তম মানুষটিকে—খান্ আবদুল গফর খান্‌কে—অনুপ্রাণিত করেছেন। আপনার অনুপ্রেরণায় ও নির্দেশনায় খান্ সাহেব এই যুদ্ধপ্রিয় জাতিকে একটি সুশৃঙ্খলা-পরায়ণ জাতিতে পরিণত করেছেন। আপনি এই মহান্ মুক্তি-সংগ্রামকে নীতির উচ্চতম স্তরে উন্নীত করেছেন।"

দুর্বল স্বাস্থ্যের দরুন গান্ধীজীকে তাঁর সফরসূচী সংক্ষিপ্ত করতে হলো। তবে আবদুল গফর তাঁকে সীমান্তপ্রদেশের কিছু কিছু গ্রাম না দেখিয়ে ছাড়লেন না। তিনি গান্ধীজীকে পেশোয়ার জেলায় শাবকাদর এবং সেখান থেকে পূর্বে উটমনজাই ও আরও দূরে মর্দান পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। পেশোয়ার থেকে মর্দান পর্যন্ত অসংখ্য গ্রামের মধ্য দিয়ে যাত্রাকালে গান্ধীজী দেখলেন সর্বত্র অগণিত নরনারী শিশু বৃদ্ধ তাঁকে দেখবার ও অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছে।

আবদুল গফর একটি গ্রামে পৌঁছে বললেন, "এই গ্রামের নাম মাট্টা। এখানে নির্যাতনের চরম হয়েছিল। আর যেখানেই নির্যাতন কঠোর হয়েছে, সেখানেই মানুষ মনোবলের অপূর্ব পরিচয় দিয়েছে। এ থেকে ভাববেন না যে, পাঠানরা খুব নির্ভীক জাতি। দেড়-পয়সার পুলিস দেখলেও এক সময় তারা কাঁপতো। আমাদের আন্দোলনই তাদের মন থেকে ভয় দূর করেছে এবং তারা পুরুষের মতো সামরিক বাহিনীর সম্মুখেও বুক উঁচু করে আবার দাঁড়িয়েছে। ..."

আবদুল গফর ও গান্ধীজী শাবকাদর থেকে উটমনজাই যাওয়ার পথে একটি ছোট্ট গ্রামের মধ্য দিয়ে গেলেন। আবদুল গফর বললেন, "এই গ্রামের নাম তুরংজাই। এ সেই বিখ্যাত হাজীর, তুরংজাইয়ের হাজীর, বাসস্থান। তিনি আর জীবিত নেই। দুঃসাহসী নির্ভীক মানুষ ছিলেন তিনি। বৃটিশ তাঁর সম্পর্কে নানা গুজব ছড়িয়েছে। স্যার মাইকেল ওডায়ার আমাকে হাজীর জামাই বলে বর্ণনা করতেও ছাড়ে নি।"

গান্ধীজী যেখানেই গেলেন, সেখানেই শুনলেন, আবার যদি সংগ্রাম শুরু হয়, পাঠানরা পেছনে থাকবে না। সর্বত্রই গান্ধীজী অহিংসার গভীর তাৎপর্য

বুঝিয়ে বললেন। গান্ধীজীর কথাগুলিকে তরজমা করে দিলেন আবদুল গফর পাখতুতে। পেশোয়ারে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের এক রাজনৈতিক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে গান্ধীজী বললেন: * "আমার আসবার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, আমি খান্‌সাহেবের কাছে যা শুনেছি, তা সত্য কিনা স্বচক্ষে দেখা। কিন্তু সত্য-মিথ্যা যাচাই করে দেখার জন্যে যে সময় প্রয়োজন, দুঃখের বিষয় তা আমি দিতে পারিনি। তবু একটি ধারণা আমি নিয়ে যাচ্ছি, সেটি হলো খান্‌সাহেবের প্রতি তাদের সেনাপতিরূপে মানুষের বিস্ময়কর প্রীতিপূর্ণ আনুগত্য। কেবল খিদমতগাররা নয়, আমি যেখানেই গেছি, সেখানেই দেখেছি প্রতিটি নরনারী শিশু বৃদ্ধ তাঁকে জানে, তাঁকে ভালোবাসে। অত্যন্ত আপনজনের মতো তারা তাঁর সঙ্গে কথা বলে। তাঁর একটু ছোঁয়াও যেন তাদের শান্তি দেয়।..."

গান্ধীজী সপ্তাহকাল সীমান্তপ্রদেশে কাটিয়ে ৮ই মে বোম্বাই রওনা হলেন। ঐ সময় তিনি তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে কিছুদিন জুহুতে থাকেন। জুহুতে থাকাকালে বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসে। হিন্দু-মুসলিম সমস্যা ক্রমেই তীব্র আকার ধারণ করছিল। এ বিষয়ে কংগ্রেস-সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজীকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আলোচনাকালে মিঃ জিন্না এই দাবি করেন যে, মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি-স্থানীয় সংস্থা বলে স্বীকার করে নিতে হবে এবং কংগ্রেস হিন্দুদের পক্ষ থেকে চুক্তি করছে এরকম উল্লেখ থাকবে। এ প্রস্তাব ছিল নিতান্তই অযৌক্তিক। কারণ কংগ্রেস হিন্দু, মুসলিম, শিখ, পার্শী সকল ভারতবাসীর মিলিত প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া, মুসলিম লীগও মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় সংস্থা নয়; যে প্রদেশ সর্বাধিক মুসলমানপ্রধান সেই সীমান্তপ্রদেশে মুসলিম লীগের পাত্তা নেই। এ ছাড়াও জুন মাসে মিঃ জিন্না লীগের পক্ষ থেকে এগার দফা দাবি উত্থাপন করলেন। কংগ্রেস-লীগ আলোচনা এক অচল অবস্থায় পৌঁছলো।

গান্ধীজী জুহু থেকে ওয়ার্ধায় ফিরে গেলেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্যের কোনও উন্নতি হলো না। তাই আবদুল গফর তাঁকে কিছুদিন সীমান্তপ্রদেশে যেতে পরামর্শ দিলেন। সীমান্তের জলবায়ু তাঁর শরীরের পক্ষে খুবই উপযোগী হবে ভেবে গান্ধীজীও রাজী হলেন। তিনি দিল্লী হয়ে সীমান্তপ্রদেশ রওনা হলেন। দিল্লীতে ঐ সময় ওয়ার্কিং কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক চলছিল। ঐ সময়ে ইউরোপে জার্মানির নাৎসী নেতা হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করেছিলেন এবং ইউরোপে যুদ্ধের কৃষ্ণচ্ছায়া ঘনিয়ে উঠেছিল। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক

এগারো দিন ধরে চলেছিল। ইতিমধ্যে ৩০শে সেপ্টেম্বর মিউনিক চুক্তি হওয়ায় সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। গান্ধীজীও ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যুদ্ধের বিষয়ে তাঁর মনোভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করলেন: "সরকার যদি কংগ্রেসের হাতে সমস্ত নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ছেড়ে দেয়, তবু আমি নিতান্ত একাকী হলেও, যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিরোধী থাকব।"

৪ঠা অক্টোবর গান্ধীজী দিল্লী থেকে সীমান্তপ্রদেশ রওনা হলেন। পেশোয়ার থেকে তিনি সর্দার প্যাটেলকে লিখলেন, "খুব আরামে আছি। তুমিও আমাকে এমন পূর্ণ বিশ্রাম দিতে পারতে না। আবহাওয়া চমৎকার। খান্‌সাহেব এখন আমার দেখাশোনা করছেন।" কোনও অনুষ্ঠান, কোনও সাক্ষাৎকার, কোনও আলাপ-আলোচনা তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটালো না। গান্ধীজী প্রায় নিরবচ্ছিন্ন মৌন পালন করে চললেন। সীমান্তের চমৎকার জলবায়ু এবং আবদুল গফর ও ডাঃ খান্‌সাহেবের সেবায় তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হলো। ৯ই অক্টোবর আবদুল গফর তাঁকে পেশোয়ার থেকে উটমনজাইয়ে নিজের বাড়িতে আনলেন।

১৫ই অক্টেবর গান্ধীজীর বিশ্রামের কাল শেষ হলো। গান্ধীজী মর্দান ও নওশেরার গ্রামাঞ্চলে সফরে গেলেন। জনসাধারণ সর্বত্রই তাঁকে শান্তভাবে অভ্যর্থনা জানালো, অনেকে ফল, আখ প্রভৃতি উপহার নিয়ে এলো। অনেকেই গান্ধীজীকে তাঁদের মধ্যে এসে কিছুদিন থাকবার জন্যে অনুরোধ করলো। একজন খান্ বললেন, "আমাদের বাদশা খান্‌কে আপনাদের অঞ্চলে ছ বছর আটক রেখেছিলেন, আমরা আপনাকে অন্ততঃ পক্ষে দুমাস ভালোবাসায় বন্দী করে রাখব।" গান্ধীজী খুদাই খিদমতগারদের সঙ্গে আলাপ করলেন। তিনি খুদাই খিদমতগারদের অহিংসা-ব্রতে পুরোপুরি শিক্ষিত করবার জন্যে তাদের গঠনমূলক ও সেবামূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করতে বললেন। আবদুল গফর এ বিষয়ে উটমনজাইয়ের কাছে মারওয়াণ্ডিতে সুতোকাটা ও কাপড়বোনা শেখার জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনার কথা জানালেন। গান্ধীজী কিছুসংখ্যক খুদাই খিদমতগারকে শিক্ষালাভের জন্যে ওয়ার্ধায় পাঠাবার পরামর্শ দিলেন। পরের সপ্তাহে তিনি কোহাট, বান্নু ও ডেরা ইসমাইল খাঁ জেলাগুলিতে সফর করলেন। তিনি হাজারা জেলাতেও গেলেন। গান্ধীজী ৯ই নভেম্বর সীমান্তপ্রদেশ ত্যাগ করলেন। আবদুল গফর সীমান্তপ্রদেশে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

গান্ধীজী চলে যাওয়ার পর আবদুল গফর নিজে বান্নু ও ডেরা ইসমাইল

খাতে সফর করলেন। এই অঞ্চলের শিখ ও হিন্দুরা অনেকেই গ্রামাঞ্চলে তাঁদের পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করে শহরে চলে যাচ্ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে এই অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দেখা দেওয়ায় তাঁরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। খুদাই খিদমতগার ও স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁদের নিজ নিজ পৈতৃক ভিটায় ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হলেন। গান্ধীজী আবদুল গফরের পরামর্শমতো মীরাবেন ও বিবি আমতুস সালামকে পাঠান স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজে সহায়তা করবার জন্যে পাঠালেন। আবদুল গফর তাঁর পাখতুন পত্রিকার প্রকাশ পুনরায় শুরু করেছিলেন। তার মাধ্যমেও তিনি পাখতুন নারীদের শিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

সীমান্তপ্রদেশ সম্পর্কে গান্ধীজীর আগ্রহের সীমা ছিল না। তাই তিনি ১৯৩৯ সালের ৭ই জুলাই আবার সীমান্তপ্রদেশে এলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে গান্ধীজীর শরীর আরও খারাপ হয়েছিল। তাই তিনি গ্রামাঞ্চলে সফর করতে পারলেন না। আবদুল গফর গান্ধীজীর বিশ্রামের জন্য শৈলাবাস অ্যাবটাবাদে থাকবার ব্যবস্থা করলেন। পক্ষকাল সীমান্তপ্রদেশে থেকে গান্ধীজী ফিরলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে ২৪শে জুলাই তারিখে তিনি অ্যাবটাবাদে একটি জনসভায় ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন: "এই প্রদেশে থেকে আমি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, কংগ্রেস-কর্মীদের মধ্যে ঘরোয়া বিবাদ ঢুকতে শুরু করেছে। গতকাল আমি একঘণ্টারও বেশি সময় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করেছি। তাঁরা আমাকে একটা পথ বাৎলাতে বলেছেন। আমি বলব, পথ আপনাদের হাতেই আছে। আপনারা খান্ সাহেব আবদুল গফর খান্‌কে আপনাদের মুকুটহীন দলপতিরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁকে আপনারা 'বাদশা খান্' ও 'ফখর-এ-আফগান' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। তাঁর কথাই আপনাদের কাছে আইনস্বরূপ হ'ক। তিনি যুক্তি-তর্কে বিশ্বাস করেন না। তিনি যা বলেন, তা অন্তর থেকেই বলেন। আপনারা তাঁকে যে উপাধিতে ভূষিত করেছেন, তা যদি সত্য বলে প্রতিপন্ন করতে চান, তা যদি কোন মৌখিক সৌজন্যমাত্র না হয়, তবে তাঁর নেতৃত্বে আপনারা নিজেদের বিরোধ ভুলে মিলিতভাবে কাজ করুন।"

গান্ধীজী সীমান্ত প্রদেশ থেকে ফেরবার কয়েকদিন বাদেই ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসলো। ইউরোপে যুদ্ধের কালো ছায়া আবার নেমে এসেছিল। ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করলো যে, কংগ্রেস সকল

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের এবং ভারতের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার সকল চেষ্টার বিরোধিতা করবে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটলো। নাৎসী জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের অনাক্রমণ-চুক্তি এবং হিটলার কর্তৃক পোল্যাণ্ডকে চরমপত্রদান পরিস্থিতিকে জটিলতর ক'রে তুললো। জার্মানি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করায় ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর ইংল্যাণ্ড জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। ঐদিন বড়লাট ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে বা আইনসভা-গুলির সঙ্গে কোনও পরামর্শ না ক'রেই ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি অর্ডিন্যান্স জারী হ'লো।

বড়লাট গান্ধীজীকে আলোচনার জন্যে ডেকে পাঠালে গান্ধীজী ৫ই সেপ্টেম্বর সিমলা পৌঁছলেন। তিনি বড়লাটকে জানালেন, তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রতি রয়েছে। হিন্দু মহাসভা, ক্রিশ্চিয়ান কন্‌ফারেন্স, লিবারল ফেডারেশন ও দেশীয় রাজন্যবর্গ যুদ্ধে বৃটেনকে পূর্ণ সমর্থন জানালো। মুসলিম লীগও সমর্থন জানালো, তবে এই শর্তে যে মুসলিম লীগের বিনাসম্মতিতে ভারতের সাংবিধানিক পরিবর্তন করা চলবে না। ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসলো। এই বৈঠকে তাঁরা জিন্নাকেও আহ্বান জানালেন। কিন্তু জিন্না 'অন্য কাজে ব্যস্ত আছেন' অজুহাতে এলেন না। ওয়ার্কিং কমিটি সপ্তাহকাল গভীরভাবে আলোচনা ক'রে সরকারকে গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের দিক থেকে লক্ষ্যসমূহ এবং ঐ লক্ষ্যসমূহ ভারতের ক্ষেত্রে কিভাবে প্রযুক্ত হবে, তা ঘোষণা করতে আহ্বান জানালো। কারণ এই যুদ্ধ ফাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের যুদ্ধ ব'লে ঘোষণা করা হচ্ছে, অথচ ভারতবর্ষকে গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। গান্ধীজী অবশ্য তাঁর অহিংসা নীতি অনুসারে বিপন্ন শত্রুকে বিনাশর্তে সাহায্যদানের কথাই বললেন।

১৯৩৯ সালের ১৭ই অক্টোবর বড়লাট লর্ড লিনলিথগো যে ঘোষণা দিলেন, তাতে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা রূপে মুসলিম লীগকে কার্যতঃ স্বীকৃতি দেওয়া হ'লো। তিনি বললেন, ভারতকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য, তবে তা সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনা ক'রে যুদ্ধের পরে বিবেচনা করা হবে। এখন তিনি ভারতীয়দের নিয়ে একটি সমর-পরামর্শ-পরিষদ গঠন করতে চাইলেন। গান্ধীজী মন্তব্য করলেন: বড়লাটের এই ঘোষণা নিতান্ত নৈরাশ্যজনক। প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলিকে কংগ্রেস এই অবস্থায় পদত্যাগ করতে নির্দেশ দিলো। ফলে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির সঙ্গে

নভেম্বর মাসে সীমান্ত প্রদেশেও ডাঃ খান সাহেব মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করলো। কংগ্রেস-মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করায় মুসলিম লীগ ২২শে ডিসেম্বর তারিখে হঠাৎ সারা দেশে "মুক্তি দিবস" পালনের সিদ্ধান্ত নিলো—'মুক্তি' অর্থাৎ কংগ্রেসের তথাকথিত হিন্দু শাসনের হাত থেকে মুসলমানদের মুক্তি। গান্ধীজী জিন্নাকে এইরকম সাম্প্রদায়িক কোনও দিবস পালন থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু জিন্না তাতে কর্ণপাত করলেন না। কারণ, এখন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোকেই মুসলিম লীগ মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের জনপ্রিয়তা অর্জনের একমাত্র হাতিয়ার করে তুলেছিল।

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে মুসলিম লীগ লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তানের দাবি ঘোষণা করলো। এবং জিন্না তাঁর সভাপতির ভাষণে ভারতবাসী দুই জাতি, মুসলমান ও অমুসলমান, এই তত্ত্ব ঘোষণা করলেন। আবদুল গফুর যে জিন্নার এই আজগুবি তত্ত্বকে স্বীকার করলেন না, তা বলাই বাহুল্য। তিনি জানতেন, পাখতুনজাতি প্রাচীন আর্যজাতির বংশধর, তারা একদা হিন্দু ও বৌদ্ধ ছিল, এখন মুসলমান হয়েছে।

এপ্রিল মাসে দিল্লীতে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির বিরুদ্ধে কংগ্রেস, জমিয়ত-উল্-উলেমা-ই-হিন্দ্, অহ্রর্, সিয়া পলিটিক্যাল কনফারেন্স প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলির মুসলিম নেতারা একটি আজাদ মুসলিম সম্মেলনে মিলিত হলেন। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম লীগ ও খাকসার দল ছাড়া আর সকল মুসলিম সংস্থাই এই সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। এই সম্মেলন একবাক্যে পাকিস্তান দাবির নিন্দা করলেন এবং সরকার রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের অন্তরায়রূপে মুসলমান সম্প্রদায়কে যেভাবে ব্যবহার করছে তার সমালোচনা করলেন। তাঁরা সকলেই কংগ্রেস যে অবিলম্বে সাংবিধানিক পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করেছে, তাকে সমর্থন জানালেন।

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে বিহারের রামগড়ে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হ'লো তার প্রাক্কালে ওয়ার্কিং কমিটি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলো যে, "বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ভারত সম্পর্কে সম্প্রতি যেসব ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে এটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, গ্রেট বৃটেন মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যে এবং তার সাম্রাজ্যকে সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় করবার জন্যেই···যুদ্ধ চালাচ্ছে। এই অবস্থায়, তাই সুস্পষ্ট যে, কংগ্রেস প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন ভাবেই এই যুদ্ধের অংশীদার হ'তে পারে না।···কংগ্রেস এতদ্দ্বারা আবার ঘোষণা করছে যে, পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে

কম কিছু ভারতবাসীর পক্ষে গ্রহণীয় হ'তে পারে না।...ভারতের সংবিধান স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতেই রচিত হবে এবং কংগ্রেস ভারতবর্ষকে বিভক্ত করবার ও জাতীয়তাকে খণ্ডিত করবার সকল প্রচেষ্টার বিরোধিতা করছে।...কংগ্রেস ভারতীয় রাজন্তবর্গের বা বিদেশীয় কায়েমী স্বার্থের কোন অধিকারকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে দেবে না। ভারতের সার্বভৌমত্ব ভারতীয় জনসাধারণের হস্তেই ন্যস্ত থাকবে।..."

১৮ই এপ্রিল ওয়ার্কিং কমিটি মিলিত হয়ে রামগড় কংগ্রেসের পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। জওহরলাল, মওলানা আজাদ প্রভৃতি নেতারা ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবার জন্যে বললেন। কিন্তু গান্ধীজী জানালেন, ব্যাপক অহিংস আন্দোলনের জন্যে দেশ প্রস্তুত নয়। ১৭ই জুন ফ্রান্সের পতন ঘটলো। ওয়ার্ধায় কংগ্রেস কমিটি আবার মিলিত হলেন। ওয়ার্কিং কমিটি দেশের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনমতো অহিংস ও সশস্ত্র পন্থা অবলম্বন করলেন। প্রস্তাবে বলা হলো, "মহাত্মা গান্ধী চান যে, কংগ্রেস অহিংস আদর্শে অবিচল থাকবে এবং ভারত বিদেশী আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে সামরিক বাহিনী রাখবে না, একথা ঘোষণা করুক।...কিন্তু কংগ্রেস গান্ধীজীর সঙ্গে অতখানি অগ্রসর হতে অক্ষম।" তবে এই প্রস্তাবে একথাও বলা হলো যে, ভারত তার স্বাধীনতা-সংগ্রাম অহিংসার পথেই চালাবে। তাই কংগ্রেস ক্রমবর্ধমান যুদ্ধপ্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে গঠিত যুদ্ধকমিটিগুলিতে যোগ দেবে না, কোনও কংগ্রেসসেবী যুদ্ধ-তহবিলে অর্থ দান করবে না বা সরকারী নিয়ন্ত্রণে গঠিত অসামরিক রক্ষী বাহিনীতে যোগ দেবে না। এই প্রস্তাবে গান্ধীজীকে তাঁর নিজের মহান্ আদর্শ-মত চলবার স্বাধীনতা দেওয়া হলো এবং কংগ্রেসের কর্মসূচী ও ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হলো।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠলো। হিটলার-জার্মানির দ্রুত সাফল্য কেবল বৃটেনকে নয়, ফাসিবাদবিরোধী সকল মানুষকেই সন্ত্রস্ত করে তুললো। ১৯৪০ সালের ২৯শে জুন বড়লাট গান্ধীজীকে আলোচনার জন্যে সিমলা ডেকে পাঠালেন। ৩রা জুলাই গান্ধীজী To Every Briton শীর্ষক তাঁর বিখ্যাত আবেদন প্রচার করলেন। তাতে তিনি প্রত্যেকটি বৃটনকে আন্তর্জাতিক সমস্যাদির মীমাংসার জন্যে যুদ্ধের পরিবর্তে অহিংস নীতি গ্রহণ করতে বললেন। ঐদিন দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটিরও একটি জরুরি বৈঠক

বসলো। তাতে মওলানা আজাদ, জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, রাজাগোপালচারী প্রভৃতি এই মত প্রকাশ করলেন যে, তাঁরা সকলেই ফাসিবাদের বিরোধী; তবে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রধান অন্তরায় ভারতের পরাধীনতা। কংগ্রেসের সভাপতি মওলানা আজাদ সুস্পষ্টভাবেই বললেন যে, তাঁর কাছে অহিংসা আদর্শ নয়, সংগ্রামের কৌশল মাত্র। তিনি মনে করেন, ভারতের গত্যন্তর না থাকলে ভারতবাসী স্বাধীনতার জন্যে অস্ত্র গ্রহণ করলেও অন্যায় হতো না। কিন্তু গান্ধীজী কোনও ক্ষেত্রেই অস্ত্রধারণের পক্ষপাতী ছিলেন না। সুতরাং স্বাধীন বা পরাধীন কোনও ভারতেরই, তাঁর মতে, যুদ্ধে অংশ গ্রহণ উচিত নয়। রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আচার্য কৃপালনী, শঙ্কররাও দেও প্রভৃতি গান্ধীজীকেই সমর্থন করলেন। শেষ পর্যন্ত বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের ও দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ক্ষেত্রে কেবল অহিংস সংগ্রামের প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হলো।

অহিংসার একমাত্র নীতি থেকে ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্য বিচ্যুত হওয়ায় আবদুল গফর ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করতে চাইলেন। গান্ধীজী তাঁকে এ বিষয়ে সমর্থন করলেন। তিনি "খান সাহেবের অহিংসা" শীর্ষক নিবন্ধে লিখলেন:

> যে ঝটিকাবর্ত ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্যকেই কম্পিত করেছিল, তাতেও খান্ সাহেব আবদুল গফর খান্ পাহাড়ের মতো অবিচল ছিলেন। তিনি তাঁর নিজের অবস্থা সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিলেন। তিনি যে বিবৃতি দিয়েছেন, তা আমি নিচে উদ্‌ধৃত করছি; তা আমাদের সকলের কাছে আলোকবর্তিকার কাজ করবে:
>
> 'ওয়ার্কিং কমিটির সাম্প্রতিক কতকগুলি প্রস্তাব থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, সরকারের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের ক্ষেত্রেই অহিংসাকে সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে। ভবিষ্যতে তা কতখানি ও কিভাবে কার্যকর করা হবে, তা আমি বলতে পারি না। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো এ বিষয়ে আরও আলোকপাত ঘটবে। ইতিমধ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছে এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে আমি পদত্যাগ করছি। আমি এটা সুস্পষ্ট করে দিতে চাই যে, আমি যে অহিংসায় বিশ্বাস করি এবং যে অহিংসার কথা আমি আমার খুদাই খিদমতগার ভাইদের কাছে প্রচার করেছি, তা অনেক

ব্যাপকতর। তা আমাদের জীবনের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত এবং কেবল তারই সুস্থায়ী মূল্য আছে। আমরা যদি অহিংসার এই শিক্ষাকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ না করি, তবে আমরা কখনও সীমান্তের অধিবাসীদের মধ্য থেকে তাদের মারাত্মক আত্মঘাতী দ্বন্দ্বকে নির্মূল করতে পারব না। অহিংসা পাঠানদের নির্ভীকতা অনেক বৃদ্ধি করেছে। পাঠানরা অন্যান্যদের তুলনায় হিংসায় অনেক অধিক পরিমাণে লিপ্ত ছিল, তাই অহিংসার দ্বারা পাঠানরা অনেক অধিক পরিমাণে উপকৃত হয়েছে। আমরা কখনই প্রকৃতপক্ষে ও কার্যকরভাবে অহিংসার দ্বারা ভিন্ন আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হব না। খুদাই খিদমতগাররা—যার অর্থ ভগবান্ ও মানব-জাতির সেবক—অবশ্যই প্রাণপাত করবে, প্রাণনাশ করবে না।'

এটা খান্ সাহেবের এবং তিনি বিগত বিশ বৎসর যেজন্যে সংগ্রাম করেছেন, তার উপযুক্ত কথা। তিনি পাঠান; এবং বলা যেতে পারে, পাঠান হাতে বন্দুক বা তরবারি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু খান্ সাহেব যখন রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে তাঁর খুদাই খিদমতগারদের সত্যাগ্রহে যোগ দিতে আহ্বান করেছিলেন, তখন তাদের তিনি চিন্তা করেই অস্ত্রত্যাগ করতে বলেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, তাঁর এই ইচ্ছাকৃত অস্ত্রত্যাগ মন্ত্রের মতো কাজ করেছিল। যে রক্তাক্ত পারিবারিক দ্বন্দ্ব পুরুষানুক্রমে চলে আসছিল এবং পাঠানদের জীবনের অংশে পরিণত হয়েছিল, এই অহিংসাই ছিল তার একমাত্র প্রতিকার। এইসব গৃহদ্বন্দ্ব বহু পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল এবং অহিংসা খান্ সাহেবের কাছে বহু-বাঞ্ছিত মুক্তির পথ রূপে দেখা দিয়েছিল। অন্যথায় এই রক্তাক্ত গৃহদ্বন্দ্বগুলির অবসান ঘটতো না এবং তা পাঠানজাতিকে ধ্বংস করে ফেলতো।

১৮ই আগস্ট তারিখে বড়লাট একটি বিবৃতি দিলেন। তাতে তিনি বললেন : বৃটিশ সরকার তার দায়-দায়িত্ব নিশ্চয় পূরণ করবে, এবং সংখ্যালঘুদের মতামতকে উপেক্ষা করা চলবে না। ভারতের ভাবী সংবিধান কি হবে, তা যুদ্ধের পরে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে এমন একটি সংস্থাই স্থির করবে। ইতিমধ্যে তিনি কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদকে সম্প্রসারিত করতে এবং একটি যুদ্ধ-পরামর্শ-পরিষদ্ স্থাপন করতে চান। এ বিষয়ে আলোচনার জন্যে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি মওলানা আজাদকে আমন্ত্রণ করলেন। মওলানা আজাদ বড়লাটের

বিবৃতিতে কংগ্রেসের দাবি সামান্ততম পরিমাণেও পূরণ করা হয়নি এই কারণে বড়লাটের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। ১৮ই আগস্ট ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করলো যে, "বৃটিশ সরকার যে ভারতে তরবারির সাহায্যে তার *অধিকার রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর, কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলির প্রত্যাখ্যানই তার* প্রমাণ।"

এই অবস্থায় কংগ্রেসের যুদ্ধে অংশগ্রহণের কোনও প্রশ্ন আর রইলো না। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামই এখন তাদের একমাত্র করণীয় হয়ে উঠলো। ১৫ই সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন বসলো, তাতে কংগ্রেসের নেতারা হিংসা ও অহিংসার পন্থা সম্পর্কে মতদ্বৈধ ত্যাগ করে পুনরায় গান্ধীজীর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করলো, তার পরিপ্রেক্ষিতে আবদুল গফর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে তাঁর পদত্যাগের পত্র প্রত্যাহার করলেন। তিনি কংগ্রেসের কার্যকলাপে পুনরায় আত্মনিয়োগ করলেন। বোম্বাইয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনাও হলো।

সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি গান্ধীজী বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে সিমলায় সাক্ষাৎ করে অবাধ বাক্-স্বাধীনতা দাবি করলেন। বড়লাট তাতে অস্বীকৃত হলে গান্ধীজী বললেন, "কংগ্রেসকে যদি মরতেই হয়, তবে তা তার আদর্শ ঘোষণা করেই মরবে। বাক্-স্বাধীনতার একটিমাত্র বিষয়েও যে আমরা একমত হতে পারলাম না, সেটা দুর্ভাগ্যজনক।" ১১ই অক্টোবর ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসলো ওয়ার্ধায়। বৈঠকশেষে গান্ধীজী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করলেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৪০ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর বিনোবা ভাবে ওয়ার্ধার নিকটবর্তী পৌনার গ্রামে যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতার দ্বারা ব্যক্তিগ্রহ সত্যাগ্রহ অভিযান শুরু করলেন। সরকার ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের সংবাদ প্রকাশ করতে সংবাদপত্রগুলিকে নিষেধ করে একটি আদেশ জারী করলো। এর প্রতিবাদে গান্ধীজীর হরিজন পত্রিকা পাঠকদের কাছে বিদায় জানালো। আবদুল গফরের 'পাখতুন' পত্রিকাও বিনোবাজীর সত্যাগ্রহের সংবাদ প্রকাশ করে সাময়িকভাবে বন্ধ হলো।

বিনোবা ভাবের পর ৭ই নভেম্বর জওহরলাল নেহরুর সত্যাগ্রহ করবার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই ৩১শে অক্টোবর তাঁকে গ্রেফতার করা হলো। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ ব্যাপকতর রূপ নিলো।

গান্ধীজী এর নাম দিলেন প্রতিনিধিত্বশীল সত্যাগ্রহ। এতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এবং কেন্দ্রের ও প্রদেশের আইনসভা-সমূহের কংগ্রেসী সদস্যদের মধ্য থেকে বাছাই করে দলে দলে সত্যাগ্রহ করতে পাঠানো হলো। ১৭ই নভেম্বর সর্দার প্যাটেল ভারত রক্ষা আইনে গ্রেফতার হলেন। ২৪শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের সভাপতি মওলানা আজাদ গ্রেফতার হলেন। এইভাবে কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতারা একে একে গ্রেফতার হলেন। ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত ২২৫০ জন গ্রেফতার বরণ করলেন। ২৭শে জানুয়ারি গৃহে অন্তরীণ অবস্থা থেকে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের চাঞ্চল্যকর সংবাদ ঘোষিত হলো। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত বিশ হাজার সত্যাগ্রহী কারাবরণ করলেন। জুন মাসের মাঝামাঝি হিটলার-জার্মানি হঠাৎ সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করায় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জটিলতা বৃদ্ধি পেলো। জুলাই মাসে বড়লাট তাঁর শাসন-পরিষদ্ সম্প্রসারণ ও জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ্ গঠনের কথা ঘোষণা করলেন।

জার্মানি দ্রুতগতিতে সোভিয়েটভূমিতে অগ্রসর হতে লাগলো এবং জাপান ইন্দোচীনে তার শক্ত ঘাঁটি গেড়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া তথা ব্রহ্মদেশ ও ভারতের দিকে বাহুবিস্তারে সচেষ্ট হলো। ফলে বৃটেন ভারতের বিপুল জনবল ও প্রাকৃতিক সম্পদকে যুদ্ধার্থে পরিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো। ৩রা ডিসেম্বর বৃটিশ সরকার আপোসমূলক মনোভাব প্রকাশ করে জওহরলাল নেহরু, মওলানা আজাদ প্রভৃতি সহ বন্দী সত্যাগ্রহীদের মুক্তিদানের কথা ঘোষণা করলো।

ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ সীমান্ত প্রদেশে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেনি। কারণ, এই সময় আবদুল গফর গঠনমূলক কর্মসূচীর উপরই অধিক জোর দিয়ে খুদাই খিদমতগার-সংস্থাকে আরও শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করে তুলতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজী আবদুল গফরের এই কর্মসূচীর প্রশংসা করে একটি বিবৃতি দিলেন :

এক অমানুষিক অগ্নিকাণ্ড অস্ত্রবলে বিশ্বাসী বিশ্ব-শক্তিগুলিকে আজ ঘিরে ফেলেছে। এই শক্তিগুলি জানে না যে, কি জন্য তারা যুদ্ধ করছে। এই অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে বাদশা খানের মতো ব্যক্তি খুদাই খিদমতগারদের মধ্যে প্রধানত শান্তির জন্যে এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে অহিংসভাবে উপযুক্ত ভূমিকা-গ্রহণের জন্যে নিজেকে শক্তিশালী করে তোলার উদ্দেশ্যে যা করছেন, তা সুস্থ ও উন্নতিকর। অহিংসার সকল তাৎপর্য তিনি কার্যে পরিণত না করলেও

অহিংসায় তাঁর বিশ্বাস অবিনশ্বর। বিগত কয়েক মাস ধরে তিনি খুদাই খিদমতগারদের অহিংসায় শিক্ষিত করে তোলার জন্যে ছোট ছোট শিবির স্থাপন করেছেন। তবে নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তিনি বড় গোছের একটি শিবির স্থাপন করেছিলেন এবং পার্শ্ববর্তী পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও বালুচিস্তান থেকে কর্মীদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। চরকা এখানে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এবং তিন শতেরও বেশি চরকা এখানে রোজ চলেছিল। শিবিরে ধনুষ তকলিও চালু করা হয়েছিল। যেরকম সস্তায় ও সহজে প্রতি গ্রামে এই তকলি তৈরি করা যায়, তা সকলের কাছে আকর্ষণীয় হয়েছে। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে স্বাস্থ্যরক্ষার কাজও চলেছিল। অহিংসা এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেও এতে বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল। উপজাতীয়দের শান্তিপূর্ণ ও অহিংস থাকবার জন্যে আবেদন জানিয়েও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। বৃটিশ অঞ্চলে আগত উপজাতীয়দের মধ্যে বিতরণের জন্যে এটি ছাপানোও হয়েছিল···।"

১৯৪১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সরকার বন্দীদের মুক্তি দিতে শুরু করলো। গান্ধীজী বললেন, "বাইরের কোনও কারণে আমার আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করবার কোনও অধিকার নেই। তা কংগ্রেসই করতে পারে।"

২৩শে ডিসেম্বর বারদৌলিতে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসলো। জাপান পুরোপুরি যুদ্ধে নেমে পড়ায় ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রতিরক্ষার প্রশ্ন আবার দেখা দিলো। কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় বহু ব্যক্তিই বৃটিশ সরকার দাবি পূরণ করলে তাঁরা যুদ্ধে সাহায্য করবেন, এই মনোভাব প্রকাশ করলেন এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বোম্বাই অধিবেশনে ১৬ই সেপ্টেম্বর এইরূপ প্রস্তাবই নিয়েছিল বলতে লাগলেন। গান্ধীজী কংগ্রেসের সভাপতি মওলানা আজাদকে জানালেন যে, বোম্বাই প্রস্তাবের ব্যাখ্যায় তাঁর একটি গভীর ভুল হয়েছিল। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, প্রধানতঃ অহিংসার কারণেই কংগ্রেস এই যুদ্ধে বা যে কোনও যুদ্ধে অংশ গ্রহণের বিরোধী। তিনি প্রস্তাবটি পুনরায় পাঠ করে তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন। তাই বোম্বাই-প্রস্তাবের দ্বারা তাঁর ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, তা থেকে তিনি তাঁকে মুক্তি দিতে বললেন এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে বলবার স্বাধীনতার দাবিতে তিনি অহিংসায় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের নিয়ে তাঁর আইন অমান্য আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বললেন।

বারদৌলি প্রস্তাব সম্পর্কে আবদুল গফর বললেন, "আমি স্বীকার করব যে, আমি রাজনীতিবিদ্ নই। আইনের মারপ্যাচ ও কূটনীতি আমি বুঝি না। বন্ধুরা চান, এই কারণেই আমি ওয়ার্কিং কমিটিতে আছি। আমি ভারতের স্বাধীনতা চাই এবং অহিংসা আমার কাছে কৌশল মাত্র নয়, অহিংসা আমার আদর্শ। আমার কাছে, অহিংসা অর্থপূর্ণ গতিবান্ শক্তি এবং অহিংসাই একমাত্র পথ। পাঠানজাতিকে তার দাসত্ব ও আত্মঘাত থেকে অহিংসাই মুক্তি দিতে পারে। সক্রিয় অহিংসাতেই ভারতের মুক্তির চাবি আছে, এবং সেই কারণেই আমি কেবল এই যুদ্ধে নয়, কোনও যুদ্ধেই অংশগ্রহণের বিরোধী।"

আবদুল গফর এই কারণে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করলেন। তিনি একটি বিবৃতিতে বললেন : "কংগ্রেসের নীতি প্রয়োজনমতো সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হ'তে পারে। তাই আমি যদি কংগ্রেস থেকে সরকারীভাবে দূরে থাকি, তবে পাঠানদের কাছে অহিংসার বাণী পৌঁছে দিতে অধিকতর সমর্থ হব। তাতে আমার সঙ্গে কংগ্রেসের বন্ধন এখনকার চেয়ে দৃঢ়তর হবে।"

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী দ্রুতগতিতে অগ্রসর হ'তে লাগলো। এশিয়া ও ইউরোপে মিত্রশক্তি বারবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো। ১৯৪২ সালের ৭ই মার্চ রেঙ্গুনের পতন ঘটলো। রেঙ্গুনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের আক্রমণ যে কোন মুহূর্তে বাংলাদেশে ও মাদ্রাজে আসবার আশঙ্কা দেখা দিলো। ১১ই মার্চ বৃটিশ সরকার ভারতীয় রাজনীতিতে অচলাবস্থা দূর ক'রে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতবাসীর পূর্ণ সহযোগিতালাভের চেষ্টায় স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌কে দূতরূপে ভারতে পাঠালেন।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ২৩শে মার্চ দিল্লীতে পৌঁছলেন এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। স্যার স্ট্যাফোর্ডের প্রস্তাবে যা ছিল, তা সবই যুদ্ধের পরের জন্যে তোলা ছিল, তার বিনিময়ে বৃটিশ সরকার ভারতবাসীর অকুণ্ঠ সহযোগিতা চাইছিল। গান্ধীজী স্যার স্ট্যাফোর্ডকে বললেন, "এজন্য আপনার আসবার কি প্রয়োজন ছিল? আপনি যে বিমানটি প্রথমে পাবেন, তাতেই লণ্ডনে ফিরে যান।" তিনি আরও বললেন যে, স্যার স্ট্যাফোর্ড যুদ্ধের পরে ভারতকে যে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়ার কথা বলছেন, তা কংগ্রেসের কাছে গ্রহণীয় নয়। দ্বিতীয়তঃ, স্যার স্ট্যাফোর্ড ভবিষ্যৎ সংবিধানে ভারতকে যে তিন শ্রেণীর রাজ্যসমূহে বিভক্ত করবার পরিকল্পনা করেছেন, তা-ও

কংগ্রেস গ্রহণ করতে পারে না। এতে পাকিস্তানের আভাস থাকলেও পাকিস্তানের স্বীকৃতি না থাকায় মুসলিম লীগও এই প্রস্তাব গ্রহণ করবে না। গান্ধীজী ২৬শে এপ্রিল তাঁর 'হরিজন' পত্রিকায় বৃটিশকে ভারত ত্যাগ করবার জন্যেই সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন।

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে রাজাগোপালাচারী মাদ্রাজের আইনসভার কংগ্রেসী সদস্যদের এক বৈঠকে আসন্ন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে উত্থাপনের জন্যে দুটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তার একটিতে পাকিস্তানের ভিত্তিতে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মীমাংসা করবার এবং অপরটিতে মাদ্রাজে পুনরায় মন্ত্রিসভা চালু করবার প্রস্তাব করা হলো। ২৯শে এপ্রিল থেকে ২রা মে পর্যন্ত এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হলো, তাতে কংগ্রেস-সদস্যরা এই দুই প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করলেন। ফলে রাজা-গোপালাচারী ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন। রাজাগোপালাচারীর ভারতবিভাগের প্রস্তাব সম্পর্কে আবদুল গফরের অভিমত জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "আপনারা জানেন, আমি কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেছি। আমি সৈনিক মাত্র। আমি কাজই বুঝি। আমি সর্বদাই বাদ-বিসংবাদ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করেছি। কারণ, বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরনের বাদ-বিসংবাদ অর্থহীন।" তিনি বললেন, "সংবাদপত্রগুলির জন্যেই পাকিস্তানের প্রশ্নটি এতো গুরুত্ব পেয়েছে।" গান্ধীজী ওয়ার্ধা থেকে যে প্রস্তাবের খসড়াটি রচনা করে পাঠালেন, প্রায় তা-ই বিনা বিরোধিতায় কংগ্রেসে গৃহীত হলো। এই সময় গান্ধীজী তাঁর 'হরিজন' পত্রিকায় তাঁর "ভারত ছাড়" দাবির বিষয়টি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসলে গান্ধীজী কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আজাদকে "ভারত ছাড়" আন্দোলন সম্পর্কে পূর্বাভাস দিলেন এবং ১৪ই জুলাই ওয়ার্কিং কমিটি এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলো। ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাব প্রচারিত হলে সর্বত্রই চাঞ্চল্য দেখা গেল। আবদুল গফর সীমান্ত প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে জনসাধারণকে আসন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানালেন।

বোম্বাইয়ে ৫ই আগস্ট ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ওয়ার্ধায় গৃহীত প্রস্তাবটিই প্রায় হুবহু ৭ই আগস্ট তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে উত্থাপনের জন্য রচিত হলো। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে

"ভারত ছাড়" প্রস্তাবটি দুদিন তর্ক-বিতর্কের পর বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হলো। ৯ই আগস্ট মহাত্মা গান্ধী এবং ওয়ার্কিং কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যরা গ্রেফতার হলেন এবং তাঁদের বিশেষ ট্রেনে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অন্তরীণ রাখবার জন্যে পাঠানো হলো। নেতাদের এই আকস্মিক গ্রেফতারে বিভিন্ন স্থানে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও হাঙ্গামা দেখা দিল। সরকার কঠোর দমননীতির আশ্রয় নিলো।

সীমান্ত প্রদেশে গোড়ার দিকে অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিল। আবদুল গফর স্থানীয় সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যোগ দেন নি। সীমান্ত প্রদেশ কমিটি সীমান্ত প্রদেশে "ভারত ছাড়" আন্দোলন চালাবার সমস্ত ভার তাঁর উপরই অর্পণ করেছিল। বোম্বাইয়ে কংগ্রেস-নেতাদের গ্রেফতারের সংবাদ এই সময় এসে পৌঁছলো। ১০ই আগস্ট পেশোয়ারে এক জনসভায় আবদুল গফর "ভারত ছাড়" প্রস্তাবের সমর্থনে ভাষণ দিলেন। তবে তিনি খুদাই খিদমতগারদের ধৈর্য ধরবার জন্যে নির্দেশ দিলেন এবং গঠনমূলক কাজ চালিয়ে যেতে বললেন। তিনি বললেন, "আন্দোলন শুরু করবার সময় এখনো আসেনি। আমরা মদের দোকানগুলিতে পিকেটিং করছি। এই কাজ আমরা আরও কিছুদিন চালিয়ে যাবো।" তাঁর কিছু কিছু সহকর্মী টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কাটা, রেললাইনের পাত তুলে ফেলা প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কাজ করবার কথা বললেন। তাতে তিনি বললেন, তা করা যেতে পারে; তবে যে ঐ কাজ করবে, তাকে তা স্বীকার করে পুলিসের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে হবে। তাতে কর্মীদের মনোবল বাড়বে, জনসাধারণের কাছে সাহস ও সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হবে এবং অকারণে নির্দোষ ব্যক্তিদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের সুযোগ থাকবে না।

১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে ডাঃ খান সাহেব লালকোর্তার পোশাক পরে তিনজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে পেশোয়ারের সরকারী দপ্তরে ও আদালতে কর্মীদের উদ্দেশে একটি ভাষণ দিলেন। কাজী আতাউল্লা-ও কয়েকজন খুদাই খিদমতগারকে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলিতে গিয়ে "ভারত ছাড়" প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করলেন। অন্য একটি দল গেলেন থানায় থানায় "ভারত ছাড়" দাবিতে বক্তৃতা করতে। সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি আবদুল গফর এই আন্দোলনের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি করলেন। এখন জেলায় জেলায় খুদাই খিদমতগাররা দলে দলে আদালত ও সরকারী ভবনগুলিতে জাতীয় পতাকা তুলবার জন্যে অভিযান

করলেন। সর্বত্রই "ইনকিলাব জিন্দাবাদ" ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলো। আদালত ও সরকারী ভবনগুলিতে সামরিক ও সশস্ত্র পুলিস-পাহারা বসানো হয়েছিল। তাদের রক্ষাব্যূহ ভেদ করে খুদাই খিদমতগাররা অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে তাদের নির্মমভাবে প্রহার ক'রে সংজ্ঞাহীন করে ফেলা হলো। অধিকাংশ খুদাই খিদমতগার জখম হলো এবং তাদের কংগ্রেসের সেবাকেন্দ্রগুলিতে নিয়ে যাওয়া হলো। পক্ষকালের জন্য আদালতগুলি বন্ধ রইলো। আদালত খুললে খুদাই খিদমতগাররা আবার অভিযান করলেন, নির্মমভাবে প্রহৃত ও আহত হলেন।

অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের মতো সীমান্ত প্রদেশের সরকার খুদাই খিতমতগারদের গ্রেফতার করে নি। তারা নানা কৌশলে খুদাই খিদমতগারদের আন্দোলনকে দুর্বল করে দিতে চেষ্টা করছিল। এই উদ্দেশ্যে তারা মোল্লাদের ব্যবহার করছিল, খুদাই খিদমতগারদের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা প্রচার করে তাদের লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল। তারা কি ধরনের কৌশল নিতো, তার একটির নমুনা বর্ণনা করেছেন স্যার রাশব্রুক উইলিয়াম্‌স্‌। পেশোয়ারে একটি অভিযানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঐ সময়ে ইস্‌কান্দার মির্জা, যিনি পরে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন এবং আরও পরে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে সম্প্রতি বিদেশে মারা গেছেন, পেশোয়ারে সরকারের রাজনৈতিক বিভাগে কাজ করতেন। তিনি খুদাই খিদমতগারদের অনেকগুলি শিবিরের রাঁধুনিকে টাকা দিয়ে হাত করেন এবং খাবারের সঙ্গে কড়া জোলাপ মিশিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। খুদাই খিদমতগাররা অভিযানের জন্যে মিছিল করে বার হওয়ার পর জোলাপের কাজ শুরু হয়, এবং বহু খুদাই খিদমতগার বাধ্য হয়ে মিছিল ছেড়ে বাড়িতে ফিরে যায়।'

সীমান্ত প্রদেশে কি ঘটছে, তার সংবাদ যাতে বাইরে না যায়, সরকার সেজন্য কড়া সেন্সরের ব্যবস্থা করেছিল। ভয়, খুদাই খিদমতগারদের সংগ্রাম-কাহিনী ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের প্রভাবিত করবে। শেষ পর্যন্ত তারা আবদুল গফরকে গ্রেপ্তার করলো। আবদুল গফর নিজেই এর বর্ণনা দিয়েছেন:

> আমাদের প্রদেশিক জিরগা গণ-আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার সমস্ত ক্ষমতা আমার হাতে ন্যস্ত করলো, আমি একনায়ক নিযুক্ত হলাম। 'একনায়ক' শব্দটা শুনলেই আমি শিউরে উঠি, কারণ স্বৈরশাসন ও

একনায়কত্বকে আমি তীব্রভাবে ঘৃণা করি। আমার 'একনায়কত্বসুলভ' আদেশগুলি দেওয়ার আগে আমি সর্বদাই আমার সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করতাম।

আমার নির্দেশ অনুসারে গণ-আন্দোলন শুরু হলো। বান্নু, কোহাট, টাঙ্ক, মর্দান ও পেশোয়ারে আদালত ও অফিসগুলিতে হানা দেওয়া হলো। সরকার আন্দোলন দমনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলো। বৃটিশের প্রতি চিরাচরিত আনুগত্য প্রকাশ করে ইস্কান্দার মির্জা সৈয়দ আকবর নামে একজন খুদাই খিদমতগারকে হত্যা করে তার প্রভুদেরও ছাড়িয়ে গেল। সে খুদাই খিদমতগারদের শিবিরে তরিতরকারিতে বিষ পর্যন্ত মেশালো। যারা তা খেয়েছিল, তারা মারাত্মক রূপে পীড়িত হলো। আমি তার অন্যান্য অপরাধের কথা প্রকাশ করতে চাই না, আমি তাকে সেই সর্বশক্তিমানের কাছেই অভিযুক্ত করব, যাঁর সামনে আমাদের সবাইকে কেয়ামতের দিন হাজির হতে হবে।

'ভারত ছাড়' আন্দোলন চালাবার জন্যে আমি প্রদেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতাম। একদিন কোহাট যাত্রাকালে পথে আমি কোহাট-গিরিপথে একটি থানায় গ্রেফতার হলাম। সেখান থেকে আমাকে গাড়িতে করে পেশোয়ারে এনে ছেড়ে দেওয়া হলো। আমি যেখানেই গেলাম, সেখানেই অনুরূপ গ্রেফতার ও মুক্তির অভিনয় চলতে লাগলো।

১৯৪২ সালের ২৭শে অক্টোবর আমি পঞ্চাশজন খুদাই খিদমতগারের একটি দল নিয়ে চরসদ্দা থেকে পায়ে হেঁটে মর্দানের জেলা-কোর্টে হানা দেওয়ার জন্যে গেলাম। পথে আমরা কতকগুলি গ্রামে জনসভায় ভাষণ দিলাম। মিরোয়াসডেরিতে পুলিস আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমরা শক্ত করে হাত ধরাধরি করে এগুতে লাগলাম। পুলিস আমাদের পৃথক করে দিলে আমরা আবার তৎক্ষণাৎ পরস্পরের হাত ধরলাম। পুলিস নির্মমভাবে লাঠি দিয়ে আমাদের প্রহার করলো। একটি সামান্য কর্মচারী, নাম খুশদিল খান্, আমাকে প্রহার করে আমার পাঁজরার দুটো হাড় ভেঙে দিলো। আমার পোশাক রক্তে ভিজে গেল। সে আমাদের সবাইকে গ্রেফতার করে মর্দান জেলে এবং পরদিন রিশলপুর ও পরে হরিপুর জেলে নিয়ে এলো। হরিপুর জেলে আমাদের বহু কর্মীকে রাখা হয়েছিল। তারা প্রায়ই 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতো। আমি

থাকায় জেল কর্তৃপক্ষ তা উপেক্ষা করতো। তবে শীঘ্রই আমাকে অ্যাবটাবাদ জেলে পাঠানো হলো।

তাঁর জেল-অভিজ্ঞতা সম্পর্কেও তিনি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন :

বৃটিশ সরকার আমার প্রতি বৈরিভাবাপন্ন হলেও আন্দোলনের গোড়ার দিকে ছাড়া আমাকে অপমান করে নি বা আমার উপর অত্যাচার করে নি। একবার ইন্‌স্‌পেক্টর অব প্রিজন্‌স্‌ কর্নেল স্মিথ্‌ অ্যাবটাবাদ জেলে একটি ক্ষুদ্র সেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি আমার সঙ্গে একটুক্ষণ কথা বললেন এবং সেলের বাইরে বেরিয়েই জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে রাগের সঙ্গে বললেন, "আপনারা এঁকে এই পায়রাখোপে রেখেছেন! তাঁকে আপনারা হাসপাতালের একটা ঘরে রাখেন নি কেন?" জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সসম্ভ্রমে তাঁকে বললেন যে, সরকার তাঁকে এইরকম আদেশই দিয়েছেন। কর্নেল স্মিথ গভর্নর স্যার জর্জ কানিংহামের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে বললেন, "ইওর এক্সেলেন্সি, বাদশা খানের প্রতি আপনারা এখন যে রকম ব্যবহার করছেন, তা কি কোন বীর প্রতিপক্ষের প্রতি করা উচিত?" স্যার জর্জ লজ্জিত হলেন এবং তাঁর আদেশ প্রত্যাহার করে নিলেন। আগেই কর্নেল স্মিথ আমাকে উপযুক্ত একটি জেলে স্থানান্তরিত করবার জন্যে হুকুম দিয়েছিলেন, যেখানে আমার সঙ্গে আমার ছেলে ওয়ালি থাকতে পারবে। আমাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্যে তিনজনকে এখানে পাঠানো হয়েছিল।

এই কর্নেল স্মিথ সম্পর্কেও তিনি একটি সুন্দর বিবরণী লিপিবদ্ধ করেছেন :

কর্নেল স্মিথকে বিশেষভাবে খুদাই খিতমতগারদের দমনের জন্যে সীমান্ত প্রদেশে ইন্‌স্‌পেক্টর অব প্রিজন্‌স্‌ করে আনা হয়েছিল। একটি বদমেজাজী পাক্কা সাহেব, খুদাই খিদমতগারদের প্রতি অতিশয় বৈরিভাবাপন্ন। তিনি একবার একজন খুদাই খিদমতগারকে একটি তালাবদ্ধ সেলের মধ্যে নিজে গুলী করে মেরেও ছিলেন। একবার জেল পরিদর্শনের জন্যে তিনি হরিপুর জেলে এলেন। আমি উঠানে কিছু মুরগি পুষেছিলাম। পাখীগুলো এসে আমার কোলে বসতো। কখনও কখনও আমার পিঠে মাথায় কাঁধে চড়তো। কর্নেল স্মিথ অলক্ষ্যে থেকে এই দৃশ্য দেখছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমার সামনে এসে বললেন,

"গুড মর্নিং, খান সাহেব! এ কি হচ্ছে?" আমি বললাম, "দেখতেই পাচ্ছেন।" তারপর বললাম, "এ থেকে ইংরেজরা খুব ভালো একটি জ্ঞান লাভ করতে পারেন।" তিনি ঠিক বুঝলেন না। আমি ব্যাখ্যা করে বললাম যে, তিনি যা দেখছেন, তা ভালোবাসার শক্তির একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত। এই পাখী বন্ধুরা জানে, লোকে তাদের খায়, লোকে তাদের মেরে ফেলে, তাই তারা সাধারণতঃ লোককে ভয় পায়। কিন্তু দেখুন, আমার সামান্য একটু ভালোবাসায় তারা কেমন সাড়া দিয়েছে! আমার মন্তব্য শুনে তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, একটি কথাও বললেন না। তারপর, যদিও আমাদের আন্দোলন চলতে লাগলো, তিনি সম্পূর্ণরূপে বদলে গেলেন। ইংরেজরা দেশপ্রেমিক ও সাহসী, এই গুণ তারা অন্যের মধ্যেও প্রশংসার চক্ষে দেখে। আমার জন্যে একটু দুর্বলতা ছিল তাঁর মনে। তিনি উদ্ধত হলেও দৃঢ়চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তিনি বলতেন, যদি সত্যিই পাকিস্তান হয়, তবে তিনি একদিনও এ দেশে থাকবেন না। তিনি কথা রেখেছিলেন। পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে দেশে চলে গিয়েছিলেন।

আবদুল গফর বলেছেন, জেলে রাজবন্দীদের কাজ থাকতো না; তাই তাঁরা কাজ চাইলেন এবং রাজবন্দীরা কাজ করে রোজ প্রায় দুটাকা রোজগার করতেন। ঐ টাকা তাঁরা আন্দোলনের জন্যে পাঠিয়ে দিতেন। তাঁরা খুদাই খিদমতগারদের নিরক্ষরতা দূর করবার জন্য ক্লাস নিতেন। তাঁরা কোরান ও গীতা পড়তেন। প্রতি রবিবার মিলিত হয়ে কবি ইকবালের "হিন্দুস্থান হামারা" গানটি সমবেত ভাবে গাইতেন এবং নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন।

আবদুল গফর যখন কারাগারে ছিলেন, তখন সারাদেশে সরকার প্রচণ্ড দমননীতি চালাচ্ছিল। ১৯৪২ সালের শেষ পর্যন্ত ষাট হাজারেরও বেশি মানুষ কারাগারে গিয়েছিল। প্রায় ছ হাজার খুদাই খিদমতগার গ্রেফতার হয়েছিলেন সীমান্ত প্রদেশে। তার ওপর ছিল পুলিসের লাঠি, গুলী, কাঁদানে বোমা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, লুণ্ঠন, এমন কি নারীনির্যাতন পর্যন্ত।

গান্ধী প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় নেতাদের কারও যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে মুক্তির সম্ভাবনা ছিল না। আগস্ট আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় রাজনীতিতেও পরিবর্তন ঘটেছিল। কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় বহু নেতা জেলে

থাকলেও যাঁরা বাইরে ছিলেন বা মুক্তি পেয়েছিলেন, তাঁরা কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্মসূচীতে ও সংসদীয় রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সীমান্ত প্রদেশেও এই পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের মে মাসে সীমান্ত প্রদেশের আইনসভার বহু কংগ্রেসী সদস্য জেলে থাকায় গভর্নর তাঁর তাঁবেদার আওরংজেব খান্‌কে দিয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। অক্ষমতা, দুর্নীতি ও স্বার্থপরতার জন্যে এই মন্ত্রিসভা স্বল্পদিনের মধ্যেই কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে এই মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা-প্রস্তাব আনীত হলে আওরংজেব মন্ত্রিসভার পতন ঘটলো। এখন ডাঃ খান সাহেবের নেতৃত্বে সীমান্ত প্রদেশে একটি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হলো। এই মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন হয়েই আবদুল গফর খান্ ও খুদাই খিদমতগার কর্মীদের মুক্তির আদেশ দিলেন।

১৯৪৫ সালের মে মাসে জার্মানির পরাজয় ঘটলো। জাপানের ত্বরিত পরাজয়ের জন্য মিত্রপক্ষ ভারতের সহযোগিতা পেতে চাইলো এবং সরকার জুন মাসে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিলো। রাজনৈতিক বন্দীরাও মুক্তি পেতে লাগলেন।

এইভাবে জাতীয় সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শেষ হলো।

১২.

আগুন : অন্ধকার : স্বদেশে পরদেশী

১৯৪৫ সালের ২৫শে জুন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল তাঁর সিমলা-ভবনে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির এক সম্মেলন ডাকলেন। এই সম্মেলনে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ডাঃ খান্ সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। জিন্না কংগ্রেসকে হিন্দু-সংস্থা রূপে বর্ণনা করবার জন্যে দাবি জানালে বড়লাট তার প্রতিবাদ করলেন। জিন্নার সঙ্গে এ ব্যাপারে তাঁর তর্কও হ'লো। এই সভায় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, তপসিলভুক্ত সম্প্রদায়, শিখ, ইউরোপীয় দল ও ন্যাশন্যালিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা মিলিত হয়েছিলেন। জিন্না বললেন, আমরা এখানে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে মিলিত হয়েছি। কংগ্রেস যদি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব না করে, তবে তা

কারও প্রতিনিধিত্ব করে না। বড়লাট বললেন, কংগ্রেস প্রতিনিধিত্ব করে তার সদস্যদের। ডাঃ খান্ সাহেব বললেন, জিন্না কি বলতে চান? আমি কংগ্রেসের সদস্য। আমি হিন্দু, না মুসলিম? বড়লাট বললেন, ও তর্ক থাক্; কংগ্রেস তার সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব করে। এই সম্মেলনে কতখানি ক্ষমতা ভারতবাসীকে দেওয়া হবে, সে সম্পর্কে কোনও আলোচনা হ'লো না। কেবল বড়লাটের নূতন শাসন-পরিষদে কে কতগুলি আসন পাবে, তা নিয়েই আলাপ চললো। জিন্না ও আজাদ ২৯শে জুন জানালেন, তাঁরা এ বিষয়ে একমত হ'তে পারছেন না। তখন বড়লাট বললেন, সকল দল তাঁদের মনোনীত ব্যক্তিদের তালিকা পাঠান। তিনি তাঁদের মধ্য থেকেই নূতন শাসন-পরিষদের সদস্যদের বেছে নেবেন। কংগ্রেস ও অন্যান্য ছোট দলগুলি এইরূপ তালিকা পেশ করলেও মুসলিম লীগ কোনও তালিকা দিল না। কংগ্রেস নূতন শাসন-পরিষদ কাদের নিয়ে গঠিত হওয়া উচিত, তার একটি পূর্ণ তালিকা দিয়েছিল। তাতে জিন্না সহ মুসলিম লীগের তিনজন সদস্য এবং আজাদ ও আসফ আলি সহ কংগ্রেসের পাঁচজন সদস্যের নাম ছিল। আজাদ ও আসফ আলির অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছিল, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই দুজন সদস্য থাকবেনই, কারণ এটা নীতির প্রশ্ন, কংগ্রেস সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু জিন্না বললেন, শাসন-পরিষদে মুসলিম সদস্যদের সকলেই মুসলিম লীগ-মনোনীত হবেন, এই শর্তেই তিনি তালিকা পেশ করতে পারেন। ফলে সিমলা-সম্মেলন ব্যর্থ হ'লো।

সিমলা-সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার পক্ষকালের মধ্যেই ২৬শে জুলাই ইংলণ্ডে লেবার পার্টি ক্ষমতায় এলো এবং আরও পক্ষকালের মধ্যে জাপান আত্মসমর্পণ করলো। ফলে যুদ্ধের জরুরী অবস্থা আর রইলো না। ২১শে আগস্ট বৃটিশ সরকার ঘোষণা করলো যে, শীঘ্রই ভারতেও কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য বড়লাট লণ্ডনে যাচ্ছেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ও ভারতের বড়লাট ঘোষণা করলেন যে, সাধারণ নির্বাচনের পরে যথাসম্ভব সত্বর আইনসভাসমূহের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে একটি সংবিধান-রচয়িতা সংস্থা গঠিত হবে; ইতিমধ্যে "গ্রেট বৃটেন ও ভারতের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয়" বিষয়বস্তু আলোচিত হবে; নির্বাচনের পরে তাঁর শাসন-পরিষদ গঠনের জন্য বড়লাটকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বোম্বাইয়ে ২১শে সেপ্টেম্বর নিখিল

ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হ'লো, তাতে বড়লাটের ঘোষণাকে "স্পষ্ট যথেষ্ট ও সন্তোষজনক নয়" বলা হ'লো। এতে নির্বাচকমণ্ডলীর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সমালোচনা করা হ'লো। এখন আবদুল গফর অধিকাংশ সময় গান্ধীজীর সঙ্গেই ছিলেন। তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে কর্নাটক থেকে আগত প্রতিনিধিদের এক সভায় ২৫শে আগস্ট বক্তৃতা দিলেন। তাতে তিনি বললেন, মানুষের সেবাই ভগবানের সেবা। এই সেবা অহিংসার মাধ্যমেই করা যায়। অহিংসা একটি সুমহান্ মতবাদ। কেবল অহিংসার দ্বারাই সফল-ভাবে হিংসার প্রতিরোধ করা যায়। সীমান্ত প্রদেশ হিংসা ও অহিংসা দুয়েরই পরীক্ষা করে দেখেছে। তারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে, যেখানে হিংসা ব্যর্থ হয়েছে, সেখানেও অহিংসা জয়লাভ করেছে। হিংসা আপনজনকে ধ্বংস করে এবং হিংসাকে সহজে দমন করা যায়। কিন্তু অহিংসাকে দমনের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে এবং ঐসব চেষ্টা অহিংসাকে আরও শক্তিশালী করেছে। বৃটিশরা নির্মমভাবে হিংসাকে দমন করেছে, কিন্তু অহিংসাকে দমন করতে গিয়ে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছে। তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্পর্কে বলেন, হিন্দু ও মুসলমান ছিল ভাই-ভাই। তারা বৃটিশকে বিতাড়নের কাজে হাত মিলিয়েছিল। ধূর্ত ইংরেজ তাদের মনে বিভেদের বীজ বপন করেছে, এমন কি শিশুদেরও আমি হিন্দু আমি মুসলমান ভাবতে শিখিয়েছে। তিনি স্ত্রীলোকদের জাতীয় সংগ্রামে অংশগ্রহণ করায় আনন্দ প্রকাশ ক'রে বলেন, আমরা সীমান্ত প্রদেশে নারীজাতিকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমরা তাঁদের সমান সুযোগ দিই না। তবে আমাদের স্ত্রীলোকরাও এগিয়ে আসছেন, তাঁরাও পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করবেন।

ঐ সময় গান্ধীজী বাংলাদেশে এলে আবদুল গফরও তাঁর সঙ্গে এলেন। তিনি গান্ধীজীকে জানালেন যে, নির্বাচনী অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করতে চান না। গান্ধীজী তাঁকে এ বিষয়ে সমর্থন করলেন। কংগ্রেস সংসদীয় পরিষদ তাঁকে নির্বাচনী অভিযানে অংশগ্রহণের জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেও তিনি নিজের সংকল্পে অবিচল রইলেন এবং সারা সীমান্ত প্রদেশে ঘুরে খুদাই খিদমতগার সংস্থাকে দৃঢ়তর ক'রে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে মত পরিবর্তন করতে হ'লো। তিনি দেখলেন, সমগ্র সরকারী যন্ত্র নির্বাচনে খুদাই খিদমতগারদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছে। পেশোয়ারের ইসলামিয়া কলেজ, সীমান্ত প্রদেশের অন্যান্য স্কুল-কলেজ, পাঞ্জাব,

আলিগড় ও অন্যান্য স্থান থেকে বহু ছাত্রকে মুসলিম লীগের সমর্থনে প্রচারের জন্যে আনা হয়েছে। মুসলিম লীগের পক্ষে নির্বাচনে কাজ করবার জন্য সরকারের নির্দেশে সীমান্ত প্রদেশের বহু স্কুল-কলেজ ছুটি দেওয়া হয়েছে। এবং ইংরেজ-ঘেঁষা মহিলাদের নেতৃত্বে বালিকাদেরও মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচারের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। ইংরেজ মহিলারাও লীগের জন্যে প্রচারকার্যে নেমেছে। সীমান্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের মোল্লা ও মওলানারাও লীগের পক্ষে প্রচারকার্য চালাচ্ছে। লীগ নির্বাচনে জিগির তুলেছে—হিন্দুস্থান না পাকিস্তান, হিন্দু না মুসলমান, কাফের না ইসলাম, মন্দির না মসজিদ? কিন্তু পাঠানরা ভারতের অন্যান্য স্থানের মুসলমানদের মতো নয়, তারা "ইসলাম বিপন্ন" এই ছেঁদো কথায় সহজে ভোলে না। তবু এই প্রচার যে খুদাই খিদমতগার তথা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কিছুটা কাজ করবে, তা জেনে আবদুল গফর নির্বাচনের একমাস আগে নির্বাচনী অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

নির্বাচনে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হ'লো।

বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধু ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলো। বাংলাদেশে মুসলিম লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলো এবং প্রায় অর্ধেকসংখ্যক আসন অধিকার করলো। পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ ও ইউনিয়নিস্ট পার্টি প্রায় সমান সমান আসন পেলো। সিন্ধুপ্রদেশে মুসলিম লীগ অনেক আসন পেলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলো না। পাঞ্জাবে কংগ্রেসের সমর্থনে ইউনিয়নিস্ট পার্টি সরকার গঠন করলো। বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে জনসংখ্যার অধিকাংশ ছিল মুসলমান এবং লীগ এই তিনটি প্রদেশে সর্বাধিক ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কোথাও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলো না। সীমান্ত প্রদেশে যেখানে শতকরা ৯৫ ভাগ মুসলিমের বাস, সেখানে মুসলিম লীগ ব্যর্থ হ'লো এবং কংগ্রেস সহজেই মন্ত্রিসভা গঠন করলো। অবশ্য, সীমান্ত প্রদেশে ছাড়া অন্যত্র কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনসমূহে মুসলিম লীগ প্রায় সমস্ত আসনই পেয়েছিল।

বড়লাট নির্বাচনের এই ফলাফলের ভিত্তিতে বৃটিশ সরকারকে জানালেন যে, কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং এখন মীমাংসায় না এলে কংগ্রেস তার দাবি সম্পর্কে কঠোরতর হ'তে পারে এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে নামতে পারে। ইতিমধ্যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বন্দী

সৈনিকদের বিচার, রাজকীয় ভারতীয় বিমান ও নৌবাহিনীতে অসন্তোষ ও বিদ্রোহও বৃটিশ সরকারকে ভারতের বিষয়ে ত্বরান্বিত ক'রে তুললো। ১৯৪৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করা হলো যে, বৃটিশ সরকারের তিনজন মন্ত্রী ভারতে আসছেন। গত ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বড়লাট যা ঘোষণা করেছিলেন, তাকে কিভাবে কার্যকর করা যায়, তা নির্ধারণ করাই তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য।

১৯৪৬ সালের ২৩শে মার্চ ইংলণ্ডের তিনজন মন্ত্রী লর্ড পেথিক-লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ ও মিঃ এ. ভি. আলেকজাণ্ডার ভারতে এসে পৌঁছলেন। তাঁরা ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁরা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সভাপতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতবিরোধ ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় মিটিয়ে ফেলাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো। ৫ই মে থেকে ১২ই মে পর্যন্ত সিমলায় একটি সম্মেলন বসলো।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজাদ, নেহরু, প্যাটেল ও আবদুল গফর সিমলা সম্মেলনে যোগ দিলেন। কেবিনেট মিশন ও কংগ্রেসের আমন্ত্রণক্রমে গান্ধীজীও উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলন সম্পর্কে আবদুল গফর বলেছেন :

> সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে আমরা স্থির করলাম যে, বৃটিশরা এখন ভারতকে স্বাধীনতা দিতে এবং ভারত থেকে সৈন্যবাহিনী অপসারিত করতে প্রস্তুত কিনা, তা মন্ত্রিমিশনকে জিজ্ঞাসা করা হবে। আলোচনা-কালে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি যাতে এড়িয়ে যাওয়া না হয়, সে বিষয়ে আমরা খুবই আগ্রহী ছিলাম। জওহরলাল নেহরু এই প্রয়োজনীয় প্রশ্নটি সম্মেলনের শুরুতেই তুললেন। লর্ড ওয়াভেল মন্তব্য করলেন, তাঁরা ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে প্রস্তুত, তবে কাকে ছেড়ে দিয়ে যাবেন সেটাই প্রশ্ন। কংগ্রেস ও লীগের উচিত আগে একটি মীমাংসায় আসা। জওহরলাল বললেন, "ভারতবর্ষ মুসলমানদের দিয়ে যান। তবে, আপনাদের যেতেই হবে।' জিন্না নেহরুর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলেন এবং বললেন, বিবাদ তাঁরা নিজেরা মিটিয়ে নেবেন। সম্মেলন মুলতবি রইলো। আলোচনার জন্যে জিন্না ও নেহরু পাশের একটি ঘরে গেলেন। একঘণ্টা কি দুঘণ্টা বাদে তাঁরা এই প্রস্তাব নিয়ে এলেন যে, কংগ্রেস ও লীগ তিনজন সদস্যের একটি কমিটি নিয়োগ করবে এবং সেই কমিটি

তাঁদের মতবিরোধের মীমাংসা করবে। তৃতীয় দিন যখন লর্ড পেথিক-লরেন্স জিজ্ঞাসা করলেন যে, ফলাফল কি হ'লো, তখন জিন্না সবটাই অস্বীকার করলেন। আমি আবদুর রব নিশ্‌তারকে ডেকে বললাম, তিনি যেন মিঃ জিন্নাকে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করতে অনুরোধ করেন। গান্ধীজী আমার উপস্থিতিতেই কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের বললেন, তাঁরা যেন মুসলমানদের দাবি মেনে নিয়ে পরস্পর আপোস ক'রে নেন। নিশ্‌তার গিয়ে মিঃ জিন্নার পেছনে দাঁড়িয়ে রইলেন, কিন্তু জিন্না তাঁর দিকে ফিরেও তাকালেন না। আলোচনা ব্যর্থ হলো। অন্ততঃ বৃটিশরা চাইলো না যে, হিন্দু ও মুসলমান এক হ'ক, তারা ভারতকে ভাগ করতে সংকল্প করলো।

মন্ত্রিমিশন, বড়লাট ও সম্মেলনে যোগদানকারীরা সকলে দিল্লীতে এলেন। গান্ধীজী-ভাঙ্গি পল্লীতে রইলেন এবং রোজ আবদুল গফর তাঁর উপাসনা-সভায় যোগ দিতেন। ১৬ই মে তারিখে মন্ত্রিমিশন সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতা ও সেক্ষেত্রে তাঁদের নিজেদের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন। এই পরিকল্পনার দুটি অংশ ছিল—একটি দীর্ঘমেয়াদী ও অপরটি স্বল্পমেয়াদী। দীর্ঘমেয়াদী অংশে একটি সংবিধানসভা গঠনের ও স্বল্পমেয়াদী অংশে প্রধান ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে বড়লাটের শাসন-পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়েছিল। মুসলিম লীগের পাকিস্তানের দাবি অস্বীকার করা হলেও এতে একটি ত্রিতল ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল। সবচেয়ে উপরের তলায় থাকবে বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহের একটি যুক্তরাষ্ট্র। তার হাতে পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগের ভার থাকবে। নিচের তলায় থাকবে প্রদেশ ও রাজ্যগুলি, তাদের হাতে অবশিষ্ট সব বিষয় ন্যস্ত থাকবে। তবে প্রদেশগুলির নিজেদের মধ্যে 'গ্রুপ' বা মণ্ডল গঠনের স্বাধীনতা থাকবে। এইসব মণ্ডলের থাকবে প্রশাসন বিভাগ ও আইনসভা। এটি হবে মাঝের তলা। পরিকল্পনায় ভারতবর্ষকে ক, খ ও গ এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হলো। 'খ' শ্রেণীতে থাকবে মুসলিমপ্রধান পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বালুচিস্থান। 'গ' শ্রেণীতে থাকবে বাংলা ও আসাম, যেখানে মুসলমানদের সামান্য সংখ্যাধিক্য আছে, এবং 'ক' শ্রেণীতে থাকবে বাকী অংশ।

গান্ধীজী পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা চেয়ে মন্ত্রিমিশনের সঙ্গে পত্রালাপ করলেন। একই শ্রেণীর অন্তর্গত প্রদেশগুলির জোট বাঁধা না বাঁধা

যদি তার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়, তবে তাতে আপত্তি করবার কিছু থাকে না। কিন্তু একই শ্রেণীভুক্ত প্রদেশগুলিকে জোট বাঁধার ব্যাপারে বাধ্য করলে তাতে জুলুমের ভাব থাকে। তা স্বীকার করে নেওয়া যায় না। মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবের ১৫ অনুচ্ছেদের তাঁরা এই ব্যাখ্যা করলেন যে, প্রথমে প্রদেশগুলি তাদের যে শ্রেণীতে রাখা হয়েছে, তাতে তারা থাকবে কিনা তা স্থির করে নেবে। অন্যপক্ষে, মুসলিম লীগ এই প্রস্তাবের মধ্যে পাকিস্তানের বীজ আছে লক্ষ্য করলো।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কাজও দ্রুত এগুলো না। শেষ পর্যন্ত স্থির হলো, ১৪ জন সদস্য নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে। এঁদের মধ্যে ছজন আসবেন কংগ্রেস থেকে, পাঁচজন আসবেন মুসলিম লীগ থেকে, একজন শিখ সম্প্রদায়, একজন ভারতীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ও একজন পার্শী সম্প্রদায় থেকে। তপসিলভুক্ত সদস্য কংগ্রেসের ছজন সদস্যেরই একজন হবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মুসলিম লীগ দাবি করলো যে, কংগ্রেস তার বরাদ্দ আসন থেকেও জাতীয় মুসলিম সদস্য নিয়োগ করতে পারবে না। মুসলিম সদস্য নিয়োগের একমাত্র অধিকার থাকবে মুসলিম লীগের। সে ক্ষেত্রে কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের সম্মতি প্রত্যাহার করে মন্ত্রী-মিশনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা—অর্থাৎ সংবিধানসভা গঠনের প্রস্তাব—মেনে নিলো। তবে এ কথাও বললো যে, একই শ্রেণীভুক্ত প্রদেশগুলির জোট বাঁধা স্বেচ্ছাধীন বা বাধ্যতামূলক হবে, তা ফেডারেল কোর্ট মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবের ধারাসমূহের অর্থ বিচার করে রায় দেবেন এবং ঐ সিদ্ধান্ত সকলকে মানতে হবে। মুসলিম লীগ এখন মনে করলো যে, কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে অসম্মত হওয়ায় বড়লাট লীগকেই অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য এককভাবে আহ্বান জানাবেন। তাই লীগ অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলো। কিন্তু মন্ত্রিমিশন তাতে সম্মত হলেন না। মন্ত্রিমিশন বড়লাটকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়ে ইংলণ্ডে চলে গেলেন। বোম্বাইয়ে জুলাই মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হলো, তাতে মন্ত্রিমিশনের ১৬ই মে প্রস্তাব গ্রহণকে সমর্থন জানানো হলো এবং আজাদের স্থলে জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। মুসলিম লীগ এখন মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ নাকচ করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলো এবং ১৬ই আগস্ট তারিখে সারা ভারতে "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস" পালনের কথা ঘোষণা করলো।

৮ই আগস্ট কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পুনরায় মিলিত হয়ে মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনাকে পুরোপুরি গ্রহণ করলেন এবং মুসলিম লীগ ও অন্যান্য দলকেও এই পরিকল্পনা কার্যকর করবার জন্যে আহ্বান জানালেন। ১২ই আগস্ট বড়লাট লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেসের নব-নির্বাচিত সভাপতি জওহরলাল নেহরুকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্যে আমন্ত্রণ করলেন। জিন্নাকে নেহরু অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে সহযোগিতা করবার জন্যে আহ্বান জানালে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। ১৫ই আগস্ট নেহরুজী জিন্নার সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দেখা করেও এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। কিন্তু সুফল কিছুই হলো না।

১৬ই আগস্ট, ১৯৪৬, ভারতের ইতিহাসের এক মসীলিপ্ত দিন। বাংলা-দেশে মুসলিম লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং জনাব এচ. এস. সুরাবর্দী ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস উপলক্ষে সরকারী ছুটি দিয়েছিল। দলে দলে মুসলমান অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গড়ের মাঠে সমবেত হলো এবং সভাশেষে শোভাযাত্রীরা কলকাতার বুকে হত্যাকাণ্ড, অগ্নিকাণ্ড ও লুণ্ঠনের বীভৎস তাণ্ডব শুরু করলো। শত শত লোক হতাহত হলো, বহু গৃহ ও দোকানপাঠ লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হলো। দেখতে দেখতে সমগ্র শহর হিন্দু ও মুসলমান গুণ্ডার কবলে চলে গেলো। প্রশাসনযন্ত্র মুসলিম লীগের হাতে ছিল। তাছাড়া হিন্দুরা সম্পূর্ণ অতর্কিতে আক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু হিন্দুরা শীঘ্রই পাল্টা আক্রমণ হানলো এবং সংখ্যালঘু মুসলমানরা প্রচণ্ড মার খেলো। এই অবস্থায় সরকার সৈন্যবাহিনী তলব করতে বাধ্য হলো।

কলকাতায় এই দাঙ্গা হওয়ার সময়ও অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয় নি। বড়লাট মুসলিম লীগকে তোষণের জন্যে কংগ্রেসকে চাপ দিতে লাগলেন। বললেন, কংগ্রেস তাঁদের মুসলিম সদস্য নিয়োগের অধিকার ত্যাগ করুন এবং একই শ্রেণীভুক্ত প্রদেশগুলির জোটভুক্ত হওয়ার বাধ্যবাধকতা স্বীকার করে নিন। তা যদি না করেন, তবে সংবিধানসভা গঠন থেকে বিরত থাকুন। গান্ধীজী বড়লাটের এই কাজের প্রতিবাদ করে ইংলণ্ডে মন্ত্রিমিশনের কাছে তারবার্তা পাঠালেন। ফলে মন্ত্রিমিশন হস্তক্ষেপ করলেন এবং তাঁদের নির্দেশ অনুসারে কেন্দ্রে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হলো।

অন্তর্বর্তী সরকারে মুসলিম লীগ অংশ গ্রহণ না করায় এখন তারা জওহরলাল নেহরু কর্তৃক গঠিত সরকারকে "হিন্দুরাজ" বলে মুসলমানদের

মধ্যে অপপ্রচার করতে লাগলো। আবদুল গফর সীমান্ত প্রদেশে জনসভার পর জনসভা করে লীগের এই অপপ্রচারের প্রতিবাদ করতে লাগলেন। তিনি বললেন :

এটা বলা অন্যায় যে, হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা হিন্দুদের রাজত্ব নয়, এটা ভারতের জনসাধারণের রাজত্ব। যখন সরকার গঠিত হচ্ছিল, তখন মুসলমানদের জন্য পাঁচটি আসন বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং পরে ঐ পাঁচটি আসনই মুসলিম লীগকে দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেস বলেছিল, ভারতে কোটি কোটি মুসলমান আছেন, যাঁরা মুসলিম লীগের অন্তর্ভুক্ত নন, তাঁদেরও প্রতিনিধি থাকা উচিত। কিন্তু বৃটিশরা তাতে রাজী হয় না। সেজন্যই কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে অসম্মত হয়েছিল। মুসলিম লীগ এই সুযোগে সাময়িক সরকার গঠন করে লাভবান হতে চেয়েছিল। কিন্তু বড়লাট তাতে বাধ সাধলেন। লীগ যদি সরকার গঠন করতো, তবে আজ যেমন হয়েছে, তখনও তেমনি হতো। .. তখন কি হিন্দুরাজ হতো না? কংগ্রেস সরকার গঠন করেছে, তাই তা হিন্দুরাজ হয়েছে? আসলে এ তো ইংরেজের প্রচার। মুসলিম লীগের ভাইয়েরাও এই মাটিতেই জন্মেছেন; ইংরেজরা কখনই তাঁদের মঙ্গল চায় না। এখনও মুসলিম লীগের সরকারে প্রবেশের জন্য দ্বার উন্মুক্ত আছে। তাঁরা আসুন এবং মুসলিমরাজ প্রতিষ্ঠা করুন। আমি আপনাদের মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হতে নিষেধ করি। কে বন্ধু, কে শত্রু, চিনতে শিখুন। সংকটপূর্ণ সময় চলছে। ক্ষমতাহস্তান্তরের এই মুহূর্তে স্বার্থান্বেষীরা গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবেই। আপনারা যদি স্বার্থান্বেষীদের ফাঁদে পা দেন, তবে সমাজ ও সম্প্রদায়ের সর্বনাশ করবেন।

সীমান্ত প্রদেশ ছিল এমন একটি প্রদেশ, যেখানে শতকরা ৯৫ জন মুসলমানের বাস, অথচ এখানেই মুসলিম লীগের কোনও প্রাধান্য ছিল না। তাই মুসলিম লীগ সীমান্ত প্রদেশে সাম্প্রদায়িক প্রচারে এখন সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিল। তারা সীমান্ত প্রদেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বলছিল, কেন্দ্রে নেহরু যে সরকার গঠন করেছেন, তা নিছক হিন্দুরাজ। তারা বলছিল, সম্প্রতি ওয়াজিরিস্থানে যে বোমাবর্ষণ হয়েছে, তাও করেছে নেহরু সরকার। একটি জনসভায় আবদুল গফর বললেন :

সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম লীগের সর্বাধুনিক প্রচার হলো এই যে, নেহরু সরকারের নির্দেশেই ওয়াজিরিস্থানে বোমাবর্ষণ হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, আগস্ট মাসে যখন বোমাবর্ষণ হয়েছিল, তখন অন্তর্বর্তী সরকার গঠনও হয় নি। বোমাবর্ষণের সংবাদ যখন আমি পেলাম, তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্যে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালাম। ফলে বোমাবর্ষণ বন্ধ হলো। কিন্তু তথাকথিত ইসলামের এইসব মশালচিরা, যাঁরা উপজাতীয়দের জন্যে মুখে এতো দরদ প্রকাশ করছেন, যখন বোমাবর্ষণ চলছিল, তখন তা বন্ধের জন্যে এতোটুকু চেষ্টাও তো করেন নি।

আবদুল গফর বললেন, ওয়াজিরিস্থানে যে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে, তা নবগঠিত জনপ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে একটি বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার ফলেই যে বোমাবর্ষণ হয়েছে, তা সীমান্তের সরল মানুষদের বোঝাবার জন্যে কেবল মুখে মুখে নয়, প্রচারপত্র বিলি করেও প্রচার চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন যে, উপজাতীয় অঞ্চলের পলিটিক্যাল এজেন্টরা মুসলিম লীগের পৃষ্ঠপোষক, তারা লীগপন্থীদের সহজেই উপজাতীয় অঞ্চলে প্রবেশ করতে ও সভাসমিতি করতে দিচ্ছে। কিন্তু খুদাই খিদমতগারদের তাদের নিজ বাসভূমিতেও ঢুকতে দিচ্ছে না।

সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি উপজাতীয় অঞ্চলে ইপির ফকিরের সভাপতিত্বে একটি প্রতিনিধি-সভার আয়োজন হলো। তাতে ইপির ফকির ওয়াজিরিস্থান ও উপজাতীয় অঞ্চলে বোমাবর্ষণ বন্ধ করবার জন্যে নেহরু সরকারকে ধন্যবাদ জানালেন। তিনি ঐ সভায় বলেন: আমরা দীর্ঘকাল ধরে আমাদের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে জেহাদ চালিয়ে আসছি। হিন্দুদের বা শিখদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনও বিদ্বেষ নেই। আমাদের সংগ্রাম ইংরেজদের সঙ্গে। আমরা আশা করি যে, কেন্দ্রে নেহরুর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রশাসনের যে দায়িত্ব নিয়েছেন, তাতে প্রতিবেশী উপজাতিগুলির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আন্তরিক প্রয়াস তাঁরা করবেন। আমি এ বিষয়ে নিঃসংশয় যে, তাদের অনগ্রসরতা দূরীকরণের জন্যে তাদের শিক্ষার সুযোগসুবিধা দেওয়া হবে এবং তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। উপজাতীয় নেতাদের নামে মুসলিম লীগ যে অপপ্রচার চালাচ্ছে, তার প্রতিবাদ ক'রে তিনি বললেন, "কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও

দেশপ্রেমিক মানুষ, যে উপজাতীয় অঞ্চলকে ভালোবাসে এবং ইসলামের অর্থ কি জানে, সে কখনও ইংরেজ-সৃষ্ট মুসলিম লীগের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখবে না।"

অন্তর্বর্তী সরকারে মুসলিম লীগ যাতে যোগ দেয়, সেজন্য নেহরুজী জিন্নার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন। অক্টোবর মাসের গোড়াতে ভুপালের নবাব গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপ ক'রে একটি মীমাংসার সূত্রের কথা বললেন। তাতে বলা হ'লো যে, যেহেতু বিগত নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলির প্রায় সব কটিতে মুসলিম লীগ জিতেছে, সেজন্য কংগ্রেস মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা ব'লে মেনে নেবে এবং অপর পক্ষে মুসলিম লীগ কংগ্রেসকে অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের এবং যেসব মুসলমান কংগ্রেসের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্যকে জড়িত করেছে, তাদের প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা ব'লে স্বীকার করবে। গান্ধীজী এই আপোস-সূত্রে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে এই দাবিও করলেন যে, অন্তর্বর্তী সরকারে সকল সদস্য পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করবে এবং কোন ক্ষেত্রে গভর্নর-জেনারেলের হস্তক্ষেপ দাবি করবে না। জিন্না এই মীমাংসাসূত্রের প্রথমাংশ স্বীকার করে নিলেও দ্বিতীয়াংশ সম্পর্কে দ্বিধা প্রকাশ করলেন। জিন্না সমগ্রভাবে প্রস্তাবটি মেনে নিলেই কংগ্রেস এই আপোস-সূত্র গ্রহণ করবে, তা তাঁকে জানানো হবে।

জিন্নার সঙ্গে নেহরু এ বিষয়ে বিশদভাবে দুদিন আলোচনা করলেন। আলোচনা যখন অনেকখানি এগিয়ে গেছে, তখন হঠাৎ জিন্না তাঁর ন' দফা দাবি উত্থাপন করলেন। এই দাবি তিনি আগেই বড়লাটের কাছে উত্থাপন করেছিলেন, এবং বড়লাটও তা অনেকাংশে মেনে নিয়েছিলেন। জিন্না গান্ধীজীর প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশ মেনে নিলে কংগ্রেসও মূলতঃ এসব দাবি মেনে নিতো। কিন্তু জিন্না সে পথে না গিয়ে বড়লাটের কাছ থেকেই সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে চাইলেন এবং কংগ্রেসের সঙ্গে মীমাংসায় এলেন না। বড়লাটের কাছে সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতি নিয়ে মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করলো। নেহরু বড়লাটকে জানালেন, জিন্না কিসের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিচ্ছেন, তিনি ১৬ই মে তারিখে প্রদত্ত মন্ত্রি-মিশনের পরিকল্পনা মেনে নিচ্ছেন কিনা, তা তাঁদের জানা দরকার। অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্তের কথা মুসলিম লীগ ঘোষণা করবার চারদিন বাদে লাহোরে ছাত্রদের এক সভায় মুসলিম লীগের অন্যতম মনোনীত মন্ত্রী গজনফর

আলি খান্ ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা পাকিস্তানের জন্য লড়াইয়ের উদ্দেশ্যেই অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিচ্ছেন।

মুসলিম লীগের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের কথা ঘোষণা করবার পরদিনই নেহ্‌রু সীমান্ত প্রদেশ সফরে গেলেন। বড়লাট তাঁকে উপজাতীয় এলাকায় সফর থেকে নিরস্ত করতে চাইলেন। কিন্তু সে বিষয়ে নেহ্‌রুর দৃঢ় সংকল্প দেখে তিনি সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর স্যার ওলাফ ক্যারোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বললেন। উপজাতীয় এলাকা কেন্দ্রীয় সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের অধীন ছিল। জওহরলাল ছিলেন পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তাই উপজাতীয় অঞ্চলে সফরের তাঁর প্রয়োজন ও পূর্ণ অধিকার ছিল। স্যার ওলাফও তিনদিন দিল্লীতে থেকে নেহরুকে উপজাতীয় এলাকায় ভ্রমণ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করলেন। নেহ্‌রু যখন তাতে রাজী হলেন না, তখন তাঁরা অন্য পথ নিলেন।

নেহ্‌রু ১৬ই অক্টোবর বিকালে বিমানযোগে পেশোয়ারে পৌঁছলেন এবং মোটরে ক'রে সীমান্ত প্রদেশের মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ খান্ সাহেবের বাড়িতে গেলেন। সেখানে আবতুল গফর তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন। নেহ্‌রুর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিল মুসলিগ লীগ। এখন সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগের প্রধান নেতা ছিলেন আবতুল কোয়াইয়ুম খান্। তিনি কিছুদিন আগেও কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেসদলের সহকারী নেতা ছিলেন। আবতুল কোয়াইয়ুম খানের নেতৃত্বে সবুজ পোশাক-পরা প্রায় পাঁচ হাজার মুসলিম লীগের স্বেচ্ছাসেবক বল্লম, বর্শা, লাঠি প্রভৃতিতে সজ্জিত হয়ে বিমানঘাঁটি থেকে পথের তুইদিকে সমবেত হয়েছিল এবং কংগ্রেস- ও নেহ্‌রুবিরোধী ধ্বনি দিচ্ছিল। একদল লোক নেহ্‌রুর গাড়িতে চড়াও হ'লে ডাঃ খান্ সাহেব তাঁর রিভলভার বের ক'রে তাদের ভয় দেখালেন এবং তারা সরে গেল। এই নেহ্‌রুবিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য আবতুল গফর প্রধানতঃ সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর ও পলিটিক্যাল এজেন্টদেরই দায়ী করলেন। এখানে খুদাই খিদমতগাররা নেহ্‌রুজীর সংবর্ধনার ব্যবস্থা করে নি কেন, এই প্রশ্নের জবাবে আবতুল গফর বললেন, নেহরুজী এখানে পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী রূপেই এসেছেন। সুতরাং বড়লাটের যে প্রতিনিধি এখানে আছেন, তাঁরই সংবর্ধনা করবার কথা। ২১শে তারিখের কর্মসূচী সম্পর্কে দায়িত্ব তাঁর। ঐদিন তিনি পেশোয়ারে থেকে নেহ্‌রুজীকে সরদরিয়াবে নিয়ে যাচ্ছেন। সেখানে পাঠানরা তাঁকে কিভাবে

সংবর্ধনা জানায় তা সকলে গিয়ে দেখতে পারেন। তিনি সীমান্ত প্রদেশের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বললেন, সেখানে জঘন্য একটি দ্বৈত শাসনব্যবস্থা রয়েছে। উপজাতীয় অঞ্চলে বড়লাটের প্রতিনিধিরূপে গভর্নর ও পলিটিক্যাল এজেন্টরা শাসন চালান। এঁদের উপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কোনও কর্তৃত্ব নেই। এঁদের অনুমতি ছাড়া সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ খান্ সাহেবও উপজাতীয় এলাকায় ঢুকতে পারেন না।

উপজাতীয় অঞ্চলকে ভারত সরকারের শাসনাধীন করা সম্পর্কে তাঁর মত চাইলে তিনি বললেন, "আমি অহিংসায় বিশ্বাসী। উপজাতীয়দের জোর করে আমাদের মধ্যে আনা হক, তা আমি আদৌ চাই না। আমি সেটা উপজাতীয়দের ইচ্ছার উপরই সম্পূর্ণ রূপে ছেড়ে দিতে চাই। তারা যদি আমাদের সঙ্গে আসতে চায়, তবে আমরা তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাব, যদি তারা পৃথক থাকতে চায়, তবে সে ক্ষেত্রেও সর্বতোভাবে আমরা তাদের সাহায্য করব। আমরা আমাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছি। আমাদের ভাইরা যেটুকু স্বাধীনতা ভোগ করছে, তা হ্রাস করবার কথা কংগ্রেস কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।"

তবে এতোদিন ইংরেজ সরকার উপজাতীয় অঞ্চল সম্পর্কে যে নীতি অনুসরণ করে এসেছে, তিনি তার আমূল পরিবর্তন চান। তিনি চান, উপজাতীয় অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাসপাতাল, কুটিরশিল্প, শিক্ষাকেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপন করা হক। তাতে পাঁচ বছরের মধ্যেই বিরাট ফল পাওয়া যাবে। বোমা যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, প্রেম সেখানে সফল হবে। একথা সত্য, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘদিন ধরে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছে, তা নিরাময় হতে, উপজাতীয়দের মন থেকে সন্দেহ সংশয় ভুল ধারণা প্রভৃতি দূর করতে, সময় লাগবে। তাঁর এই অহিংস পন্থায় তিনি গভীরভাবে বিশ্বাসী। তিনি বলেন, যেখানে পশুশক্তি তাদের অমানুষ করে তুলতে চেষ্টা করেছে, সেখানে তিনি অর্থনৈতিক উন্নতি ও সেবার দ্বারা তাদের জয় করতে চান। এই পরিবর্তনকালে তাদের ওপর বোমাবর্ষণের প্রয়োজন হবে কিনা প্রশ্ন করা হলে আবদুল গফর বললেন, "ইংরেজরা উপজাতীয়দের ভয়ংকর করে চিত্রিত করেছে। তাদের সঙ্গে মিশলেই বুঝতে পারবেন, কতো ভালো মানুষ তারা। তখন আপনারা আর বোমাবর্ষণের মতো হিংস্র ব্যবস্থার কথা ভাবতেও পারবেন না।" জিন্না অন্তর্বর্তী সরকার সম্পর্কে নেহরুজীর সঙ্গে আপোস না ক'রে বড়লাটের সঙ্গে কেন করলেন, সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, "আমি সম্প্রতি শাবকাদরে বলেছিলাম যে,

কংগ্রেস সরকারের মিলিত কাজকর্ম বড়লাটের কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। আমার সেকথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে দেখছি। তাই বড়লাট নিশ্চয় মনে মনে ভাবছিলেন, 'এই অবস্থায় কে আমাকে বাঁচাতে পারে?' এবং তাঁর পুরাতন বন্ধু লীগপন্থীদের দিকে তাকিয়েছিলেন। কী দুঃখের বিষয় যে, জিন্না তাঁর ভাইদের সঙ্গে আপোস না ক'রে বড়লাটের সঙ্গে করলেন!" অন্তর্বর্তী সরকারে একটি মাত্র আসনের জন্যে এতো মানুষের জীবন ও ধনসম্পত্তি যে বিনষ্ট হ'লো, সেজন্যেও আবদুল গফর অত্যন্ত বেদনা প্রকাশ করলেন।

১৭ই অক্টোবর জওহরলাল ডাঃ খান্ সাহেব, আবদুল গফর খান্ ও পররাষ্ট্র দপ্তরের সচিব মিঃ ক্রেইটনকে সঙ্গে নিয়ে বিমানযোগে উত্তর ওয়াজিরিস্থানের মিরনশাহ্‌তে গেলেন। আবদুল গফরকে এই সর্বপ্রথম ওয়াজিরিস্থানে প্রবেশ করতে দেওয়া হ'লো। আবদুল গফর বললেন, এটি তাঁর জীবনের সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত। উপজাতীয় এলাকাতেও পলিটিক্যাল এজেন্ট ও মুসলিম লীগের চেষ্টায় জওহরলালের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হ'লো। জওহরলাল ও তাঁর সঙ্গীরা মিরনশাহ্ থেকে বিমানে ক'রে টাঙ্কে গেলেন। সেখান থেকে তাঁরা পেশোয়ারে ফিরলেন এবং পেশোয়ার থেকে খাইবার অঞ্চলে গেলেন। এখানে কিছুসংখ্যক আফ্রিদি রাস্তার ধারে বসে ছিল, তারা জুতো ছুঁড়লো, গাড়িতে পাথর মারলো। পলিটিক্যাল এজেন্টের সঙ্গের রক্ষীরা গুলী চালালে তারা পালিয়ে গেল। পরদিন তাঁরা মালাকান্দ অঞ্চলে গেলেন। মালাকান্দে সফরের বর্ণনা দিয়েছেন আবদুল গফর:

> আমরা জানলাম যে, পলিটিক্যাল এজেন্ট শেখ মেহবুব আলি অত্যন্ত বিপজ্জনক ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি। সে গেছে পেশোয়ারে গভর্নরের সঙ্গে পরামর্শ করতে। এই কথাটা মনে রেখে আমি পণ্ডিত নেহ্‌রুকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি মালাকন্দ পরিদর্শনে যেতে চান কিনা। তিনি বললেন, তিনি সফরসূচী অনুসরণ করেই চলবেন। সৈনিকরা ওয়াজিরিস্থান পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিল। কিন্তু খাইবার এজেন্সিতে আমাদের সঙ্গে ছিল পুলিস। আমি ডাঃ খান্ সাহেবকে বললাম, সৈনিকরা যেন মালাকান্দ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকে। তিনি যদি তা করতে না পারেন, তবে আমি তা খুদাই খিদমতগারদের মাধ্যমে করব। আমি তাঁকে বললাম, তিনি যেন কিছুতেই পুলিস পাহারার ব্যবস্থায় রাজী না হন। ডাঃ খান্ সাহেব বললেন, তিনি সেখানে

সৈনিকদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।···আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই মালাকান্দে পৌঁছলাম। কিন্তু সেখানে আমাদের অভ্যর্থনার জন্ত কেউ ছিল না। আমরা কেল্লার ভিতরে বসে চা খাচ্ছিলাম, এমন সময় বাইরে হল্লা শুনলাম। জানতে পারলাম যে, শেখের লোকেরা নির্দিষ্ট সময়েই এসেছে, তবে আমরা নির্ধারিত সময়ের আগে আসায় একটু দেরি ক'রে ফেলেছে। এই এজেন্সিতে আমাদের খুদাই খিদমতগাররাও ছিল। তাদের নেতা রহত খান্ রাত্রে এসে আমাদের সতর্ক করে দিয়ে গেল যে, শেখ অনেক গুণ্ডা জড়ো করেছে, আমরা যেন দরকার মতো সতর্ক থাকি। আমরা মালাকান্দে রাতটা কাটালাম। শেখ আগাগোড়া ডাঃ খান্ সাহেবকে চাটুবাক্য শোনাচ্ছিল। ডাঃ খান্ সাহেব চাটুবাক্যের প্রলোভন এড়াতে পারতেন না। আমরা সকালে রওনা হ'তে যাচ্ছি, এমন সময় একজন খুদাই খিদমতগার এসে সতর্ক ক'রে দিয়ে বললো যে, আমাদের বিপদে ফেলবার উদ্দেশ্যে অনেক লোক রাস্তায় জড়ো হয়েছে, আমরা যেন সাবধান থাকি। আমি ডাঃ খান্ সাহেবকে নিরিবিলিতে ডেকে খবরটা দিলাম। শেখ দূর থেকে আমাদের লক্ষ্য করছিল, সে ডাঃ খান্ সাহেবের কাছে এলো। আমি ডাঃ খান্ সাহেবকে যা বলেছিলাম, তা তিনি শেখকে বললেন। শেখ বললো, 'আপনি কি আমার কাছে বাবার মতো নয়? আমি কি পাঠান নই? আমি আপনাদের ঠকাবার মতো বেইমান হব?' ডাঃ খান্ সাহেব শেখের কথায় বিশ্বাস ক'রে এমন কি পুলিস পাহারার অপেক্ষা না ক'রেই রওনা হলেন। তাঁর সামনে চললো শেখ এবং আমরা সকলে তাঁর পেছনে। কেল্লার গেটে কয়েকজন ইংরেজ জওহরলালকে বিদায় জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছিল। শেখ হঠাৎ কখন সরে পড়লো। আমরা কেল্লার বাইরে এসে ইংরেজদের থেকে কিছু দূরে আসতেই অপেক্ষমাণ জনতা আমাদের দিকে পাথর ছুঁড়তে লাগলো। তারা একটা ট্রাক দাঁড় করিয়ে রাস্তা অবরোধ করেছিল। একটা পাথর এসে আমার পিঠে লাগতে আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো। গাড়ির সামনের আসনে একজন জমাদার বসে ছিল, সে মাথা নুইয়ে নিয়ে আঘাত এড়ালো। ডাঃ খান্ সাহেব জমাদারের পিস্তল ছিনিয়ে নিয়ে জনতার উদ্দেশে তাক ক'রে বললেন, "ভাগো! নইলে আমি গুলী চালাব।" জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে

পালালো। ডাঃ খান্ সাহেব ঐভাবেই ট্রাক-ড্রাইভারকে রাস্তা ছাড়তে বললেন, সেও গাড়ি নিয়ে পালালো। এইভাবে আমরা রক্ষা পেলাম। ইংরেজদের চোখের সামনেই গেটের কাছে আমাদের উপর আক্রমণ হয়েছিল, তারা আমাদের রক্ষা করবার জন্যে কোনও চেষ্টাই করে নি। আমাদের দলে ছিলেন প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রকের কর্তা যাঁর ওপর এই সমগ্র উপজাতীয় অঞ্চলের ভার। আমরা সকলেই আহত হয়েছিলাম, আমাদের গাড়ির শার্সি ভেঙে গিয়েছিল।

উপজাতীয় অঞ্চলের অনেক জায়গাতেই পলিটিক্যাল এজেন্ট ও তাঁদের নিয়োজিত গুণ্ডারা এইভাবে পণ্ডিত নেহ্‌রু, আবদুল গফর ও ডাঃ খান্ সাহেবের মতো ব্যক্তিদের প্রতি হামলা করতেও কুণ্ঠিত হ'লো না। পরদিন তাঁরা খুদাই খিদমতগার আন্দোলনের সদর কার্যালয় সরদরিয়াবে এসে পৌছলেন। ২১শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে প্রায় পঁচিশ হাজার লোকের এক জনসভায় নেহ্‌রুজীকে সংবর্ধনা জানানো হলো। খুদাই খিদমতগারদের পক্ষ থেকে তাঁকে মানপত্র দেওয়া হলো। তিনি তার উত্তরে দীর্ঘ ভাষণ দিলেন। আবদুল গফর তাঁর সামাপ্তিক ভাষণে বললেন :

> এই অনুষ্ঠানে আমার কিছু বলবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আমি তোমাদের একটু সতর্ক করে দিতে চাই। পাখতুনরা সাদা কথা বলতেই অভ্যস্ত। আমি খোলাখুলি তোমাদের বলব যে, জওহরলাল তাঁর মন খুলে তোমাদের কিছু বলতে পারছেন না। কারণ তিনি সরকারের যে পদে আছেন তার দায়িত্ব তাঁকে সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলা থেকে বিরত করেছে।
>
> ১৯৩১ সালে গান্ধীজীও সীমান্ত প্রদেশে সফরে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন বড়লাট লর্ড উইলিংডন তাঁকে আসতে দেননি। গান্ধীজী তখন জওহরলাল নেহ্‌রু ও সর্দার প্যাটেলকে পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বড়লাট তাও অগ্রাহ্য করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বড়লাটকে জানিয়েছিলেন যে, যাই ঘটুক না কেন, দেবদাস সীমান্ত প্রদেশ সফরে যাবেন। বড়লাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই দেবদাস এখানে এসেছিলেন। সরদরিয়াবের ঐ পুলের উপরেই 'সুসভ্য' সরকার আমাদের হত্যা করবার জন্যে একদল ডাকাত পাঠিয়েছিল। ঈশ্বরের দয়ায় আমরা রক্ষা পেয়েছিলাম। ঈশ্বর যাকে রক্ষা করেন, তাকে কেউ মারতে পারে না।

জওহরলালজী বলেছেন যে, কিছু কিছু লোক তাঁর এখানে আসাতে অসন্তুষ্ট হয়েছে। বড়লাটের মতো গভর্নরও তাঁর আসার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি তাঁদের কথা না রাখায় তাঁকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে তাঁরা এই নোংরা কৌশল অবলম্বন করেছেন। যাদের উপকার ও অগ্রগতির জন্যে তিনি এই সফরে এসেছেন, তারাই তাঁর ওপর পাথর ছুঁড়তে প্ররোচিত হয়েছে। তাদের সম্পর্কে উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই। পাখতুনদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ বাধিয়েই বৃটিশরা তাদের ধ্বংস করতে চায়। মালাকান্দ এজেন্সিতে যা ঘটেছে, তা হলো আমাদের আত্মসন্তুষ্টি ও অসাবধানতার ফল। আমরা বেঁচে গেছি, কারণ বেঁচে থাকাই আমাদের নিয়তি। তারা আমাদের হত্যা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ, তিনি তোমাদের সেবা করবার জন্যে আমাদের বাঁচিয়েছেন। বৃটিশরা আমাদের জন্য একটি জাল বিস্তার করেছিল, আমরা শিশু নই যে, তাদের মতলব বুঝতে পারব না। তারা চায় আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধাতে, আমরা কিন্তু তাদের ফাঁদে পা দেব না। তারা আমাদের পরস্পরকে বিশ্বাস করতে বলছে। বিশ্বাসকে মর্যাদা দেওয়ার এই কি পন্থা? মালাকান্দের পলিটিক্যাল এজেন্ট শেখ মেহ্‌বুব আলি আমাদের সফরের প্রাক্কালে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে পেশোয়ার গেল এবং তার পরে যা ঘটেছে, তা বৃটিশদের পরিপূর্ণ সম্মতিতেই ঘটেছে; বৃটিশরাই এই চক্রান্ত প্রস্তুত করে দিয়েছে। আমরা তাদের এ পর্যন্ত বিশ্বাস করেছিলাম। এখন থেকে আমাদের দৃঢ় একটি নীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা যখন সরদরিয়াবে আমাদের ব্যবস্থা আমরা নিজেরাই করছি, তখন পুলিস ও সৈন্যবাহিনী এসে বলছে, তারা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে চায়। আমি স্পষ্টই তাদের জানিয়ে দিলাম, তাদের সাহায্যে আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা সরল শিশুর মতো নির্বোধ নই যে, অত সহজে আমাদের ঠকানো যাবে। যখন তাদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, তখন তাদের দেখা পাইনি। যখন তাদের রক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছিল, তখন তাদের দেখা যায় নি। আমরা আক্রান্ত হওয়ার পরে তারা ঘটনাস্থলে এসেছিল। আমরা তাদের মতলব বুঝতে পেরেছি, তাদের কৌশল ধরে ফেলেছি।

' আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বৃটিশাররা সিংহাসনচ্যুত হতে চায় না। তারা চায়, আমরা পরস্পর লড়াই করে শক্তিহীন হয়ে পড়ি। আমরা জানি, আমাদের শত্রু কে। আমরা জানি, খুবই সংকটময় সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। আমরা নিদ্রিত অবস্থায় ধরা পড়তে চাই না। আমরা চাই, যে শত্রু আমাদের ধর্ম, আমাদের দেশ ও আমাদের জাতিকে ধ্বংস করতে চায়, তাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকতে।

কলকাতায় মুসলিম লীগ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে' অতর্কিত আক্রমণ করে গোড়ার দিকে সফল হলেও হিন্দুরা সংঘবদ্ধ হওয়ার পর প্রচণ্ড পাল্টা মার খেয়েছিল। তাই মুসলিম লীগ এই মারের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি জেলায়, যেখানে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৮৫জন, সেখানেই হিন্দুদের উপর আঘাতে হানতে চাইলো। যেদিন মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো, সেইদিনই নোয়াখালিতে মুসলমানরা হিন্দুদের হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, নারী হরণ, নারী ধর্ষণ, বলপ্রয়োগে ধর্মান্তরণ ও বিবাহের এক পৈশাচিক তাণ্ডব শুরু করলো। ঐ অঞ্চলে শাসনব্যবস্থা বলে কিছুই রইল না; অনেকক্ষেত্রে প্রশাসন-ব্যবস্থা দুর্বৃত্তদের সাহায্যও করেছিল। হাজার হাজার ভীত সন্ত্রস্ত শরণার্থী পূর্ববঙ্গ থেকে নিরাপদ জেলাগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল, ছড়িয়ে পড়েছিল পশ্চিম বাংলায়, ত্রিপুরায় ও বিহারে। এই পৈশাচিক ঘটনার সংবাদে সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিল এবং বিহারে হিন্দুরা সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর কঠিন প্রত্যাঘাত হানলো। বিহারে মুসলমানদের উপর আক্রমণের সংবাদে সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলার মুসলমানরা সেখানকার হিন্দু ও শিখদের উপর প্রতিশোধ নিলো। সমগ্র উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে ছেয়ে গেল।

নোয়াখালিতে পৈশাচিক তাণ্ডবের সংবাদ শুনবার পর থেকেই গান্ধীজী এই অবস্থায় তাঁর করণীয় কি, সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন এবং ২৮শে অক্টোবর তিনি জীবনপণ করে নোয়াখালিতে শান্তিস্থাপনের জন্যে রওনা হলেন। নোয়াখালির পথে গান্ধীজী কলকাতায় পৌঁছলে শান্তিস্থাপনের প্রচেষ্টাকে কার্যকর করবার জন্যে অন্তর্বর্তী সরকারের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দলভুক্ত মন্ত্রীরা—নেহরু, প্যাটেল, লিয়াকত আলি খান্, আবদুর রব নিশ্তার

কলকাতায় এলেন। তাঁরা কলকাতায় আসবার পরই বিহারের দুঃসংবাদ এসে পৌছলো এবং তাঁরা দ্রুত কলকাতা থেকে পাটনা রওনা হয়ে গেলেন। ৬ই নভেম্বর গান্ধীজী বিহারবাসীদের উদ্দেশে এক আবেদনে বললেন, "বিহারে এই জঘন্য আচরণ যদি চলতে থাকে, তবে ভারতের সকল হিন্দুকেই বিশ্ববাসী নিন্দা করবে।" ৫ই নভেম্বর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষণা করলেন যে, যদি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিহারে দাঙ্গা না থামে, তবে গান্ধীজী আমৃত্যু অনশনের সংকল্প করেছেন। বিহারে শান্তিস্থাপনের জন্য সকল ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে সংবাদ পেয়ে গান্ধীজী নোয়াখালি রওনা হলেন এবং নোয়াখালিতে তাঁর বিখ্যাত শান্তি-সফর শুরু করলেন। আবদুল গফর সীমান্ত প্রদেশে শান্তিস্থাপনের জন্যে গান্ধীজীর মতোই সর্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করলেন।

১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর দিল্লীতে সংবিধান-সভার অধিবেশন শুরু হলো। জিন্না নির্দেশ দিলেন যে, কোনও মুসলিম লীগ প্রতিনিধি সংবিধান-সভায় যোগ দেবেন না। কারণ সংবিধান-সভায় ২৯৬ জন সদস্যের মধ্যে কংগ্রেসের প্রতিনিধি ছিলেন ২১১ জন। আবদুল গফর খান্ ও মওলানা আজাদ সীমান্ত প্রদেশ থেকে সংবিধান-সভার প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁরা সংবিধান-সভায় যোগ দিলেন। সংবিধান-সভায় রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সীমান্ত প্রদেশের পক্ষ থেকে রাজেন্দ্রপ্রসাদকে অভিনন্দন জানিয়ে আবদুল গফর একটি ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন :

> এই সভাগৃহে আমার মুসলিম লীগের ভাইদের অনুপস্থিতিতে আমি গভীর বেদনা বোধ করছি। আমি দুঃখের সঙ্গেই বলছি, আমার এইসব মুসলিম ভাইয়েরা সীমান্ত প্রদেশের মানুষের প্রতি, বিশেষতঃ আমার প্রতি, অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। তাঁরা বলেন, আমি তাঁদের সঙ্গে নেই। অনেকবার ট্রেনে ভ্রমণের সময় আমি এই ধরনের কথা শুনেছি। আমি তাঁদের বলি, আমি সর্বদাই মুসলমানদের সঙ্গে আছি, এক মুহূর্তের জন্যও আমি তাঁদের থেকে নিজেকে পৃথক করিনি। তবে, আমি মুসলিম লীগের সঙ্গে নেই। মুসলিম লীগ একটি রাজনৈতিক দল, কারও ওর সঙ্গে থাকতে হবে, এমন কোনও প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকের নিজমত পোষণ করবার স্বাধীনতা আছে। প্রত্যেকেরই তা করবার অধিকার আছে, যা সে দেশের ও জাতির মঙ্গলের জন্যে করা উচিত বলে সততার সঙ্গে বিশ্বাস করে। আমি কংগ্রেসের সঙ্গে কেন

আছি, তা জিজ্ঞাসা করবার কারও অধিকার নেই। আমি স্বীকার করি, আপনাদের তুলনায় শিক্ষায় ও সম্পদে সীমান্ত প্রদেশের মানুষরা অনেক পেছিয়ে আছে।...কিন্তু আমি বলতে পারি, সীমান্ত প্রদেশের মানুষরা আপনাদের চেয়ে অনেক বিষয়ে পিছিয়ে নেই।

গান্ধীজী দুমাস কাল দিল্লীতে অনুপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারে সংকট দেখা দিয়েছিল। মুসলিম লীগ সরকারে যোগ দিলেও কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা না করে পদে পদে তার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করছিল। কেবল তাই নয়, তারা সংবিধান-সভায় যোগ না দেওয়ায় তারা মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনাকেও অগ্রাহ্য করছিল। মুসলিম লীগ যাতে সংবিধান-সভায় যোগ দিতে পারে, সেজন্য সংবিধান-সভার লক্ষ্য সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণের পরই সংবিধান-সভাকে মুলতবি রাখা হয়েছিল। একই শ্রেণীভুক্ত প্রদেশসমূহের জোট-বাঁধা আবশ্যিক বা ঐচ্ছিক, এই প্রশ্ন নিয়ে মন্ত্রী-মিশনের সঙ্গে কংগ্রেসের যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল, তারও কোনও সমাধান হচ্ছিল না। এই অবস্থায় গান্ধীজীর পরামর্শ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছে অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছিল। তাই নেহরু ও কৃপালনী গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে নোয়াখালি এলেন। নেহরুজী গান্ধীজীকে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের জন্যে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু গান্ধীজী নোয়াখালিতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত অন্য কোথাও যেতে রাজী হলেন না।

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে করাচীতে মুসলিম লীগের যে অধিবেশন হলো, তাতে মুসলিম লীগ সংবিধান-সভায় যোগ দেবে না বলে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে পার্লামেণ্টে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এটলী ঘোষণা করলেন যে, বৃটিশ সরকার ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই দায়িত্বশীল ভারতবাসীগণের হস্তে ভারতবর্ষের শাসনভার অর্পণে কৃতসংকল্প। তিনি আরও ঘোষণা করলেন যে, ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে বৃটিশ সরকার পার্লামেণ্টের কাছে এই সুপারিশ করেছিলেন যে, ভারতের সংবিধান-সভা যে সংবিধান প্রণয়ন করবে, তা যেন পার্লামেণ্ট অনুমোদন করেন। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে যদি মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনানুযায়ী "পরিপূর্ণরূপে প্রতিনিধিত্বশীল সংবিধান-সভা" কর্তৃক কোন সংবিধান রচিত না হয়, তবে বৃটিশ সরকার ভেবে দেখবেন, বৃটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাবলী কাকে হস্তান্তরিত করা হবে—বৃটিশ ভারতের কোনও কেন্দ্রীয় সরকারকে বা কোনও কোনও অঞ্চলে

প্রতিষ্ঠিত প্রাদেশিক সরকারকে—ভারতীয় জনগণের স্বার্থে যেমনটি যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হবে, তা-ই করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী এটলী বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের কার্যকালের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন এবং তাঁর স্থলে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতের বড়লাট হবেন ঘোষণা করলেন। এটলীর ঘোষণায় বৃটেনের ভারত ত্যাগের সংকল্প থাকলেও ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করবার ও পাকিস্তানের সম্ভাবনা স্বীকৃতি পেলো। গান্ধীজী নেহরুকে লিখলেন: সেইসব প্রদেশ বা অংশ যেগুলি চাইবে, তারা পাকিস্তান পেতে পারবে। কাউকে বলপ্রয়োগে কিছু করানো যাবে না। কংগ্রেস প্রদেশগুলি যদি বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়, তবে তারা যা চাইছে, তা পেতে সমর্থ হবে। নেহরু গান্ধীজীকে লিখলেন, মিঃ এটলীর বিবৃতিতে অনেক কিছুই আছে যা অস্পষ্ট, তা থেকে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। ...তবে এতে আমাদের বহুঘোষিত 'ভারত ছাড়' দাবি স্বীকৃতি পেয়েছে।

গান্ধীজী ৫ই মার্চ তারিখে পাটনায় এসে পৌছলেন। এই সময় আবদুল গফর বিহারের দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে পাটনায় তাঁর দুজন কর্মীকে রেখে গিয়েছিলেন। তাঁরা গান্ধীজীকে জানালেন যে, আবদুল গফর জানিয়েছেন, বিহার মন্ত্রিসভা সবকিছু সাহায্য করতে প্রস্তুত ; কিন্তু আবদুল গফরের ধারণা, সরকারী কর্মচারীরা এই বিরাট সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না। জনসাধারণই এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, এজন্য একটি কমিটি গঠন করা উচিত, তবে ঐ কমিটিকে অরাজনৈতিক হতে হবে। গান্ধীজী আবদুল গফরের সঙ্গে একমত হলেন এবং তাঁকে পাটনায় গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে তার পাঠালেন।

আবদুল গফর এই সময় বিহারের গ্রামাঞ্চলে ঘুরছিলেন, তিনি বিহারের জনসাধারণকে বারবার বললেন, "ভারতবর্ষকে আজ আমার কাছে নরক মনে হচ্ছে, আমরাই আমাদের গৃহে আগুন দিচ্ছি দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আমি দেখছি, আজ সারা ভারতে এক অন্ধকারের রাজত্ব চলছে, আমি আলোর সন্ধানে চারিদিকে তাকাচ্ছি, কিন্তু কোথাও আলোর একটি রেখাও দেখতে পাচ্ছি না।...ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের একটি জাতি। অনেক প্রদেশ আছে যেখানে হিন্দুরা সংখ্যার দিক থেকে নগণ্য। আবার অনেক প্রদেশে মুসলমানদের অবস্থাও তাই। নোয়াখালি ও বিহারে যা ঘটেছে, তা যদি

অন্যত্রও ঘটতে থাকে, তবে এ জাতির ধ্বংস নিশ্চিত। প্রাদেশিক সরকারগুলি সংখ্যাগুরুদের গোলযোগ সৃষ্টি থেকে বিরত করবার মতো যথেষ্ট শক্তি দেখাতে পারেননি। আমি কি মুসলিম লীগকে স্মরণ করিয়ে দেব যে, ইসলাম দুনিয়ার মধ্যে সর্বাধিক পরমতসহিষ্ণু ধর্ম। আমরা যদি সত্যই মুসলিম হই, তবে আমাদের ভাইদের মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতা প্রচারের জন্য আমাদের সর্বাধিক সচেষ্ট হতে হবে। এখন অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি তুলনায় অনেক বেশি পরমতসহিষ্ণু। প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্যে আমাদের এই ত্রুটি সংশোধন করে নিতে হবে।"

১২ই মার্চ গান্ধীজী আবদুল গফরকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামগুলিতে সফরে গেলেন এবং সন্ধ্যায় পাটনায় ফিরে এলেন। গাড়িতে যাওয়ার সময় গান্ধীজী ক্লান্তদেহে যখন বিশ্রাম নিতেন, তখন তিনি নাতনী মানু গান্ধীর কোলে তাঁর মাথা রাখতেন এবং পা দুটি আবদুল গফর কোলে তুলে নিয়ে টিপে দিতেন। আবদুল গফরের কাছে গান্ধীজী ছিলেন ভারতীয় গুরুদের মতোই পিতৃতুল্য। তাঁর সেবার সামান্য সুযোগেও আবদুল গফর অত্যন্ত আনন্দ পেতেন। ঐদিন গান্ধীজী উপাসনাসভায় বললেন, বাংলা ও বিহারে যা ঘটেছে বা পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে যা ঘটছে, তার চেয়ে বড় উন্মত্ততা আর কি হতে পারে? আমরা কি আমাদের মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে পরস্পরকে আঘাতের বিনিময়ে আঘাত হানব, এবং এইভাবে আমাদের দাসত্বকে চিরস্থায়ী করব, মাতৃভূমিকে টুকরো টুকরো করে ফেলব? তাই হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতি সর্বত্রই তাঁর পরামর্শ হলো, যেখানেই জুলুম আসবে সেখানেই যেন তারা শান্তভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে তার প্রতিরোধ করে। হিংসাত্মক প্রতিরোধের চেয়ে তাতে অনেক বেশী সাহসের প্রয়োজন। গান্ধীজী এই প্রসঙ্গে আবদুল গফরের অহিংসার নীতিকে গ্রহণের ইতিহাস বললেন, "পুরুষানুক্রমে আঘাতের বিনিময়ে আঘাত দেওয়া ও রক্তের বদলে রক্ত নেওয়াই ছিল পাঠানজাতির চিরাচরিত রীতি। আবদুল গফর দেখলেন, এই বদলাই দাসত্বকে চিরস্থায়ী করছে। তিনি যখন অহিংস নীতি গ্রহণ করলেন, তখন দেখলেন পাঠানজাতির মধ্যে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন এসেছে। এর অর্থ এই নয় যে, সমস্ত পাঠানেরই এই রূপান্তর ঘটেছে।"

এই উন্মত্ততার দিনগুলি সম্পর্কে আবদুল গফর নিজেই বলেছেন:

> কলকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম-দিবস ঘোষণার ফল হলো সারা ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কলকাতার দাঙ্গায় কিছুসংখ্যক হিন্দু নিহত হয়েছিল, কিন্তু হিন্দু ও শিখরা মুসলিম লীগের অনুসৃত পদ্ধতিতে যখন

বদলা নিলো, তখন মুসলমানরা অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশার সম্মুখীন হলো, অপূরণীয় ক্ষতি হলো জীবন ও সম্পত্তির। মুসলিম লীগ আগুন জ্বালিয়ে রাখবার চেষ্টায় কলকাতার প্রতিশোধ নেওয়ার অজুহাতে নোয়াখালিতে নরক সৃষ্টি করলো। এই পৈশাচিক ঘটনাগুলিতে মানুষের মাথা লজ্জায় হেঁট হয়। (হিন্দুরাও বৃটিশের "বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন কর" নীতির জালে জড়িয়ে পড়লো, তারাও অনুরূপ ভাবে নোয়াখালির বদলা নেওয়ার অজুহাতে বিহারে নিরপরাধ মুসলমানদের উপর বর্বর আক্রমণ চালালো। ক্ষমতাহস্তান্তরের সময়ে অন্যায় পদ্ধতিতে মুসলিম লীগের ক্ষমতা অধিকারের ও দেশকে বিভক্ত করবার ইচ্ছা পূর্ণ হলো।) তারা দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আগুন জ্বালালো, রক্তপাতে ও লুণ্ঠনে তাদের হস্ত কলঙ্কিত করলো। বৃটিশ অমলাতন্ত্র লীগের এই বর্বর অভিযানে উল্লসিত হলো; তারা ভারতীয়দের পরস্পরের রক্তপিপাসু পশুরূপে চিত্রিত করলো, বললো, মনুষ্যোচিত সভ্য আচরণে এরা অসমর্থ। তারা শ্রমিক সরকারকে বোঝাতে চাইলো যে, বৃটিশদের ভারতশাসন চালিয়ে যাওয়া উচিত, অন্যথায় ভারতবাসীরা ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তাদের পৃষ্ঠপোষকদের সাহায্য পেয়ে মুসলিম লীগ দেশে অরাজকতা সৃষ্টির জন্য এই অবস্থার সুযোগ নিয়েছে।

পাটনা জেলায় মুসলমানদের যে সর্বনাশ হয়েছে, তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। বিহারের বহু স্থানে মুসলমানদের গৃহগুলি লুণ্ঠিত হয়েছে, দগ্ধ হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে। বহু জীবন নষ্ট হয়েছে, দেড় লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়েছে, বহু গ্রাম বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত হয়েছে। দু-চারজন দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামবাসী যারা রয়ে গেছে, তারা শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। তাতেও মুসলিম লীগ মন্ত্রীদের সন্তুষ্টি নেই, এই ক্ষতিকে তারা তাদের লাভে পরিণত করতে চাইছে। তারা দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের বাংলাদেশে চলে যেতে বলছে। আমি তাদের নিজ নিজ গৃহে পুনর্বাসিত করতে চেয়েছিলাম। মুসলিম লীগের নেতারা ব্যারিস্টার ইউনুস সাহেবের রাজোপম অট্টালিকায় রয়েছেন, এবং সকলেই নিদ্রায় ও ভোজে ব্যস্ত আছেন। আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা করলাম, বললাম, মুসলিম ভাইয়েরা চূড়ান্ত দুঃখভোগ করেছে, তাদের এই দুঃখদুর্দশা থেকে

উদ্ধারের কাজে আমি তাঁদের সাহায্য চাই। বললাম, "আপনারা যদি সত্যিই তাদের বাংলাদেশে পুনর্বাসন করতে চান, তাতে আমি বাধা দেব না। কিন্তু আপনারা যদি তাদের আপনাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করতে চান, তবে নিশ্চয় তা অন্যায় হবে। তারা আগেই অনেক দুঃখ ভোগ করেছে, আল্লার দোহাই, তাদের দুঃখ আর বাড়াবেন না।" তাঁদের কোনও দরদ ও সহানুভূতি ছিল না। তাঁরা লোকগুলিকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিলেন। বর্ষা শুরু হওয়ার আগে তাদের নিজ নিজ গ্রামে নিজ নিজ গৃহে তাদের পুনর্বাসিত করবার যে চেষ্টা আমি করছিলাম, তা তাঁরা ব্যর্থ ক'রে দিলেন। লীগপন্থীরা এতে বাধা দিলেন, কারণ তাঁরা গঠন করতে চাইছিলেন না, চাইছিলেন ধ্বংস করতে। যারা রয়ে গিয়েছিল, তাদের তুলনায় যারা চ'লে গেল তারা অনেক বেশী দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হ'লো। অনেকে রাস্তায় মারা গেল, অনেকে বাংলাদেশে গিয়ে মরলো। তখন তাদের সুবুদ্ধি হ'লো এবং পাটনায় ফিরে এলো। তারা বুঝলো, মুসলিম লীগপন্থীদের ভালো কিছু করবার না আছে ক্ষমতা, না আছে ইচ্ছা। তারা কেবল এইসব মানুষকে তাদের দাবার ঘুঁটিরূপে ব্যবহার করছে।

দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানরা চাইছিল কেউ তাদের সঙ্গে করে তাদের কুটিরগুলিতে নিয়ে যাক, যেখানে তারা মুল্যবান্ দ্রব্যাদি লুকিয়ে রেখে এসেছে। কিন্তু ভীরু মুসলিম লীগপন্থীরা কেউ পাটনা শহর ছেড়ে বেরুতে সাহস করলো না। আমি একাই গ্রামবাসীদের সঙ্গে যেতাম। কেউ তাদের কোনও লাঞ্ছনা করে নি। অনেক দুঃখ-দুর্দশা সইবার পর লোকেরা আমার কাছে এসে বিহার সরকারকে তাদের নিজ নিজ গ্রামে পুনর্বাসিত করবার ও তাদের গৃহগুলি নির্মাণ ক'রে দেওয়াব জন্যে ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করতে বললো। আমার কথায় বিহার সরকার দ্রুত তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলেন। বর্ষা এসে যাচ্ছিল, তাই আমি মনে করলাম, বিহারে গান্ধীজীর উপস্থিতি খুবই কার্যকর হবে। আমার পত্র পেয়ে তিনি এলেন এবং নিপীড়িত উপদ্রুত অঞ্চলগুলি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তিনি তাদের সাহস দিলেন, দিলেন শক্তি ও সান্ত্বনা।

এবার এলো পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের পালা। ঐ সময় আমি

বিহারে মুসলমানদের মধ্যে ত্রাণকার্যে ব্যস্ত ছিলাম। সীমান্তের আইন-সভার অধিবেশন তখন চলছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মুলতান, লাহোর, অমৃতসর, আম্বালা, রাওলপিণ্ডি, গুজরনওয়ালা এবং পাঞ্জাবের অন্যান্য স্থানে শুরু হলো এবং দ্রুত তা পেশোয়ারে পৌঁছলো। মুসলিম লীগপন্থীরা ডাঃ খান্ সাহেবকে গালাগালি দিল, আক্রমণ করলো, তাঁর পদত্যাগের জন্য আন্দোলন চালালো। পেশোয়ার শহরে অলিগলিতে ও বাজারে নিরপরাধ মানুষদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো। যোগাযোগ-ব্যবস্থা নষ্ট ক'রে বাইরের জগৎ থেকে শহরকে বিচ্ছিন্ন করা হ'লো। ডাঃ খান্ সাহেবের মন্ত্রিসভাকে অপসারিত করবার জন্যে মুসলিম লীগপন্থীরা প্রচণ্ড অভিযান শুরু করলো। এইসব গোলযোগের সময় খুদাই খিদমতগাররা আমার আশানুরূপ কাজ করেছিল; তাদের শপথ অনুসরণ ক'রে দশ হাজার খুদাই খিদমতগার বিপন্ন হিন্দু ও শিখ ভাইদের সাহায্য করতে, তাদের ধন প্রাণ রক্ষা করতে ছুটে এলো। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে তাদের এই প্রতিবাদ সীমান্ত প্রদেশে গভর্নরের শাসন চালু করবার দাবি আনলো।

সীমান্ত প্রদেশকে মুসলিম লীগ হিংসার উন্মত্ততা দিয়ে কবলিত করতে চেয়েছিল। এজন্যে অন্যান্য প্রদেশ থেকে তারা লোক এনেছিল। তারা বিহারে মুসলিমদের উপর আক্রমণের চিত্রকে নানাভাবে তুলে ধরে মুসলমানদের উত্তেজিত করছিল। তারা মাথার খুলি, নরদেহের টুকরো, কোরানের বিক্ষিপ্ত ছিন্নপত্র প্রভৃতির ফটো বিলি করছিল। সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলাতেই উত্তেজনা সর্বাধিক বিস্তার লাভ করেছিল। পূর্বেও সেখানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়েছিল। এই অঞ্চলে পাঠানদের সংখ্যা অল্প হওয়ায় খুদাই খিদমতগার আন্দোলন তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তাই হাজারা জেলাতে মুসলিম লীগের প্রভাব বেশ প্রবল ছিল। হাজারা জেলায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পর্কে সর্দার প্যাটেল গান্ধীজীকে জানিয়েছিলেন যে, হাজারা জেলায় ন লক্ষ মুসলমানের ও মাত্র একত্রিশ হাজার হিন্দু ও শিখের বাস। এই একত্রিশ হাজারের মধ্যে বিশ হাজার আগেই পালিয়েছে। মরেছে চল্লিশ পঞ্চাশ জন। ব্যাপকভাবে অগ্নিসংযোগ ও লুঠপাট হয়েছে। সীমান্ত প্রদেশ বিহারের বদলা নিয়েছে।...ডাঃ খান্ সাহেব খুবই অসুবিধায় পড়েছেন।

১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে একজন শিখকে দাঙ্গাকারীরা হত্যা করে

তাঁর স্ত্রীকে অপহরণ করে ও একজন মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে দেয়। ডাঃ খান্ সাহেব এই স্ত্রীলোকটিকে তার আত্মীয়ের কাছে ফেরত দিতে আদেশ দেন। এই আদেশের প্রতিবাদে মুসলিম লীগ একটি মিছিল বার করে। ডাঃ খান্ সাহেব শান্তিরক্ষার জন্যে শোভাযাত্রাদির উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন, আবদুল কোয়াইয়ুম খান্ তা ভঙ্গ ক'রে গ্রেফতার হলে মুসলিম লীগ ডাঃ খান্ সাহেবের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে "ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার রক্ষার" দাবিতে অভিযান শুরু করে। ফলে কিছুসংখ্যক মুসলিম লীগ-কর্মী গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ হয়। এখন মুসলিম লীগ প্রশাসন-ব্যবস্থাকে বানচাল করবার জন্যে সরকারী অফিস আদালতে পিকেটিং শুরু করে, রেলরাস্তার পাতগুলি তুলে ফেলে, রেলপথে উচ্ছৃঙ্খল জনতা অবরোধ সৃষ্টি করে। ঐ সময় রাওলপিণ্ডিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধলে তা পেশোয়ার শহরেও ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম লীগপন্থীরা গ্রামাঞ্চলে হিন্দু ও শিখদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে। পেশোয়ারের অমুসলমান অধিবাসীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দশদিন দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে নিজ নিজ গৃহে আটক থাকে। ঐ সময় বাজেট অধিবেশন চলছিল। সীমান্ত মন্ত্রিসভা মনে করছিলেন, এই সময়ে কোনও কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করলে যে হাঙ্গামা সৃষ্টি হবে, তাতে গভর্নর আইনসভা ভেঙে দিয়ে বাজেট পাসে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারেন। তাই তাঁরা বাজেট পাস হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করলেন। বাজেট পাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা খুদাই খিদমতগার বাহিনীকে ডেকে পাঠালেন এবং পরদিন দশ হাজার খুদাই খিদমতগার পেশোয়ারে শান্তিস্থাপনে সাহায্য করলো। তার পরেই এলো ডেরা ইসমাইল খাঁর পালা। সেখানে একটি উন্মত্ত জনতা অমুসলমানদের বহু দোকানপাট লুঠপাট ও ও ধ্বংস করলো, হত্যাকাণ্ড ও অগ্নিসংযোগ চললো। গোলযোগ শহর থেকে গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়লো। অনেক গ্রামে অমুসলমান অধিবাসীদের সকলকে হত্যা, নয় ধর্মান্তরিত করা হ'লো। ডাঃ খান্ সাহেবের মন্ত্রিসভা ও খুদাই খিদমতগার বাহিনী এই অবস্থার সঙ্গে প্রাণপণে যুঝতে লাগলেন।

পাঞ্জাবে অবস্থা আরও ভয়ংকর আকার ধারণ করলো। তা বিহারকেও ছাড়িয়ে গেল। সৈন্যবাহিনী শান্তিস্থাপনের জন্য নিযুক্ত হলো। পাঞ্জাবের পূর্বাংশে ছিল হিন্দু ও শিখদের সংখ্যাধিক্য, পশ্চিমাংশে ছিল মুসলমানদের। পশ্চিমাংশের মুসলমানরা হিন্দু ও শিখদের উপর আক্রমণ করায় হিন্দু ও শিখরা যেমন পূর্ব পাঞ্জাবে লাখে লাখে পালিয়ে এলো, তেমনি পূর্ব পাঞ্জাবে হিন্দু ও

শিখ্‌রা বদলা নেওয়ায় মুসলমানরা লাখে লাখে পশ্চিম পাঞ্জাবে পালাতে লাগলো। এই অবস্থায় কংগ্রেস পাঞ্জাবকে মুসলিমপ্রধান ও অমুসলিমপ্রধান—দুই ভাগে বিভক্ত করবার প্রস্তাব গ্রহণ করেলো। গান্ধীজী বিহারে ছিলেন। তিনি এই প্রস্তাবের কথা জেনে বিস্মিত হলেন। এই ধরনের বিভাগ যে ভারতবিভাগকে মেনে নেওয়ার প্রথম পদক্ষেপ মাত্র, সে বিষয়ে কোনও সংশয় ছিল না। নেহ্‌রুজী গান্ধীজীকে বললেন, জিন্না যে বিভাগ দাবী করছেন, এ তারই জবাব মাত্র।

১৯৪৭ সালের ২২শে মার্চ লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন। তিনি ভারতে এসেই গান্ধীজীকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করলেন। গান্ধীজী ও আবদুল গফর দিল্লীতে পৌছলেন ৩১শে মার্চ। ৩১শে মার্চ গান্ধীজী লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ২রা এপ্রিল তাঁদের মধ্যে যে সাক্ষাৎকার হ'লো সেই সময় আবদুল গফরও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আলোচনার ফলাফল বিশেষ কিছুই হ'লো না। কেবল লর্ড মাউণ্টব্যাটনের চেষ্টায় গান্ধীজী ও জিন্নার মিলিত স্বাক্ষরযুক্ত একটি আবেদন সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচারিত হ'লো।

গান্ধীজী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলাপ করে বোঝাতে চাইলেন যে, তিনি বৃটিশের অধীনে কোনপ্রকার দেশবিভাগের বিরোধী। পাঞ্জাব ও বাংলাকে মুসলিমপ্রধান ও অমুসলিমপ্রধান ভাগে বিভক্ত করার দাবির বিরুদ্ধেও তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন। আবদুল গফর তাঁর সঙ্গে একমত হলেও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা তা মানলেন না। গান্ধীজী বড়লাটকে জানিয়ে দিলেন, পরবর্তী আলাপ-আলোচনায় আর যেন তাঁকে ডাকা না হয়। তারপর তিনি ১২ই এপ্রিল বিহারে ফিরে এলেন। তিনি বড়লাটকে এই পরামর্শ দিয়ে এলেন যে, তিনি যদি 'আগে শান্তি পরে পাকিস্তান'—এই নীতির উপর জোর না দেন, তবে তিনি মঙ্গলজনক কিছুই করতে পারবেন না।

বড়লাট কিন্তু গান্ধীজীর পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। তিনি ভাবলেন, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে যে রাজনৈতিক বিবাদ আছে, তার মীমাংসা হলেই শান্তি স্থাপিত হবে। তিনি এই মীমাংসার জন্যে মোটামুটি একটি পরিকল্পনা এপ্রিল মাসের মধ্যেই রচনা করলেন এবং সে বিষয়ে মতামত জানবার জন্যে গভর্নরদের একটি সভা ডাকলেন। তাঁর পরিকল্পনায় বলা হ'লো: যদি ভারতীয় দলগুলি সম্মত হয় তবে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করা হবে; প্রদেশগুলির নিজ নিজ

ভাগ্যনির্ধারণের সাধারণতঃ স্বাধীনতা থাকবে; বাংলা ও পাঞ্জাবকে বিভক্ত করা হবে; আসামের শ্রীহট্ট জেলা মুসলিমপ্রধান হওয়ায় তা ইচ্ছা করলে বিভক্ত বাংলার মুসলিমপ্রধান অংশের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে; সীমান্ত প্রদেশ বিভক্ত ভারতের কোন্ অংশের সঙ্গে যুক্ত হবে, তা নির্ধারণের জন্য সাধারণ নির্বাচন হবে।

এই পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনার জন্যে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মিলিত হলেন এবং গান্ধীজীকে তাঁরা বৈঠকে যোগদানের জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। ১লা মে গান্ধীজী পাটনা থেকে আবার দিল্লী গেলেন। গান্ধীজী এ বিষয়ে ভাঙ্গি-পল্লীতে তাঁর বাসভবনে নেহরুর সঙ্গে একঘণ্টারও বেশী সময় আলাপ করলেন। বৃটিশের কাছে তিনি কোনও সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য দেশ-বিভাগে সম্মত হতে কংগ্রেসকে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, কংগ্রেসের উচিত ক্ষমতাহস্তান্তরের পূর্বে কঠোরহস্তে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্যে ইংরেজ সরকারের কাছে দাবি করা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে যে দল সহযোগিতা না করবে তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে রাজী না হওয়া। বৃটিশ যদি তাতে অস্বীকৃত হয়, তবে ভারতীয় দলগুলিকে নিজেদেরই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের এই পরামর্শ মনঃপূত হলো না। কলকাতা, দিল্লী, লাহোর, কানপুর, অমৃতসর, বান্নু, ডেরা ইসমাইল খাঁ, সর্বত্র থেকে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার ভয়াবহ সংবাদ আসছিল এবং দেশ গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন, এমন একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তাই তাঁরা মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনাকে গ্রহণের পক্ষেই সম্মতি প্রকাশ করলেন। গান্ধীজী বললেন, পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধনপ্রাণ রক্ষিত হবে, জিন্নার এই স্তোকবাক্য বিশ্বাসের কোনও কারণ নেই। দেশবিভাগের দ্বারা শান্তি-শৃঙ্খলা কখনই ফিরে আসবে না। বৃটিশের উচিত কে দোষী তা ঘোষণা করা। তা ঘোষণা করতে তারা অনিচ্ছুক; তাতেই বোঝা যাচ্ছে, তাদের সততা নেই। কংগ্রেস যদি দেশবিভাগ গ্রহণ করে, তবে দেশ কেবল খণ্ডিত হবে না, তাতে বিবাদ-বিসংবাদ বৃদ্ধি পাবে এবং বহু জটিল সমস্যার সৃষ্টি করবে। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেন না। ১লা মে সন্ধ্যায় ওয়ার্কিং কমিটির যে বৈঠক বসলো, তাতে নেতৃবৃন্দের অনুরোধে গান্ধীজী উপস্থিত থাকলেও কোনও আগ্রহ দেখালেন না, আলোচনাতেও অংশ নিলেন না। মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা গৃহীত হলো।

এই পরিস্থিতিতে আবদুল গফর অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। তিনি এবং খুদাই খিদমতগাররা কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের ভাগ্য জড়িত করেছিলেন, কিন্তু আজ কংগ্রেস তাঁদের পরিত্যাগ করছে। বৃটিশের সঙ্গে পাঠানরা পৃথক চুক্তি করে নিলে তাঁরা আরও অনেক সুযোগ-সুবিধা পেতেন। কিন্তু সারা দেশের জন্যেই তাঁরা সে পথ গ্রহণ করেন নি। আজ কিন্তু কংগ্রেস তাঁদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। পাকিস্তানেও তাঁদের কোন স্থান হবে না। কারণ, মুসলিম লীগের সঙ্গে তাঁদের মতাদর্শের আসমান জমিন ফারাক। তিনি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গেই বললেন, "আমাদের এখানেও স্থান নেই, পাকিস্তানেও স্থান নেই, আমরা দুয়ের কাছেই অস্পৃশ্য হয়ে রইলাম। তবে যতোক্ষণ গান্ধীজী আছেন, আমি ততক্ষণ কিছুতে ভয় করি না।"

আবদুল গফর অসুস্থ ছিলেন। তাঁর মন এমন ভেঙে গিয়েছিল যে, তিনি ঔষধ খেতেও রাজী হলেন না। গান্ধীজী যেদিন দিল্লী ত্যাগ করবেন, তার আগের দিন তাঁর প্রবল জ্বর হলো। এই অসুস্থ অবস্থায় আগের রাত্রির মতোই তিনি গান্ধীজীর গা টিপে দিতে চাইলেন। গান্ধীজী তাঁকে বাধা দিলে তিনি বললেন, "আজ শেষ দিন। আমায় করতে দিন্; এতে আমি ভালো বোধ করবো।"

আবদুল গফর অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমুলেন না; সকলেই তাঁকে বিশ্রাম নিতে বললেন। তিনি বললেন, "শীঘ্রই আমরা হিন্দুস্থানে পরদেশী হয়ে যাবো। আমাদের এই দীর্ঘ সংগ্রামের শেষ হবে পাকিস্তানের পদানত হয়ে। বাপু থেকে, ভারত থেকে, সকলের থেকে আমরা দূরে চলে যাব। জানি না, ভবিষ্যতের গর্ভে আমাদের জন্যে কি আছে।" গান্ধীজী মানু গান্ধীর কাছে আবদুল গফরের এই বেদনাময় উক্তির কথা শুনে বললেন, "বাদশা খান্ সত্যিই একজন ফকির। স্বাধীনতা আসবে; কিন্তু বীর পাঠানদের স্বাধীনতা থাকবে না। এক অন্ধকার ভবিষ্যৎ তাদের সামনে।"

৭ই মে গান্ধীজী দিল্লী ত্যাগ করলেন। আবদুল গফর অসুস্থ শরীরেও তাঁকে ট্রেনে তুলে দিতে গেলেন। গান্ধীজী পাখতুনদের এই অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি ভারত বিভাগ এড়াবার জন্যে আবার একবার সচেষ্ট হলেন। ৮ই মে তিনি পাটনার পথে ট্রেন থেকে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে একটি পত্র লিখলেন। তাতে তিনি বললেন, "এর বিরুদ্ধে যাই বলা হক না কেন, বৃটেন যদি কোনপ্রকারে ভারতবিভাগে অংশগ্রহণ করে, তবে সে প্রকাণ্ড ভুল

করবে। যদি ভারতবিভাগ করতেই হয়, তবে তা বৃটিশ চলে যাওয়ার পর বিভিন্ন দলের মধ্যে আপোস-মীমাংসার বা সশস্ত্র সংগ্রামের পথেই হক্। এই অবস্থায় সীমান্ত প্রদেশে বা অন্য কোনও প্রদেশে ভোটগ্রহণ বিপজ্জনক। বাংলা বা পাঞ্জাবের বিভাগও আমি অন্যায় মনে করি। তাও যদি করতেই হয়, তবে বৃটিশ চলে যাওয়ার পর আপোসের দ্বারা তা করতে হবে। আপনারা যদি চলে যাওয়ার সময় দেশকে অরাজকতার মধ্যে ছেড়ে দিয়ে যেতে না চান, তবে দেশের শাসনভার আপনাদের পছন্দমতো কোন একটি পার্টির হাতে দিয়ে যান।

গান্ধীজী সীমান্ত প্রদেশে ভোটগ্রহণের বিরোধী হলেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তার মধ্যে অনর্থক কিছু দেখতে পেলেন না। তাঁরা ভাবলেন, কংগ্রেস ও খুদাই খিদমতগার সংস্থার যে জনপ্রিয়তা ও প্রভাব রয়েছে, তাতে সীমান্ত প্রদেশে ভোটগ্রহণ করলে সীমান্তপ্রদেশবাসীর অধিকাংশই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভোট দেবে। তাই তাঁরা আবদুল গফর খান্‌কে সীমান্ত প্রদেশের ভারতে যোগদানের ক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত থাকতে বললেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা আবদুল গফর যতোখানি জানতেন, তা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ জানতেন না। পূর্ববারে যে নির্বাচন হয়েছিল, তাতে পাঠানরা অখণ্ড ভারতের পক্ষে ও পাকিস্তানের দাবির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। কিন্তু এখন যখন পাকিস্তান অবধারিত হয়ে যাচ্ছে, তখন পাঠানরা হিন্দুস্থানে না পাকিস্তানে যোগ দেবে, এই প্রশ্নে ভোটগ্রহণ হবে। মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি মুসলমানদের আকর্ষণ থাকাই স্বাভাবিক। মুসলিম লীগ নেতারা যে নীতিতে বিশ্বাসী, তা যে কখনও জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের উদ্ভব করতে পারে না, একথা আজই মুসলিমদের বিশ্বাস করানো কঠিন। তাই আবদুল গফর বললেন, তাঁরা এখন পাখতুনিস্থান রূপে পৃথক থাকতে চান। পাখতুনিস্থান এখন ভারত বা পাকিস্তান কোনও রাষ্ট্রে যোগ দেবে না। ঐ দুই রাষ্ট্রের রীতিনীতি ও অবস্থা বিবেচনা করে স্বেচ্ছায় পাখতুনিস্থান জনমতের ভিত্তিতে ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দেবে। আবদুল গফরের এই প্রস্তাবকে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বা অন্য কেউই আমল দিলেন না। তাছাড়া, এই উন্মত্ততার মধ্যে ভোটগ্রহণ কখনই শান্তিপূর্ণ হতে পারে না। মুসলিম লীগ হিংসায় বিশ্বাসী। তারা কেবল অমুসলমানদের প্রতিই হিংসাত্মক আচরণ করেনি, তারা খুদাই খিদমতগারদের প্রতিও আক্রমণ চালাচ্ছিল। খুদাই খিদমতগার সংস্থা অহিংসায় বিশ্বাসী হলেও খুদাই খিদমতগারদের উপর

লীগপন্থীদের হিংস্র আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে আবদুল গফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র গনি "জাল্‌মে পাখতুন" নামে অপর একটি সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন। এই সংস্থা খুদাই খিদমতগারদের সংস্থার মতো অহিংসায় বিশ্বাসী ছিল না। খুদাই খিদমতগারদের মতোই 'জাল্‌মে পাখতুন' সংস্থার সদস্যরা লাল পোশাক পরতো, তবে তারা নিরস্ত্র ছিল না। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল রাইফেল। ভোট-গ্রহণ হলে মুসলিম লীগ যে হিংসার আশ্রয় নেবে এবং জাল্‌মে পাখতুন দল যে তার প্রতিরোধ করবে, তাতে কোনও সংশয় ছিল না। তাই আবদুল গফর বারবার সতর্ক করে দিলেন, যদি এখনই কোনও ভোটগ্রহণ হয়, তবে তাতে পাঠানের রক্তে পাঠানের হাত লাল হবে।

আবদুল গফর জাল্‌মে পাখতুন দলের উদ্ভব সম্পর্কে বলেন :

'জাল্‌মে পাখতুন' যা আমার ছেলে গনি সম্প্রতি সীমান্তে গড়ে তুলেছে, তার সঙ্গে লালকোর্তা আন্দোলনের কোনও সম্পর্ক নেই। এটি সম্পূর্ণ একটি পৃথক্ সংস্থা। আমি এখনও অহিংসায় বিশ্বাস করি ; আমার স্থির বিশ্বাস, সারা দেশের ও সীমান্ত প্রদেশের উচিত হবে অহিংসাকে অবলম্বন করে থাকা। হিংসা ঘৃণা ছড়ায়, অহিংসা ছড়ায় ভালোবাসা।

সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগ যে হিংসাত্মক পথ অনুসরণ করছে, তার প্রত্যক্ষ ফল হলো এই নূতন দলের সৃষ্টি। আমার সাড়ে তিনমাস অনুপস্থিতির সময়ে সীমান্ত প্রদেশের জনসাধারণ মুসলিম লীগের হিংসাত্মক সন্ত্রাসমূলক আন্দোলনের ফলে অত্যন্ত প্ররোচিত হয়েছে। ফলে যারা এ পর্যন্ত অহিংসায় বিশ্বাসী ছিল, তারা হিংসার দিকে চলেছে।

আমি সীমান্ত প্রদেশে ফিরে আমার কর্মীদের একত্র করে তাদের বললাম যে, আমি অহিংসার আদর্শ ত্যাগ করতে পারব না। তবে তাদের মধ্যে কেউ যদি হিংসায় বিশ্বাস করে, তার উচিত হবে, তা প্রকাশ্যে বলা। তাদের অনেকের দৃঢ় অভিমত হলো এই যে, অহিংস ব্যক্তিদের রক্ষার জন্যে একটি সংস্থা থাকা দরকার এবং তাদের ধারণা বর্তমান অবস্থায় এ ধরনের একটি সংস্থা অত্যাবশ্যক। এইভাবেই 'জাল্‌মে পাখতুন' সংস্থার উদ্ভব হয়েছে। এই সংস্থার উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা, আক্রমণ নয়। জাল্‌মে পাখতুনের স্বেচ্ছাসেবকরা হিংসায় বিশ্বাসী। তারা গায় লাল উর্দি পরে, আগ্নেয়াস্ত্র কাছে রাখে।

ঘটনাস্রোত দ্রুত বইতে লাগলো। ১৯৪৭ সালের ১৭ই মে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনা করবেন স্থির করেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বৃটিশ সরকার তাঁর পরিকল্পনার কিছু রদবদল করলেন। সীমান্ত প্রদেশে ভোটগ্রহণের জন্যে ডাঃ খান্ সাহেবের মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার যে প্রস্তাব ছিল তা জানতে পেরে কংগ্রেস তার তীব্র বিরোধিতা করেছিল। লণ্ডনে বৃটিশ সরকার মাউণ্টব্যাটেনের পরিকল্পনার যে রদবদল করলেন, তাতে তাকে তো মেনে নেওয়া হলোই, তাছাড়াও অনেক পরিবর্তন ঘটানো হলো যাতে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ ক্ষুব্ধ হলেন। পরিকল্পনার প্রথম খসড়ায় ছিল, প্রদেশগুলি তাদের নিজ নিজ ভাগ্য নির্ধারণ করবে, কিন্তু এখন সে সুযোগ রদ করা হলো। প্রথম খসড়ায় ছিল সীমান্ত প্রদেশ ইচ্ছা করলে ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে থাকতে পারবে। এখন ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে থাকবার তার অধিকার অস্বীকৃত হলো। বাংলার হিন্দু-মুসলিম মিলিত জনমত যদি স্বাধীন বাংলার দাবি করে, তবে তা পরিকল্পনার প্রথম খসড়ায় স্বীকৃত হয়েছিল। এখন তাও রদ করা হলো। বড়লাটকে আলোচনার জন্যে লণ্ডনে ডেকে পাঠানো হলো। এদিকে জিন্না ঘোষণা করলেন, মুসলিম লীগ বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগ রোধ করবে, তাদের চাই সমগ্র পাঞ্জাব ও বাংলা। কেবল তাই নয়, পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের সঙ্গে সংযোগ রাখার জন্যে চাই ভারতের মধ্য দিয়ে একটি করিডর। বৃটিশ সরকার ও মুসলিম লীগের মনোভাবে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ খুবই বিরক্ত হলেন। তাঁদের অনুরোধে গান্ধীজী আবার দিল্লীতে এলেন। গান্ধীজী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের এই ক্ষুব্ধ বিরক্ত মনোভাবের সুযোগে আবার একবার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও বৃটিশ সরকারকে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের ভারতবিভাগ পরিকল্পনার পরিবর্তে মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনায় ফিরে যেতে পরামর্শ দিলেন। তিনি আবার দাবি করলেন, আগে শান্তি পরে পাকিস্তান।

কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ধারণা যে, ভারতবিভাগ হলেই দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। তা তিনি পরিবর্তন করতে পারলেন না। ৩১শে মে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন দিল্লীতে ফিরে এলেন এবং ২রা জুন তিনি রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনার জন্যে দিন ধার্য করলেন। ৩১শে মে বৈকালে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসবার কথা। ঐদিন প্রাতর্ভ্রমণের সময়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদ গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপ করলেন। (গান্ধীজী দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁকে বললেন, আগে

শান্তি, পরে ভারতবিভাগ।) শান্তিস্থাপনের পূর্বে ভারতবিভাগ বিপজ্জনক হবে। যে অবস্থা ঘটছে, তাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা দেশবিভাগের পরে পাকিস্তানে বাস করতে পারবে না। ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ ঘটবে এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। কিন্তু গান্ধীজী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে স্বমতে আনতে পারলেন না।)

আবদুল গফর গান্ধীজীকে বললেন, "মহাত্মাজী, আপনারা এখন থেকে আমাদের পাকিস্তানী বলেই মনে করবেন। সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্থান একটি ভয়ঙ্কর সংকটে পড়েছে। আমরা জানি না, আমাদের কর্তব্য কি।"

গান্ধীজী বললেন, "অহিংসা নৈরাশ্য জানে না। এখনই হলো আপনার ও খুদাই খিদমতগারদের পরীক্ষার সময়। আপনি বলতে পারেন, পাকিস্তান আপনার কাছে গ্রহণীয় নয়, আপনি সেজন্য চরম অবস্থার জন্যে প্রস্তুত থাকবেন। যারা করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে শপথ নিয়েছে, তাদের ভয় কি? সুযোগ পেলেই আমি সীমান্ত প্রদেশে যাব। (আমি পাসপোর্ট নেব না, কারণ আমি দেশবিভাগে বিশ্বাস করি না। তার ফলে যদি আমায় কেউ হত্যা করে, তাতে আমি মরেও আনন্দ পাব। যদি পাকিস্তান আসে, তবে পাকিস্তানেই আমার স্থান হবে।")

আবদুল গফর বললেন, "বুঝেছি। আমি আর আপনার সময় নষ্ট করবো না।"

২রা জুন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের তাঁর পরিকল্পনার চূড়ান্ত কপি দিলেন এবং পরদিন বেতারে তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে বললেন। ঐদিনই বিকালে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসলো। মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনায় সীমান্ত প্রদেশ পকিস্তানে যোগ দেবে কিনা, এ বিষয়ে ভোট-গ্রহণের যে প্রস্তাব রয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা হলো। আবদুল গফর বললেন, "তিনি সর্বদাই কংগ্রেসকে সমর্থন করে এসেছেন, এখন কংগ্রেস যদি তাঁকে ত্যাগ করে, তবে সীমান্ত প্রদেশবাসীর উপর তার প্রতিক্রিয়া হবে ভয়ঙ্কর; শত্রুরা তাঁকে উপহাস করবে; মিত্ররা বলবে, কংগ্রেসের যতোদিন সীমান্ত প্রদেশের সাহায্য প্রয়োজন ছিল, ততোদিন কংগ্রেস খুদাই খিদমতগারদের সমর্থন করেছে। কংগ্রেস যখন মুসলিম লীগের সঙ্গে আপোস করলো এবং দেশবিভাগ মেনে নিলো, তখন তারা সীমান্ত প্রদেশের নেতাদের সঙ্গে কোনও পরামর্শ করেনি। কংগ্রেস এখন যদি খুদাই খিদমতগারদের নেকড়ের

মুখে ফেলে দেয়, তবে সীমান্ত প্রদেশ এই কাজকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য করবে।"

ওয়ার্কিং কমিটিতে যখন দেশবিভাগ ও সীমান্ত প্রদেশে ভোটগ্রহণের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হলো, তখন আবদুল গফর গান্ধীজী ও ওয়ার্কিং কমিটিকে বললেন, "আমরা পাখতুনরা আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম এবং স্বাধীনতা-লাভের জন্য অশেষ ত্যাগ স্বীকার করেছিলাম। কিন্তু এখন আপনারা আমাদের ত্যাগ করলেন, আমাদের নেকড়ের মুখে ফেলে দিলেন। আমরা ভোটগ্রহণের বিষয়ে কখনও সম্মত হব না। কারণ, আমরা হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের প্রশ্নে নির্বাচনে অংশ নিয়েছি এবং আমাদের সিদ্ধান্ত বিশ্ববাসীকে জানিয়েছি। যদি ভোটগ্রহণ হয়, তবে তা পাকিস্তান, না পাখতুনিস্তান, এই প্রশ্নে হক।"

আবদুল গফর যখন ভগ্নহৃদয়ে বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর দেহ-মন যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল। তিনি অবসন্নভাবে সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ে বললেন, তোবা! তোবা!

মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষিত হলে আবদুল গফর বললেন :

> এটা মুসলিম লীগের জয় হতে পারে, কিন্তু এটা ইসলামের জয় নয়। এখন দুটি সংবিধানসভার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত ডোমিনিয়ম স্টেটাসযুক্ত দুটি ভারত হলো। পাঠানরা একদিনের জন্যেও ডোমিনিয়ন স্টেটাস চায় নি। তারা নিজেদের সংবিধান নিজেরাই গঠন করাকে শ্রেয় মনে করবে এবং ঐ দুই ভারতের যে অংশ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে, তাদের সঙ্গে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হবে। পাঠানরা বিশ্বের সকলের মিত্র হবে, কারও শত্রু হবে না। ভোটগ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু যেদিন সন্ত্রাসমুক্ত ও বাইরের প্রভাবমুক্ত অবস্থায় ভোট গ্রহণ হবে, সেদিন আমি তাকে স্বাগত জানাব। সমস্ত ভারতবর্ষ জানে, সীমান্ত প্রদেশ সম্প্রতি কি দুঃখবেদনার মধ্য দিয়ে কাটিয়েছে। আরও বহু দুঃখবেদনা তাকে অতিক্রম করতে হবে। তাই আমার পরামর্শ হলো, রাজনৈতিক আবহাওয়া দুর্যোগমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সীমান্ত প্রদেশকে বাদ রাখা হক। ভারতের দুটি অংশ যখন শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা ও বৃটিশ কমনওয়েলথ্‌-এ থাকা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে, তখনই এই ভোট গ্রহণ চাওয়া হক।

গান্ধীজী আবদুল গফরের সঙ্গে একমত ছিলেন। যে পরিস্থিতিতে ভোট

গ্রহণ হতে চলেছে, তাতে সরল পাঠানদের ভুল বোঝানো হবে, তাদের বলা হবে, তোমরা হিন্দুদের সঙ্গে থাকবে, না মুসলমানদের সঙ্গে থাকবে? কংগ্রেস হিন্দু সংস্থা নয়, কিন্তু এখন যে বিভ্রান্তি বিরাজ করছে, তাতে সরল পাঠানরা এই পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারবে না। বৃটিশ কর্মচারীদের সাহায্যে মুসলিম লীগ এইভাবে প্রচার চালাচ্ছে। সীমান্তের গভর্নর স্যার ওলাফ ক্যারো মুসলিম লীগের সঙ্গেই হাত মিলিয়েছেন। আবদুল গফর তাই দাবী করেলেন, স্যার ওলাফ ক্যারো যা করছেন, তাতে অবিলম্বে তাঁকে সীমান্ত প্রদেশ থেকে অপসারিত করা হক। গান্ধীজী আবদুল গফরের এই দাবীর কথা নিজে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জানালেন। তিনি সীমান্তে এখন ভোট গ্রহণ যাতে বন্ধ থাকে, সেজন্যও নিজে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে বললেন। কিন্তু সীমান্ত প্রদেশে ভোট গ্রহণ সম্পর্কে কংগ্রেস, লীগ ও লর্ড মাউণ্ট-ব্যাটেনের সঙ্গে একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ও কংগ্রেস ভোট গ্রহণ স্থগিত রাখায় সম্মত হলেও মুসলিম লীগের সম্মতি ছাড়া তা কার্যকর করা সম্ভব ছিল না। তাই আবদুল গফর ভোট গ্রহণের ব্যাপারটি কংগ্রেসের সহকর্মীদের অনুরোধে প্রাদেশিক জিরগায় তুলতে সম্মত হলেন। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এই অভিমত পোষণ করছিলেন যে, পাঠানদের স্বায়ত্ত শাসনকে বাঁচাতে হলে খুদাই খিদমতগারদের ভোট গ্রহণের সংগ্রামে জিততে হবে। জওহরলালও ভোট গ্রহণ সমর্থন করলেন। তিনি বললেন, এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আবদুল গফর খানের ও খুদাই খিদমতগারদের সম্মত না হওয়ার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। কিন্তু আবদুল গফর বললেন, বাংলা ও পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে তাদের আইনসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন। অন্যপক্ষে, সীমান্তপ্রদেশে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা হচ্ছে। এর চেয়ে অন্যায় ও অবিচার কি হতে পারে?

কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ তাতে কর্ণপাত করলেন না। সর্দার প্যাটেল এমন অভিমতও ব্যক্ত করলেন যে, এখন সীমান্ত প্রদেশে পূর্বাপেক্ষা খান্ আবদুল গফর খান্ ও খুদাই খিদমতগারদের প্রভাব হ্রাস পেয়েছে, তাই তাঁরা ভোট গ্রহণে সংগ্রামের সম্মুখীন হতে ভয় পাচ্ছেন। গান্ধীজী লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন জিন্নাকে সীমান্তপ্রদেশে যেতে এবং সীমান্ত প্রদেশের সকল দলের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে সাক্ষাৎ করে তাঁদের

যুক্তি দিয়ে জয় করতে বলেন এবং এইভাবে 'রেফারেণ্ডাম' বা ভোট গ্রহণ এড়াবার ব্যবস্থা করেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন গান্ধীজীর পরামর্শমতো জিন্নাকে এ বিষয়ে বললেন। আবদুল গফরও গান্ধীজীর পরামর্শ মতো জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। জিন্না তাঁর সঙ্গে ভদ্র আচরণ করলেও এতে সম্মত হলেন না। বরং এই সাক্ষাৎকারকে সীমান্ত প্রদেশে খুদাই খিদমতগারদের দুর্বলতার লক্ষণ বলেই প্রচার করলেন।

আবদুল গফর সীমান্ত প্রদেশে ফিরে এলেন এবং ১৯৪৭ সালের ২১শে জুন বান্নুতে সীমান্ত প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি, কংগ্রেস সংসদীয় দল, খুদাই খিদমতগার সংস্থা ও জাল্মে পাখতুন সংস্থার সদস্যদের এক সম্মেলন আহ্বান করলেন। এই সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হলো যে, সমস্ত পাঠানদের নিয়ে একটি স্বাধীন পাঠান রাষ্ট্র গঠিত হক। এই রাষ্ট্রের সংবিধান গণতন্ত্র, সাম্য ও ন্যায়ের ঐসলামিক ধারণার ভিত্তিতে গঠিত হবে।

২৪শে জুন আবদুল গফর একটি বিবৃতিতে ঘোষণা করলেন :

> বৃটিশ শাসনের অবসানের ফলে এখন ভারতবর্ষে যে বিরাট সব পরিবর্তন ঘটছে, তা কেবল সারা ভারতবর্ষকে নয়, সীমান্তপ্রদেশকেও প্রভাবিত করছে। আমি এইসব পরিবর্তন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেছি এবং সহকর্মীদের সঙ্গেও পরামর্শ করেছি।
>
> এক পুরুষেরও বেশি কাল আমরা সীমান্ত প্রদেশে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছি। সংগ্রামকালে আমরা পাঠানরা বহু দুঃখদুর্দশা সহ্য করেছি, কিন্তু সংগ্রাম ত্যাগ করিনি। আমাদের সংগ্রাম ছিল বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এবং এ বিষয়ে আমরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলাম। এই বিরাট প্রতিষ্ঠান আমাদের মতোই বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিল।
>
> এই অবস্থায় স্বভাবতই আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে আবদ্ধ হয়েছিলাম। আমরা যখন সীমান্তপ্রদেশে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়েছিলাম, তখন কংগ্রেসই আমাদের সাহায্য করেছিল। কিন্তু মুসলম লীগের কাছে সাহায্য চেয়েও আমরা পাইনি। বস্তুতপক্ষে আজকের সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম লীগের যারা নেতা, তাদের অনেকেই তাদের আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে বৃটিশকেই সাহায্য করেছিল।

আমাদের সংগ্রাম আগাগোড়া ছিল ভারতের, বিশেষত পাঠানদের, স্বাধীনতার জন্য। আমরা চাই পূর্ণ স্বাধীনতা। আমাদের এই আদর্শ আজও আমরা হারাইনি, এজন্য আমরা কাজও করে যাব।

দুঃখের বিষয়, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী আমাদের সম্মুখে বহু বিরাট অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। ৩রা জুনের ঘোষণায় বলা হয়েছে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে রেফারেণ্ডাম বা ভোটগ্রহণ হবে। তাতে বর্তমান আইনসভার নির্বাচকদের সামনে যে বিকল্পটি থাকবে, সেটি হলো সীমান্তপ্রদেশ ভারতীয় ইউনিয়নের সংবিধান সভায়, না পাকিস্তানের সংবিধানসভায় যোগ দেবে? এতে আমাদের পছন্দকে দুটি বিকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, যে দুটি বিকল্পই আমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই। আমরা এতে ভোট দিতে পারি না, কারণ আমরা ভোট দিতে চাই একটি স্বাধীন পাঠান রাষ্ট্রের জন্যে।

গত কয়েক মাসে সীমান্ত প্রদেশে যা ঘটেছে, তাও আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। লীগপন্থীরা এক হিংসাত্মক অভিযান চালিয়েছে, যার ফলে শত শত নিরপরাধ নরনারী শিশু নিহত হয়েছে। লুণ্ঠন ও অগ্নিকাণ্ডে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে। ফলে সমগ্র আবহাওয়া সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা ও উত্তেজনায় পূর্ণ হয়েছে।

এখনও মুসলিম লীগের বিশিষ্ট নেতারা ভোটগ্রহণে তাদের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া থেকে বিরত করবার জন্যে ভীতি প্রদর্শনের উন্মত্ত অভিযান চালাচ্ছে।

স্পষ্টত যে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী সীমান্ত প্রদেশ থেকে চলে গেছে, তাদের তারা কেবল ভোটদানের সুযোগ থেকে বঞ্চিতই করবে না, যারা এখনও এখানে আছে তারা ভোট দিলে নিজেদের ধ্বংসের কারণ ঘটাবে বলে তাদের ভয় দেখাচ্ছে। গত কয়েক মাসে যে ভয়াবহ অত্যাচার সারা প্রদেশের রূপকে বীভৎস করে তুলেছে, সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। অশিক্ষিত পাঠানদের ধর্মীয় উত্তেজনাকেও তারা এই ভোটগ্রহণকে ইসলাম ও কাফেরদের মধ্যে সংগ্রাম বলে বর্ণনা করে জাগিয়ে তুলেছে।

বর্তমান পরিস্থিতে এবং মূলতঃ যে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে ভোটগ্রহণ হচ্ছে, তা গভীর চক্রান্তের ফল বলেই মনে হয়। কতিপয় সরকারী পদস্থ কর্মচারী ও রাষ্ট্রনীতিবিদ যাঁরা সীমান্তপ্রদেশে লীগের আন্দোলনকে

'শাস্তিপূর্ণ' বলে বর্ণনা করছেন, তাঁদের কার্যকলাপই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করেছে।

রেফারেণ্ডামে আমাদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সমর্থনে ভোট দানের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

বড়লাট বলেছেন, বিভিন্ন দলের মতৈক্যের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, তা তিনি পরিবর্তন করতে পারেন না। আমি কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি, তাঁরা আমাদের এই সুযোগ দিতে সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছুক। অবশ্য, মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে মিঃ জিন্না স্বাধীন পাঠান রাষ্ট্রের ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছেন এবং তিনি এই প্রশ্নে আমাদের ভোটদানের সুযোগ দিতে সম্মত নন। তাই এটা সুস্পষ্ট যে, লীগ এই সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের সুযোগ নিতে চায়।

এ বিষয়ে ও আমার সহকর্মীদের ইচ্ছানুসারে আমি সংশ্লিষ্ট ভিন্ন দলের সঙ্গে আপোস-মীমাংসায় পৌছতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তা সম্ভব হয়নি, কারণ মিঃ জিন্না এতে সম্মত হন নি। সম্ভবতঃ তিনি ভেবেছেন যে, আমাদের দুর্বলতার জন্যেই আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। আমি একজন মুসললান হিসাবে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য রক্ষার উদ্দেশ্যেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। আমি তাঁর সঙ্গে আমাদের দুর্বলতার জন্যে সাক্ষাৎ করিনি। আমাদের আদর্শের শক্তি এবং সীমান্ত প্রদেশের শান্তি ও স্বাধীনতা সম্পর্কে উদগ্র কামনা থেকেই আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পাখতুনদের অধিকাংশই একটি স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের পক্ষপাতী। এই বিষয়ে জনমত কি, তা যাচাই করবার জন্যে আমি রেফারেণ্ডাম বা সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত।

এই অবস্থায় আমাদের করণীয় কি? উপরে উল্লিখিত অসুবিধাগুলির জন্যেই আমরা যে এই ভোটগ্রহণের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করতে পারি না, সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত। খুদাই খিদমতগাররা ও অন্যান্য যাঁরা স্বাধীন পাঠান রাষ্ট্রে বিশ্বাসী, আমি তাঁদের কাছে আবেদন করছি, তাঁরা যেন এই ভোটগ্রহণে অংশগ্রহণ না করেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে দূরে থাকেন।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমরা চুপচাপ বসে থাকব। এক নূতন

সংগ্রাম আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের ১৮ বৎসরব্যাপী সংগ্রামের সফল্যমণ্ডিত সমাপন ঘটবার পর আমরা এখন এক নূতন বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। পাখতুনদের কেবল স্বাধীনতা নয়, তাদের অস্তিত্বও আজ বিপন্ন। যেসব পাঠান তাদের মাতৃভূমিকে ভালোবাসে, আমি তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে এবং তাদের বাঞ্ছিত পক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে সংগ্রাম করতে আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি এই শেষ মুহূর্তেও আশা করি, জিন্না আমার প্রস্তাবের ন্যায্যতা স্বীকার করে পাঠানের বিরুদ্ধে পাঠানকে নিয়োজিত করা থেকে বিরত হবেন।

মুসলিম না কাকের, পাকিস্তান না হিন্দুস্থান—এই সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে আবদুল গফর ভোটগ্রহণে অংশ নিতে সম্মত হলেন না। তিনি চাইলেন, ভোটগ্রহণ যদি একান্তই করতে হয়, তবে তা হ'ক পাকিস্তান না পাখতুনিস্থান, এই প্রশ্নে। তাঁর এই প্রস্তাবে বৃটিশ সরকার বা মুসলিম লীগ, কেউ কর্ণপাত করলো না। ৬ই জুলাই থেকে সীমান্ত প্রদেশে ভোটগ্রহণ শুরু হলো। আবদুল গফর ও খুদাই খিদমতগাররা ভোটদান থেকে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে বিরত রইলেন। ১৬ই জুলাই ভোটগ্রহণ শেষ হলো এবং ২০শে জুলাই ভোটের ফলাফল জানা গেল—পাকিস্থানের পক্ষে ২৮৯২৪৪ ভোট এবং ভারতের পক্ষে ২৮৭৪ ভোট। অর্থাৎ আপাতঃদৃষ্টিতে সীমান্ত প্রদেশের মোট ভোটার-সংখ্যার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছে। ভোট সম্পর্কে আবদুল গফর বললেন, "আমাদের প্রদেশে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ভোটগ্রহণ হলো। খুদাই খিদমতগাররা ক্রুদ্ধ ও হতাশ হয়েছিল; তারা ভোট বর্জন করলো। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী দলে দলে ভোটদাতাদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নিয়ে এলো এবং, এমন কি, মুসলিম লীগের পক্ষে জাল ভোট দেওয়ালো। কর্নেল বশির আমাকে বলেছিলেন, তাঁর অধীন সেনাদল বান্নুর কাছে ছিল; তাদের তিনি তিনবার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পাকিস্তানের পক্ষে জাল ভোট দেওয়ার জন্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত হলো, এমন কি সীমান্ত প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতির নামেও জাল ভোট দেওয়া হয়েছিল।"

তিনি আরও বললেন, "আমরা হিন্দুস্থানে না পাকিস্তানে যোগ দেব, এ প্রশ্ন তোলা অন্যায়। হিন্দুস্থান আগেই আমাদের পরিত্যাগ করেছে এবং শত্রুর

হাতে আমাদের সমর্পণ করেছে। সুতরাং হিন্দুস্থানের ওপর আমাদের নিজেদের চাপিয়ে দিতে পাঠানের আত্মমর্যাদা ও চরিত্রে বাধে। পাকিস্তান সম্পর্কে, আমরা পাকিস্তানে যোগদানের বিরুদ্ধে আমাদের রায় আমরা আগেই জানিয়েছি। সেজন্যেই আমরা দাবী করেছিলাম, যদি ভোট গ্রহণ করতেই হয়, তবে তা পাকিস্তান না পাখতুনিস্থান, এই প্রশ্নে হ'ক। আমাদের দাবী অস্বীকার করে আমাদের ওপর পাকিস্তান না হিন্দুস্থানের প্রশ্ন চাপিয়ে দেওয়া হলো। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের ফলাফল খুদাই খিদমতগারদেরই সুস্পষ্ট অধিকার দিয়েছিল। তাই ইংরেজরা আমাদের শাস্তি দেওয়ার জন্যেই আমাদের প্রদেশের ওপর রেফারেণ্ডাম চাপিয়ে দিলো। অন্যান্য জায়গায় হিন্দুস্থান না পাকিস্তান এ সম্পর্কে ভোট দিতে প্রাদেশিক আইনসভাগুলিকেই বলা হয়েছিল। কিন্তু সীমান্ত প্রদেশের আইনসভার প্রতিনিধিত্বশীলতাকে অস্বীকার করা হলো। ঘৃণায় ও ক্রোধে আমরা আমাদের ক্ষোভ ও অভিযোগ দুনিয়ার সামনে রাখবার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং রেফারেণ্ডাম বর্জন করে প্রতিবাদ জানালাম। সবচেয়ে যা আমাকে দুঃখ দিয়েছে, তা হলো কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আমাদের পাশে দাঁড়ালো না এবং পাখতুনদের নিতান্ত অসহায় অবস্থায় শত্রুর হাতে তুলে দিলো। আসামের ক্ষেত্রে যখন আসামের মুখ্য মন্ত্রী বরদলই মন্ত্রী-মিশনের জোট বাঁধার ধারাটির বিরোধিতা করেছিলেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তখন এরকম ঔদাসীন্য দেখায় নি এবং ঐ ধারাটিকে বাতিল করিয়েছিল। আমি ঐ জোট বাঁধার ধারাটির বিরোধী ছিলাম না। গান্ধীজী আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এর কারণ কি। আমি তখন বলেছিলাম, আমি দেশবিভাগ ছাড়া অন্য যে কোনও পরিকল্পনাকে সমর্থন করতে পারি। কংগ্রেস যে দুর্বলতা দেখিয়েছে, তাতে আমাদের জনসাধারণ অত্যন্ত নিরাশ হয়েছে। আমরা কংগ্রেস ত্যাগ করিনি, কংগ্রেস আমাদের ত্যাগ করেছে। আমরা যদি কংগ্রেসকে ত্যাগ করতে রাজী হতাম, তবে আমাদের সমস্ত দাবীই বৃটিশাররা মেনে নিতে রাজী হয়েছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কংগ্রেস গুরুদাসপুরের ক্ষেত্রে যেরকম দৃঢ়তা দেখিয়েছিল, আমাদের দাবীর প্রতিও যদি তেমনই সমর্থম জানাতো, তবে জিন্না আমাদের পাকিস্তান না পাখতুনিস্থান প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হতো।"

সর্দার প্যাটেল ও মওলানা আজাদ ভোটের ফলাফলকে সীমান্তপ্রদেশে খুদাই খিদমতগারদের প্রভাব হ্রাসের লক্ষণ বলে মনে করলেন। মওলানা আজাদ এমনও বললেন যে, খান্ ভাইয়েরা তাঁদের অতিথিদের দুখানা বিসকুট

দিয়েও অভ্যর্থনা করতেন না এবং কংগ্রেসের তহবিলের যে টাকা তাঁদের হাতে থাকতো, তা-ও তাঁরা কার্পণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। প্রথম অভিযোগ সম্পর্কে আবদুল গফর বললেন, এটা পাঠানদের ঐতিহ্যের ওপর কলঙ্ক আরোপ করা ; কারণ কোনও পাঠান তার একটুকরা রুটিও তার অতিথির সঙ্গে ভাগ করে খায়। দ্বিতীয় অভিযোগ সম্পর্কে বললেন, তহবিলের ঢালাও ব্যয়ের তিনি নীতি ও ব্যবহারিকতার দিক্ থেকে বিরোধী। কারণ, খুদাই খিদমতগার সংস্থার সদস্যসংখ্যা কয়েক লক্ষ। কংগ্রেস যে অর্থই দিক্ না, তা সমুদ্রে শিশিরবিন্দু। তাছাড়া, কংগ্রেসের দানের উপর নির্ভরশীল হলে তারা দুর্বল ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠবে। তাদের সংস্থাকে শক্তিশালী করবার জন্যে যা প্রয়োজন ছিল, তা অর্থ নয়, চরিত্রবল। আবদুল গফর বললেন, "খুদাই খিদমতগার আন্দোলন কেবল রাজনৈতিক নয়, তা রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। খুদাই খিদমতগাররা বাইরে থেকে কখনও অর্থ সাহায্য চায় নি। আমরা কংগ্রেসের কাছ থেকেও কোন অর্থ নিইনি। কংগ্রেস যদি অর্থ দিয়ে থাকে, তবে তা সীমান্তপ্রদেশের কংগ্রেস সংসদীয় বোর্ডকে দিয়েছে। জনসাধারণের অর্থ অকারণে ব্যয় করাকে আমরা ভগবানের কাছে অপরাধ মনে করি। আমাদের আন্দোলনের শক্তি হ্রাস পায় নি. কোনদিন পাবেও না।"

আবদুল গফর ২৭শে জুলাই গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে দিল্লী এলেন। তাঁদের দীর্ঘ আলোচনা হলো। গান্ধীজী ৩০শে জুলাই কাশ্মীর চলে গেলেন। আবদুল গফরও ফিরে এলেন সীমান্ত প্রদেশে। এই তাঁদের শেষ সাক্ষাৎ।

ভারতেও তিনি আর সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর পদার্পণ করেন নি। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সহানুভূতিহীন ব্যবহারে তিনি এতোই মর্মাহত হয়েছিলেন যে, তাঁদের সঙ্গে আর পত্রালাপ পর্যন্ত করেন নি।

১৩.

পাকিস্তানের নাগরিক ও বন্দী : স্বেচ্ছাবৃত নির্বাসন

ভারত স্বাধীনতা পাওয়ার একদিন আগে, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট, পাকিস্তানের উদ্ভব হলো। অখণ্ড ভারতের শতকরা ২৩ ভাগ ভূমি ও শতকরা ১৯ ভাগ অধিবাসী নিয়ে এই নূতন রাষ্ট্র গঠিত হলো। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে পাখতুনদের তেমন উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গেল না। পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হয়েছিলেন মিঃ জিন্না। ১৫ই আগস্ট সরকারী ভবনগুলিতে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উড্ডীন হলো। ঐদিন সীমান্ত-প্রদেশের গভর্নর স্যার জর্জ কানিংহাম ঐদিন আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন। ঐ অনুষ্ঠানে ডাঃ খান্ সাহেব উপস্থিত থাকলেও সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীরূপে তাঁকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণের জন্য বলা হলো না। গভর্নর ডাঃ খান্ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন কিনা। ডাঃ খান্ সাহেব উপস্থিত থাকবেন জানালে, তাঁকে গভর্নর বললেন, অনুষ্ঠানে মুসলিম লীগ জাতীয় রক্ষীবাহিনীর লোকেরা উপস্থিত থাকবে, তাই ডাঃ খান্ সাহেব ও তাঁর সহকর্মীরা উপস্থিত থাকলে তাঁরা নিজ দায়িত্বেই থাকবেন, তাঁদের নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা তিনি করতে পারবেন না। গভর্নরের এই উক্তিতে ডাঃ খান্ সাহেব বুঝলেন, এদের কোনও দুরভিসন্ধি আছে। তাই তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেন না। গভর্নর তাঁকে ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে বললে তাঁরা তাতে সম্মত হলেন না। তখন গভর্নর ডাঃ খান্ সাহেবের মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলেন এবং ২২শে আগস্ট তারিখে আবদুল কোয়াইয়ুম্ খান্ লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করলেন।

৩রা ও ৪ঠা সেপ্টেম্বর সরদরিয়াবে প্রাদেশিক জিরগা, সংসদীয় দল, জাল্মে পাখতুন ও খুদাই খিদমতগার সংস্থার সদস্য ও উপজাতীয় অঞ্চলের প্রতিনিধিদের এক সভা অনুষ্ঠিত হলো। ঐ সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হলো। সেগুলিতে বলা হলো :

খুদাই খিদমতগাররা পাকিস্তানকে তাদের স্বদেশ মনে করে। তারা এই শপথ গ্রহণ করছে যে, পাকিস্তানকে শক্তিশালী করতে ও পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষা করতে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করবে এবং এজন্য সকল ত্যাগ স্বীকার করবে।

ডাঃ খান্ সাহেবের মন্ত্রিসভার পদচ্যুতি ও আবদুল কোয়াইয়ুমের মন্ত্রিসভার প্রতিষ্ঠা অগণতান্ত্রিক। তবে আমাদের দেশ যেহেতু সংকটময় কালের মধ্য দিয়ে চলেছে, সেইহেতু খুদাই খিতমতগাররা এমন কোনও পথ গ্রহণ করবে না যাতে প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও অসুবিধা হতে পারে।

দেশ বিভাগের পর খুদাই খিদমতগার সংস্থা নিখিল ভারত কংগ্রেস সংস্থার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদ করছে এবং সেজন্য ত্রিবর্ণ পতাকার পরিবর্তে দলীয় প্রতীকরূপে লাল পতাকা গ্রহণ করছে।

এই সভায় আবদুল গফর ব্যাখ্যা করে বললেন, তাঁরা যে পাখতুনিস্থান দাবী করছেন, তার অর্থ হলো পাকিস্তানের অংশরূপেই পাখতুনিস্থান থাকবে। তবে তার সকল অভ্যন্তরীণ বিষয় পাখতুনরাই পরিচালনা করবে। এই রাজ্য সীমান্ত প্রদেশের ছয়টি স্থায়ী জেলা এবং সংলগ্ন যেসব পাখতুন অঞ্চল স্বেচ্ছায় পাখতুনিস্থানে যোগ দেবে, তাদের নিয়েই গঠিত হবে। এই রাজ্য প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ সম্পর্কে পাকিস্তানের সঙ্গে চুক্তি করবে। তিনি বললেন, "আমি সমস্ত জীবন পাখতুনিস্থান প্রতিষ্ঠার জন্যে কাজ করে এসেছি। পাখতুনদের একতাবদ্ধ করবার জন্তেই ১৯২৯ সালে খুদাই খিদমতগার সংস্থা গঠিত হয়েছিল। এই নীতিতে আমি আজও বিশ্বাসী। সুতরাং আমার পথ সুস্পষ্ট। আমাকে যদি দুনিয়ায় একাকীও চলতে হয়, তবু এই পথ আমি কখনও পরিত্যাগ করব না।"

আবদুল গফর, ডাঃ খান সাহেব ও খুদাই খিদমতগারদের সম্পর্কে গান্ধীজীর দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। তাঁরা সুস্পষ্টভাবে পাকিস্তানের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ঘোষণার পরেও তাঁদের নানাভাবে লাঞ্ছিত করা হচ্ছিল। নভেম্বর মাসে নানা দুঃসংবাদ তাঁর কাছে এলো। তিনি আবদুল গফর ও ডাঃ খান্ সাহেবের জীবন ও নিরাপত্তা সম্পর্কে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি আবদুল গফরকে লিখে জানালেন, আবদুল গফর যেন পাকিস্তান ছেড়ে চলে আসেন এবং ভারতে থেকেই অহিংসাব্রতে ব্রতী হন। আবদুল গফর উত্তরে

জানালেন, গান্ধীজী যেন তাঁদের জন্য চিন্তা না করেন, তিনি যেন তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের আশীর্বাদ করেন।

এর দুমাস বাদেই গান্ধীজী সাম্প্রদায়িকতার অনলে আত্মাহুতি দিলেন। তিনি ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি একজন হিন্দুর গুলীতেই নিহত হলেন। এই সংবাদ যখন বেতারে প্রচারিত হলো, তখন আবদুল গফর ও তাঁর ছেলে গনি শাহী বাগে আহারে বসেছিলেন। সংবাদ শুনে তাঁদের হাতের গ্রাস খসে পড়লো, তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। খুদাই খিদমতগাররা একটি শোক-সভার আয়োজন করলো। তাতে আবদুল গফর বললেন: "এই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনগুলিতে আমাদের সাহায্য করবার মতো যে আলোকরশ্মিটুকু ছিল, তা-ও নিভে গেল।"

২৩শে ফেব্রুয়ারি থেকে করাচীতে পাকিস্তান সংবিধানসভার অধিবেশন বসলো। তিনি ও খুদাই খিদমতগাররা পাকিস্তানের প্রতি অনুগত নন, এই মর্মে যে প্রচার চলছিল, তা নিবারণের জন্যেই আবদুল গফর করাচী গেলেন এবং পাকিস্তান সংবিধানসভার সদস্যরূপে শপথ গ্রহণ করলেন। ১৯৪৮ সালের ৫ই মার্চ আবদুল গফর যখন পাকিস্তান সংসদে উর্দু ভাষায় ভাষণ দিতে উঠলেন, তখন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বললেন:

> প্রথমতঃ, প্রায়ই এই অভিযোগ করা হয় যে, আমি ও আমার দল পাকিস্তানের শত্রু এবং আমরা পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চাই, পাকিস্তানকে খণ্ডিত করতে চাই। আমি তর্ক করতে চাই না। আমি এ বিষয়ে এই পর্যন্ত বলতে চাই যে, আমি আমার প্রদেশে যখনই বলবার সুযোগ পেয়েছি, তখন এ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করেছি। তবু আমি পাকিস্তানের বন্ধু, না শত্রু, আমি হয়তো পাকিস্তান ধ্বংস করতে চাই, পাকিস্তানের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এমন সংশয় পোষণ করেন। কিন্তু তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন না যে, আমি তাঁদের সংশয় দূর করবার জন্যে প্রায়ই চেষ্টা করেছি। তাঁরা একথাও জানেন যে, আমি আমার প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের কাছে বলবার সুযোগ পেলেই সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছি যে, আমার অভিমত, ভারতবর্ষকে বিভক্ত করা উচিত হবে না, কারণ, আমরা তার ফলাফল আজ প্রত্যক্ষ করছি—হাজার হাজার শিশু বৃদ্ধ তরুণ নরনারী নিহত হয়েছে, ধ্বংস

হয়েছে। কিন্তু এখন যখন দেশ বিভাগ হয়েছে, তখন সে বিষয়ে বিতর্কও মিটে গেছে।...

প্রায় সাত মাস ধরে আমি পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থা দেখছি। কিন্তু এই শাসনব্যবস্থার সঙ্গে বৃটিশের শাসনব্যবস্থার কোনও পার্থক্য দেখছি না। আমার ভুল হতে পারে, এটাই সাধারণ লোকের মত। আপনারা যদি গরীব মানুষদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমার ধারণাই যে সত্য বুঝতে পারবেন। আপনারা তাদের কণ্ঠস্বর বলপ্রয়োগের দ্বারা রুদ্ধ করে রাখতে পারেন। কিন্তু মনে রাখবেন, বল বা শক্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। জুলুম সাময়িকভাবে মাত্র কার্যকর হতে পারে। আপনি যদি বলপ্রয়োগ করেন, তবে লোকে আপনাকে ঘৃণা করবে। সে কথা যাক। আমি আপনাদের বলব যে, বৃটিশ আমলে যে দুর্নীতি ছিল, এখন তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে; বৃটিশ আমলে যে অশান্তি ছিল, এখন তা-ও বৃদ্ধি পেয়েছে।...

আর একটা বিষয় আমি আপনাদের বলতে চাই। আমি পাঠানদের মধ্যে পৃথক একটি জাতীয়তাবোধ ও প্রাদেশিকতা সঞ্চার করছি বলে প্রায়ই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, আপনারাই এই প্রাদেশিকতা সৃষ্টি করেছেন। আমাদের, পাঠানদের, কাছে এইসব জিনিস অজানা। প্রাদেশিকতা কি, আমরা জানি না। পাঠানদের মধ্যে এর অস্তিত্ব নেই। সিন্ধুপ্রদেশের কথা ধরুন। আমরা কি সিন্ধুপ্রদেশে প্রাদেশিকতা সৃষ্টি করেছি? প্রশ্ন হলো, কিভাবে প্রাদেশিকতার সৃষ্টি হয়।

গজনফর আলি খান্ বাধা দিয়ে বললেন: আমরা প্রাদেশিকতায় বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করি পাকিস্থানে।

আবদুল গফুর বললেন: পাঞ্জাবীরা ছাড়া প্রাদেশিকতা আর কে শিক্ষা দেয়? আপনি ইসলামের নামে কিছুদিন মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারেন, কিন্তু তা দীর্ঘদিন করতে পারেন না। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, এইসব কারণ কে সৃষ্টি করছে এবং কেন? প্রকৃতির নিয়ম হলো বিনা কারণে কিছুই ঘটে না। সুতরাং এসব জিনিস বিনা কারণে ঘটে নি।

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান্ বললেন: সেগুলি সৃষ্টি করা হয়েছে।

আবদুল গফর বললেন : এ বিষয়ে আমি বেশি বলতে চাই না, তাতে তিক্ততা সৃষ্টি হবে।...আমাদের প্রধানমন্ত্রী যখন পেশোয়ার গিয়েছিলেন, তখন আমাদের মুসলিম লীগপন্থী ভায়েরাও পাখতুনিস্থানের দাবী রেখেছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, তিনি খাইবার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমস্ত মুসলমানকে একত্র করতে চান। তবে বৃটিশাররা যে-পাঠানদের পৃথক করে রেখেছিল, তাদের যদি আমরা একটি অঞ্চলে ঐক্যবদ্ধ করতে চাই, তাতে আপত্তি কি? তা ইসলামের বিরোধী কিভাবে? আমরা চাই, আপনারা সমস্ত পাঠানদের ঐক্যবদ্ধ করতে আমাদের সাহায্য করুন।

ফিরোজ খান্ নুন মন্তব্য করলেন : আর আপনারা আফগানিস্থানে যোগ দিন!

আবদুল গফর বললেন : আমরা আফগানিস্থানের সঙ্গে নয়, কেবল আপনাদের সঙ্গেই যোগ দিতে পারি। আফগানিস্থানের চেয়ে আপনাদেরই বেশি দাবী আছে আমাদের উপর। যখন আমাদের বাঙ্গালী ভায়েরা খাইবার থেকে দু হাজার মাইল দূরে বাস ক'রেও আমাদের সঙ্গে এক হতে পারে, পাকিস্তানে যোগ দিতে পারে, তবে কেন আমাদের ভাইয়েরা, পাঠানেরা, যাদের ঐক্য বৃটিশদের কাছে বিপদের কারণ হতে পারে ভেবে বৃটিশরা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, তারা আমাদের এতো কাছে থেকেও আমাদের সঙ্গে এক হতে পারে না?

লিয়াকত আলি বললেন : ব্যাপারটা আপনি দয়া করে বিশদ করে বলুন।

আবদুল গফর বললেন : আমাদের পাখতুনিস্থানের অর্থ কি, আমি আপনাদের বলি। এই প্রদেশে যারা বাস করে, তাদের বলা হয় সিন্ধি এবং তাদের দেশের নাম সিন্ধু। ঐভাবেই পাঞ্জাব ও বাংলা পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালীদের বাসভূমি। ঠিক ঐভাবেই আছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ। আমরা একই জাতি, আমাদের বাসভূমি পাকিস্তানের অন্তর্গত। আমরা চাই, কেবল দেশের নাম করলেই লোকে বুঝবে যে, এটা পাখতুনদের বাসভূমি। এটা কি ইসলামের মূলনীতিগুলির বিরোধী?

লিয়াকত আলি বললেন : পাঠান কি দেশের নাম, না সম্প্রদানের নাম?

আবদুল গফর বললেন : সম্প্রদায়ের নাম। সারা দেশের নামকরণ করবো পাখতুনিস্থান। আমি ব্যাখ্যা করে বলতে পারি, ভারতের লোকেরা আমাদের বলে পাঠান, পারস্যের লোকেরা আমাদের বলে আফগান। কিন্তু আমাদের প্রকৃত নাম হলো পাখতুন। আমরা চাই পাখতুনিস্থান, আমরা দেখতে চাই ডুরাণ্ড লাইনের এদিকের সব পাঠান পাখতুনিস্থানে যোগ দিয়েছে ও ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

আপনারা যদি বলেন, এতে পাকিস্তান দুর্বল হয়ে যাবে, তবে আমি বলব, একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অংশের সৃষ্টিতে পাকিস্তান কখনই দুর্বল হতে পারে না।

আর একটি বিষয় হলো, আমাদের মুসলিম লীগে যোগ দিতে বলা হয়। আমার মনে হয়, মুসলিম লীগ তার কর্তব্য করেছে। পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তার কাজ ফুরিয়েছে। এখন আমাদের দেশে বর্তমান অসাম্যগুলিকে দূর করবার জন্যে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলি গড়ে উঠা উচিত। আমাদের মধ্যে যদি কোনও মতবিরোধ থাকে, আমরা তা আলোচনার দ্বারা দূর করব। ইসলাম পরমত-সহিষ্ণুতাই শিক্ষা দেয়। কিভাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায়, আমাদের সে পথ খুঁজে বার করতে হবে।···

আবদুল গফর করাচীতে তিন মাস ছিলেন। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে মিঃ জি. এম. সৈয়দ 'পিপল্‌স্ পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করলেন। অবদুল গফর খান্ পিপল্‌স্ পার্টিতে যোগ দিলেন। লিয়াকত আলি সংসদে পিপল্‌স্ পার্টির সদস্যদের হিন্দু ও বিশ্বাসঘাতক ব'লে গালাগালি করলেন। সংসদে আবদুল গফর তার তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তিনি বললেন, আমরা মুসলমান ; আমরা পাকিস্তানের পতাকার প্রতি আমাদের আনুগত্য জানিয়েছি। কিন্তু যারা নমাজ পর্যন্ত করতে জানে না, তারা আমরা মুসলমান কিনা পাকিস্তানী কিনা এ প্রশ্ন কিভাবে করে ?

করাচীতে থাকা কালে জিন্নার সঙ্গে আবদুল গফরের সাক্ষাৎ হলো। জিন্না তাঁকে বাড়িতে আমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে জিন্না তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন, এতোদিনে আমার পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সার্থক হলো। খাওয়া-দাওয়ার পর জিন্না আবদুল গফরকে একটি নিভৃত কক্ষে নিয়ে গিয়ে বললেন, "আপনি আমাদের সঙ্গে কাজ করছেন না কেন ?" আবদুল গফর

বললেন, "আমাদের কাজ মূলতঃ সামাজিক। বৃটিশ সরকার যখন আমাদের আন্দোলনকে রাজনৈতিক আখ্যা দিয়েছিল, তখন আপনিও তো আমাদের সমর্থনে কেন্দ্রীয় আইনসভায় আমাদের সামাজিক আন্দোলনকারী বলে বর্ণনা করেছিলেন। আমাদের সামাজিক কাজকর্ম করতে না দেওয়াতেই আমরা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। তারপর আবদুল গফর বললেন, "আমাদের কাজ করবার সুযোগই বা কই? সেদিনও তো লিয়াকত আমাদের 'হিন্দু', 'বিশ্বাসঘাতক' প্রভৃতি আখ্যা দিলেন।" জিন্না বললেন, লিয়াকতের এই মন্তব্য অন্যায় এবং অপ্রাসঙ্গিক। এজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন। জিন্না আবদুল গফরের সঙ্গে খুবই হৃদ্য ব্যবহার করলেন, তিনি খুদাই খিদমতগারদের জন্যে দুলাখ চরকারও ফরমাস দিলেন। তিনি আবদুল গফরকে কথা দিলেন, তিনি সীমান্ত প্রদেশে সফরে গেলে খুদাই খিদমতগারদের সঙ্গে মিলিত হবেন।

সংসদের অধিবেশন শেষ হওয়ার আগেই আবদুল গফর সীমান্ত প্রদেশে ফিরলেন এবং তাঁর সহকর্মীদের কাছে জিন্নার সঙ্গে তাঁর আলোচনার বিবরণ দিলেন। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি জিন্না সরকারীভাবে সীমান্ত-প্রদেশ পরিদর্শনে এলেন। আবদুল গফর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মসূচী কি জিন্না জিজ্ঞাসা করলেন। এই প্রশ্নের উত্তরে ১০ই এপ্রিল খুদাই খিদমতগারদের একটি সভা হলো। তাতে যে প্রস্তাব গৃহীত হলো তা আবদুল গফর একটি পত্রাকারে জিন্নার কাছে পাঠালেন। তাতে তিনি জানালেন, "আপনার সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয়েছিল তার বিষয়বস্তু আমি খুদাই খিদমতগারদের সংস্থার প্রতিনিধিদের কাছে রেখেছিলাম। তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, পাকিস্তানকে শক্তিশালী করতে ও পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষা করতে তাঁরা সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করবেন। এবং তাঁরা এ বিষয়েও একমত হয়েছেন যে, সরকারের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, এমন কোনও কাজ তাঁরা করবেন না। তবে বৈধভাবে সমালোচনা করবেন।"

জিন্নার সঙ্গে আবদুল গফরের ক্রমবর্ধমান সৌহার্দ্য স্বার্থান্বেষী লীগপন্থীদের ও সরকারে নিযুক্ত বৃটিশ কর্মচারীদের শঙ্কিত করে তুললো। জিন্না সীমান্ত প্রদেশে এলে মুখ্যমন্ত্রী আবদুল কোয়াইয়ুম, গভর্নর স্যার অ্যামরোজ ডাণ্ডাস ও অন্যান্য পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা সকলেই আবদুল গফর ও খুদাই খিদমতগারদের বিরুদ্ধে জিন্নার কাছে নানা কথা বলতে লাগলেন এবং তাদের

কোনপ্রকার সুযোগ না দিতে পরামর্শ দিলেন। তাঁরা এমনও বললেন যে, খুদাই খিদমতগাররা বিপজ্জনক লোক; তাদের সভায় যাওয়া জিন্নার পক্ষে নিরাপদ নয়, তারা তাঁকে হত্যাও করতে পারে। আবদুল গফর জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কবে তিনি খুদাই খিদমতগারদের সঙ্গে মিলিত হবেন প্রশ্ন করলে জিন্না বললেন, এই ধরনের কোনও বেসরকারী সভায় গেলে অন্যরা তাঁকে আমন্ত্রণ করবে। তাই তিনি খুদাই খিদমতগারদের সভায় যেতে পারবেন না। অথচ এরকম বহু বেসরকারী সভায় তিনি পরে যোগদান করেন। তাঁদের বিরুদ্ধে এরকম চক্রান্তের আভাস পেয়ে আবদুল গফর জিন্নার সংবর্ধনা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভাসমিতিতে যোগ দেওয়া বন্ধ করলেন। রাজভবনে আমন্ত্রিত হয়ে গেলে জিন্নার সঙ্গে আবদুল গফরের আবার দেখা হলো। জিন্না তাঁকে বললেন, তাঁরা তাঁর সংবর্ধনা সভাগুলিতে যাচ্ছেন না; এতে কি তাঁরা তাঁকে বয়কট ও অপমান করছেন না? আবদুল গফর বললেন, তিনি ফকির মানুষ, তিনি ভোজ ও উৎসবে যোগদান করতে ভালোবাসেন না, তাই যান না। জিন্না আবদুল গফরকে বললেন, দেশের স্বার্থে তাঁদের মুসলিম লীগেই যোগ দেওয়া উচিত। আবদুল গফর বললেন, জিন্না কি তাঁদের সেবা চান না? তিনি কি তাঁদের সেবাকার্যে অযোগ্য করে তুলতে চান? জিন্না বললেন, তিনি নিশ্চয় তা চান না। উত্তরে আবদুল গফর বললেন, তবে জিন্নাই খিদমতগার সংস্থার প্রধান কর্তা হন না কেন। ঐ রকম সংস্থার মধ্য দিয়েই তাঁর কাজ করা সম্ভব হবে। জিন্না বললেন, "আমি তো আপনাকে বলেছি, আমি আপনার সঙ্গে আছি। আপনি যা প্রস্তাব করবেন, তাতেও আমি সম্মতি দেব। তবু আপনি কাজ করতে পারবেন না কেন?"

আবদুল গফর বললেন: "মুসলিম লীগারদের সঙ্গে আমি কাজ করতে পারব না।"

জিন্না বললেন, "কেন?"

আবদুল গফর বললেন, "কারণ, তারা স্বার্থান্বেষী, লুটের বখরা নেওয়াই তাদের মতলব।"

—"তার প্রমাণ?"

—"কোটি কোটি টাকার হিন্দুদের সম্পত্তি তারা আত্মসাৎ করেছে। সেগুলি তারা শরিয়তের নির্দেশ অনুযায়ী সর্বসাধারণের তহবিলে জমা দেয়নি।"

—"কিন্তু তাদের সকলেই এই শ্রেণীতে পড়ে না। অনেক ব্যতিক্রম আছে।"

—"আছে; যারা সুযোগ পায় নি।"

এরপর আবদুল কোয়াইয়ুম ও তাঁর চক্র ক্রমাগত জিন্নার মনকে আবদুল গফর ও খুদাই খিদমতগারদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলতে লাগলো। তারা শেষ আঘাত হানলো এক জঘন্য কৌশল করে। জিন্নার একটি সভায় তারা গোলযোগ সৃষ্টির জন্যে কতকগুলি লোক নিয়োগ করলো। এইসব নিযুক্ত গোলযোগকারী উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে চাইলেই বার বার আবদুল কোয়াইয়ুম বললেন, "এই বদমাশ খুদাই খিদমতগার! বদমাশি ছাড়তে পারো না!" জিন্না প্রতারিত হলেন। তিনি মনে করলেন, সত্যই খুদাই খিদমতগাররা তাঁর সভায় গোলযোগ সৃষ্টি করছে। তিনি সীমান্ত প্রদেশ ত্যাগের আগেই খুদাই খিদমতগার-সংস্থাকে ধ্বংস করে ফেলতে আদেশ দিয়ে এলেন।

১৩ই মে আবদুল গফর খুদাই খিদমতগার আন্দোলনকে পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশেও সম্প্রসারিত করবার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন এবং জানালেন যে, খুদাই খিদমতগাররা এখন থেকে পিপল্‌স্ পার্টির স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করবে। কিছুদিন পূর্বে পিপল্‌স্ পার্টি বা জমিয়ত উল্-আওয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই পার্টির লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল চেতনা গড়ে তোলা; পাকিস্তানকে একটি "ইউনিয়ন অব দি সোসিয়্যালিটি রিপাবলিক্‌স্" রূপে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করা; প্রত্যেক অংশকে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারী করা; এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে, বিশেষতঃ ভারতের সঙ্গে, ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করা। সম্প্রতি আবদুল গফর পিপল্‌স্ পার্টি বা জমিয়ত উল্-আওয়ামের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

আবদুল গফর মে মাসের গোড়ার দিকে পাকিস্থান সংবিধানসভার অধিবেশনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। তিনি মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সীমান্ত-প্রদেশে ফিরে এসে তাঁর সহকর্মী কাজী আতাউল্লাহ্ খান্‌কে সঙ্গে নিয়ে সীমান্ত প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সফর করে এই নূতন পার্টির জন্য প্রচার চালালেন। বিক্ষুব্ধ দরিদ্র মানুষরা দলে দলে এই নূতন পার্টির পতাকাতলে এসে সমবেত হতে লাগলো। মুসলিম লীগ ও মুসলিম লীগ সরকার এই নূতন পার্টির সমর্থকদের 'কাফের' ও 'বিভেদপন্থী' আখ্যা দিলো। সীমান্ত প্রদেশ সরকার এই পার্টির দ্রুত প্রভাব বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। তারা আবদুল

গফরকে গ্রেপ্তারের সিদ্ধান্ত নিলো। ১৯৪৮ সালের ১৫ই জুন সকালে কোহাটের কাছে বাহাদুর খেলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো। তাঁর মধ্যম পুত্র ওয়ালি ও অন্য দুজন সহকর্মীও গ্রেপ্তার হলেন। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত আবদুল গফরকে সামান্য একটু খাদ্য, এমন কি এক ফোঁটা জলও দেওয়া হলো না। বান্নু যাওয়ার প্রধান রাস্তার পার্শ্বে বান্দা দাউদ শাহের একটি মাটির বাংলোতে তাঁর সংক্ষিপ্ত বিচারের প্রহসন হলো। আবদুল গফর 'রাজদ্রোহ' ও ইপির ফকিরের সঙ্গে চক্রান্তের অভিযোগে কোহাটের ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। আবদুল গফরকে পশ্চিম পাঞ্জাবের মণ্টগোমারি জেলে পাঠানো হলো। তাঁকে কোনও জিনিসপত্র নিতে বা তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হলো না।

আবদুল গফরের কারাদণ্ডের পরেই খুদাই খিদমতগার কর্মীদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু হলো। আবদুল গফরের নিষেধ সত্ত্বেও সহস্রাধিক খুদাই খিদমতগার বিক্ষোভ প্রদর্শন করে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করলেন। ১৯৪৮ সালের ১২ই আগস্ট এলো চূড়ান্ত আঘাত, যার কাছে জালিয়ানওয়ালা বাগের নৃশংসতাও ম্লান হয়ে গেল। চরসদ্দার কাছে বারবা গ্রামে খুদাই খিদমতগাররা একটি মসজিদের সম্মুখে জুম্মা নমাজে সমবেত হয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাদের সহকর্মীদের মঙ্গলকামনায় উপাসনা করা। বহু স্ত্রীলোকও ঐ মসজিদে উপস্থিত ছিল। তাদের গলায় বাঁধা ছিল ছোট ছোট কোরান। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এসে জনতাকে সতর্ক না করেই গুলী চালাতে শুরু করলো। ফলে বহু লোক নিহত ও অসংখ্য লোক আহত হলো। যারা ভয়ে পালাচ্ছিল তারাও নিষ্কৃতি পেলো না। গুলিতে নিহত হলো। অনেকের বুকে বাঁধা কোরান ভেদ করে বুলেট চলে গেল। মসজিদের প্রাঙ্গণ নিহত ও আহতের রক্তে ভেসে গেল। গুলি চালাবার পরে পুলিস সারা গ্রামে লুটপাট চালালো। এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ সরকারের নির্দেশে সংবাদপত্রগুলি চেপে গেল।

আবদুল গফর এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বলেছেন :

> আমাদের গ্রেফতারের দেড় মাস পরে, তখনও ডাঃ খান্ সাহেব জেলের বাইরে ছিলেন, খুদাই খিদমতগাররা চরসদ্দায় জুম্মা নমাজের জন্যে সমবেত হয়েছিলেন। তাদের যেসব সহকর্মী কারারুদ্ধ হয়েছিল, তাদের শুভকামনায় উপাসনা ও তাদের মুক্তি দাবী করা ছিল তাদের উদ্দেশ্য। যে মসজিদে তাঁরা সমবেত হয়েছিল, সেটি ছিল একটা উঁচু

জায়গায়। সেখানে তাঁরা একজন বৃদ্ধের নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করে যাচ্ছিলেন। আবদুল কোয়াইয়ুম তাঁর ফৌজকে মসজিদে মোতায়েন রেখেছিল। মিছিলটি ঐ উঁচু জায়গার পাদদেশে এসে পৌঁছলে তাদের উপর মেসিনগান থেকে গুলী চালানো হলো। অজস্রধারায় গুলী বর্ষণ চললো, গুলীতে কোরানগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, মেয়েদের মাথার খুলি উড়ে গেল। ফৌজের সেনানায়ক খুদাই খিদমতগাররা মাটিতে শুয়ে পড়তে হুকুম দিলো। খুদাই খিদমতগাররা মাটিতে শুয়ে পড়লে মেসিনগানের গুলীতে তাদের দেহগুলিকে অজস্র ফুটো করে দিলো। যারা এই আক্রমণ সত্ত্বেও জীবিত ছিল, তারা নমাজ পড়তে লাগলো। তাদের বলা হলো, তারা হিন্দু, তাদের নমাজ পড়বার কোনও অধিকার নেই। যে মসজিদে তারা সমবেত হয়েছিল, তার নাম দেওয়া হলো 'হিন্দু মসজিদ'। তাদের উলঙ্গ করে নোংরা নর্দমায় ফেলে দেওয়া হলো, তাদের গোঁফ ও দাড়ির একদিক কামিয়ে দেওয়া হলো, তাদের উপর স্ত্রীলোকদের সামনে নানা অকথ্য ও নির্লজ্জ উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা চালাবার পর তাদের গাধার পিঠে চড়িয়ে শহরে ঘোরানো হলো। এর পরই ডাঃ খান্ সাহেব ও গনি গ্রেফতার হলেন।

এরপর খুদাই খিদমতগারদের খুঁজে খুঁজে বার করা হতে লাগলো। এতে সৈন্যবাহিনীও অংশ নিলো। খুদাই খিদমতগাররা সম্পূর্ণরূপে শান্তিপূর্ণ রইলো। এই অপমান লাঞ্ছনা উৎপীড়ন সত্ত্বেও তারা হিংসার আশ্রয় নিলো না। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি খুদাই খিদমতগার সংস্থা বেআইনী ঘোষিত হলো এবং সরদরিয়াবে আবদুল গফরের সদর কার্যালয় সরকার বাজেয়াপ্ত করলো।

নরপিশাচ আবদুল কোয়াইয়ুম এখানেই ক্ষান্ত হলো না। তার দুর্নীতি ও দুঃশাসন অনেক লীগপন্থীকেও বিচলিত করেছিল। নিজেকে ক্ষমতায় রাখবার জন্যে তার বিরোধী লীগপন্থীদের উপরও সে আক্রমণ শুরু করলো। জিন্না তাকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, "Our ministers are under our searchlight, we will X'ray their activities." কিন্তু জিন্না ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হঠাৎ মারা গেলেন। আবদুল কোয়াইয়ুমের দুঃসাহস ও স্পর্ধা সীমা ছাড়িয়ে গেল।

আবদুল গফর ও খুদাই খিদমতগারদের উপর এই অমানুষিক নির্যাতনের পরে ভারতের সর্বত্র সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হলো। পাঞ্জাব সরকার একটি

বিজ্ঞপ্তিতে জানালো যে, খান্ আবদুল গফর খানের কিছু বন্ধু তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহারের কাল্পনিক কাহিনী প্রচার করছেন। কিন্তু খান্ আবদুল গফর খান্‌কে একটি সুপরিসর ব্যারাকে রাখা হয়েছে। তাতে স্নানাগার ও বিজুলী পাখা, কলের জল, পৃথক রান্নার বন্দোবস্ত প্রভৃতি সকল সুব্যবস্থা আছে। তাঁর জন্যে কয়েদী পাচক ও ভৃত্যরা রয়েছে। ঐসব ভৃত্য ঐ ব্যারাক ও ব্যারাকের উঠোন পরিচ্ছন্ন রাখে। ব্যারাকের উঠোনে বাগান করবার উপযোগী প্রচুর জায়গা আছে। তিনি সেখানে নিজের খুশিমতো বাগান করেছেন। তাঁর অনুরোধমতো কয়েকজন 'খ' শ্রেণীর বন্দীকে হরিপুর জেল থেকে এনে মণ্টগোমারি জেলে তাঁর পাশের কক্ষে রাখা হয়েছে। তিনি নিজে একলা বা সঙ্গীদের সঙ্গে ব্যায়াম করেন। ব্যাটমিণ্টন খেলার সুযোগ-সুবিধা আছে। তাঁকে বিভিন্ন খবরের কাগজ দেওয়া হয়। তিনি সপ্তাহে চারখানা চিঠি লিখতে পান। ..ইত্যাদি। অর্থাৎ আবদুল গফর কারাগারে স্বর্গসুখে আছেন।

কিন্তু পাকিস্তান সরকারের এই বিজ্ঞপ্তি অতিবিশ্বাসীরাও বিশ্বাস করলো না। আবদুল গফর পাকিস্তানের জেলে পচতে লাগলেন।

১৯৫০ সালে সীমান্ত প্রদেশে ও উপজাতীয় অঞ্চলে অসন্তোষ তীব্র হয়ে উঠলো। পাখতুনদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্যে পাকিস্তান বিমান বহর ১৭ই মার্চ থেকে ২২শে অক্টোবর পর্যন্ত কয়েকবার পাখতুন গ্রামগুলির উপর বোমাবর্ষণ করলো। পাখতুনদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমেই বাড়ছিল। ইপির ফকিরের নেতৃত্বে পাখতুনরা তাদের একটি সাময়িক সরকার স্থাপন করলো। আফ্রিদি ও ওয়াজিরি উপজাতিগুলির মতো কতিপয় উপজাতি এই সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করলো। স্বাধীন পাখতুনিস্থানের পতাকা উড্ডীন হলো। সকল পাখতুন সম্প্রদায়, সারা মুসলিম দুনিয়া এবং রাষ্ট্র সংঘের উদ্দেশে স্বাধীন পাখতুনিস্থানের জাতীয় পরিষদ থেকে একটি ঘোষণা প্রচার করা হলো। কাবুল বেতার এই ঘোষণা প্রচার করলো।

এই স্বাধীন পাখতুনিস্থান আন্দোলনের সঙ্গে আবদুল গফরের কোনও সম্পর্ক ছিল না। আবদুল গফর যে পাখতুনিস্থান দাবী করেছিলেন, তাতে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরিকল্পনা ছিল না। একথা বার বার ঘোষণা করা সত্ত্বেও আবদুল গফর দেশদ্রোহী ও ইপির ফকিরের সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত বলে প্রচার করা হতে লাগলো।

আবদুল গফর কারাগারে মারা গেছেন, এই জনরব হঠাৎ ছড়িয়ে পড়লো।

পাকিস্তানে ও পাকিস্তানের বাইরে অগণিত মানুষ অস্থির হয়ে উঠলো। পাকিস্তান সরকার এই জনরব অস্বীকার করে ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলো। মণ্টগোমারির গরম জলবায়ু ও জেলের সেলে নিঃসঙ্গ আবদ্ধতার ফলে আবদুল গফরের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছিল। তিনি কারাগারে অসুস্থ ছিলেন এবং প্লুরিসিতে ভুগছিলেন। তবে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ জনরব হলেও সেরূপ আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক ছিল না। ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে তাঁকে এক্স্-রে করবার জন্য লাহোরে আনা হলো। কারাগারে তাঁর মৃত্যু হলে তা সারা দেশে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করবে, সে সম্পর্কে পাকিস্তান সরকার সচেতন ছিল। তাই পাকিস্তান সরকার আভাসে-ইঙ্গিতে জানতে চাইলো যে, তিনি মুক্তি পেলে মুসলিম লীগ সরকারে যোগ দিতে ইচ্ছুক কিনা। আবদুল গফর বললেন, মুসলিম লীগপন্থীরা সরকারকে তাঁদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার মনে করেন ; অন্যপক্ষে তিনি তাকে সেবার যন্ত্র করেন। তাই তিনি মুসলিম সরকারে যোগ দিতে পারেন না।

১৯৫১ সালের গোড়ার দিকে আবদুল গফরের কারাবাসের মেয়াদ শেষ হলো। কিন্তু তিনি মুক্তি পেলেন না। ১৯১৮ সালের বেঙ্গল রেগুলেসন অনুসারে তাঁকে মণ্টগোমারি জেলেই আটক রাখা হলো।

পাকিস্তান যে হিংসানীতির উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছিল, তার ফল ফলতে লাগলো। স্বার্থান্বেষী দল-নেতারা সকলেই ক্ষমতা অধিকারের জন্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হলো। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলি খান্ আততায়ীর হস্তে নিহত হলেন। খাজা নাজিমুদ্দিন ছিলেন পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেল। তিনি এখন প্রধান মন্ত্রী হলেন এবং তাঁর স্থলে অর্থমন্ত্রী গোলাম মহম্মদ হলেন গভর্নর-জেনারেল।

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অন্তরীণ অবস্থায় আবদুল গফরের সুদীর্ঘ কালের সঙ্গী ও সহকর্মী ও ডাঃ খান্ সাহেব মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী কাজী আতাউল্লাহ্ খান্ লাহোর হাসপাতালে মারা গেলেন। আবদুল গফর সম্পর্কেও স্বভাবত সকলেই চিন্তিত হয়ে উঠলেন। 'পাকিস্তান টাইম্স্' কাগজে এই সময়ে মহম্মদ ইয়াহিয়ার একটি বিবৃতি প্রকাশিত হলো। তিনি আবদুল গফরের সঙ্গে জেল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে মণ্টগোমারি জেলে ১৯৫২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি সাক্ষাৎ করেছিলেন। বিবৃতিতে বলা হলো, প্রায় বিগত তিন মাস আবদুল গফরকে নির্জন কারাকক্ষে আটক রাখা হয়েছে। তাঁর দুজন সঙ্গী ছিলেন

আগে। তাঁদের একজন মণ্টগোমারি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করে পেশোয়ার জেলে রাখা হয়েছে। তাঁর অন্য একজন সঙ্গী সৈয়দ আশিক শাহ্‌কে কাজী আতাউল্লাহ্‌ ও আবদুল গফরের সঙ্গে রাওলপিণ্ডি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু আবদুল গফরকে আবার মণ্টগোমারি জেলে ফিরিয়ে আনা হয় এবং সৈয়দ আশিক শাহ্‌কে কাজীর কাছে রাখা হয়। এইভাবে আবদুল গফর মণ্টগোমারি জেলে নিঃসঙ্গ আছেন। এই সময় তাঁকে নিজেকে রান্না করে খেতে হচ্ছে। প্রায় আট মাস আগে তাঁকে তাঁর দাঁতের চিকিৎসার জন্যে লাহোর নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে তাঁর জন্যে একপাটি নূতন দাঁত তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই নূতন পাটিটি ঠিপ খাপ খায় কিনা দেখার আগেই তাঁকে লাহোর থেকে আনা হয়। দাঁতের পাটিটি খাপ না খাওয়ায় তাঁর মাড়িতে লাগে, ফলে ঐ পাটিটি তাঁকে খুলে রাখতে হয়েছে। এখন বিনা দাঁতেই তাঁকে খাবার খেতে হচ্ছে। রাওলপিণ্ডি ও মণ্টগোমারি জেলে যে সব ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করেছেন, তাঁরা সকলেই তাঁকে জানিয়েছেন যে, তাঁর স্বাস্থ্যের খুবই অবনতি হয়েছে।

১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে লাহোরে মেয়ো হাসপাতালে আবদুল গফরের দেহে অপারেশন করা হলো। তাঁর জীবন সম্পর্কে সকলেই শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহ্‌রু তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে একটি বার্তা পাঠালেন। আফগানিস্থানের প্রধানমন্ত্রীও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বার্তা পাঠালেন। মক্কায় হাজার হাজার তীর্থযাত্রী আবদুল গফরের নিরাময় ও কারা-মুক্তির কামনা করে উপাসনা করলেন। আবদুল গফর ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করলেন। কিন্তু মুক্তি পেলেন না।

১৯৫৩ সালে পাকিস্থানের যোগাযোগ মন্ত্রী সর্দার বাহাদুর খান্‌ জেলে আবদুল গফরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি বললেন, সরকার তাঁকে আর জেলে আটক রাখার পক্ষপাতী নন; তবে তাঁর ও খুদাই খিদমতগারদের উপর যে অন্যায় ও অবিচার হয়েছে তা তাঁরা ক্ষমা করবেন না বলে সরকার ভয় করছেন। আবদুল গফর বললেন, তিনি খুদাই খিদমতগার ও অহিংসার পূজারীরূপে বলতে পারেন যে, কারও বিরুদ্ধে কোনও প্রতিহিংসার মনোভাব তাঁরা হৃদয়ে পোষণ করেন না। তবে সরকার তাঁদের নির্দোষিতা সম্পর্কে যতোদিন স্থিরনিশ্চিত না হচ্ছেন, ততোদিন তাঁদের সম্পর্কে সরকারের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই।

১৯৫৪ সালের ৫ই জানুয়ারি 'রেডিও পাকিস্তান' থেকে পাকিস্তান সরকারের আবদুল গফরকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হলো। করাচী থেকে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হলো যে, মুক্তির পর আবদুল গফর পাঞ্জাবে থাকবেন। যোগাযোগ মন্ত্রী সর্দার বাহাদুর খানের সঙ্গে আবদুল গফর যখন রাওলপিণ্ডি জেল থেকে বাইরে এলেন, তখন জেলের সম্মুখে সমবেত অগণিত মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়লো। তারা 'বাদশা খান্ জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করলো।

আবদুল গফর জেলের বাইরে এলেও কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুক্তি পেলেন না। তাঁকে রাওলপিণ্ডির একটি বাংলোয় অন্তরীণ রাখা হলো। তিনি ৬ই ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়ে বললেন, "আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমার দরদী বন্ধুরা যাঁরা আমাকে পত্র লিখেছেন বা তারবার্তা পাঠিয়েছেন, তাঁদের এইসব সদয় বার্তার উত্তর আমি দিতে পারছি না। জেল থেকেও আমাকে চিঠি লিখতে দেওয়া হতো, কিন্তু এখান থেকে তাও করতে দেওয়া হয় না। তাই সংবাদপত্রের মাধ্যমেই আমি তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি একথাও উল্লেখ করতে চাই যে, আমি এখনও বাংলোর আঙিনার মধ্যেই আটক আছি। রাওলপিণ্ডিতে আমার যেসব বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন আছেন, তাঁদের সঙ্গেও আমাকে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয় না।" তাঁকে সংসদের আসন্ন অধিবেশনে যোগদান করতে দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়েও তিনি সংশয় প্রকাশ করলেন।

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে করাচীতে পাকিস্তান সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হলো। আবদুল গফরকে এই অধিবেশনে যোগ দিতে অনুমতি দেওয়া হলো। ২০শে মার্চ তিনি সংসদে উর্দু ভাষায় ভাষণ দিলেন :

> মাননীয় অধ্যক্ষ, আমি দীর্ঘ ছ বছর অবরুদ্ধ থাকার পর এই সভার সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি এবং তাঁদের সম্মুখে আমার মতামতগুলি রাখছি। আমি বক্তৃতা করতে চাই না। কারণ, আপনারা জানেন, আমি একজন খুদাই খিদমতগার এবং আমার কাজ বক্তৃতা নয়, সেবা। আমি গত ছ বছরে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তার বিবরণ দিতেও চাই না। কিন্তু এখনও পাকিস্থানে অনেক স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি আছেন, যাঁরা আমার বিরোধী, যাঁরা আমাকে কোন প্রকারে অপদস্থ করবার জন্যে ফিকির খুঁজছেন, চেষ্টা করছেন।

আমি তাই আমার সম্পর্কে একরম ভ্রান্ত ধারণাগুলি দূর করবার জন্যে একটি ছোট বক্তৃতা দেব ভাবছি।

মহাশয়, এই সভার মাননীয় সদস্যদের বিরুদ্ধেও আমার একটি অভিযোগ আছে। আপনারা জানেন, আমি এই সভার একজন সদস্য এবং এই সভা একটি সার্বভৌম সংস্থা এবং সেজন্য এর সদস্যদের কতিপয় অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা আছে। আমাকে সীমান্ত অপরাধ আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, অথচ এই আইন নৈতিক অপরাধে অপরাধীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমাকে সদাচরণের জন্যে জামানত দিতে বলা হয়েছিল, আমি তাতে স্বীকৃত হই নি। ফলে আমাকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। তিন বছর পরে আমার মুক্তির সময় এলো। কিন্তু আমাকে চারদিন জুঙ্গায় রাখা হলো। তারপর ১৮১৮ সালের বেঙ্গল রেগুলেশন, যা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি করেছিল, তদনুসারে আমাকে জেলে আটক রাখা হলো। শেষবারের এই আটক থেকে তিন বছর দুমাস বাদে আমাকে বাইরে আসতে দেওয়া হলো। আমার এই দীর্ঘ কারাবাসের সময়ে আপনারা সরকারকে এমন কি এই প্রশ্নটুকুও করেন নি যে, আমি কি অপধাধ করেছিলাম। আপনারা জানেন, এখনও কার্যত আমি বন্দী। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বৃটিশারদের আমলে আমাকে বহুবার জেলে যেতে হয়েছিল। যতোই তাদের সঙ্গে আমাদের বিবাদ চলুক না কেন, জেলে আমাদের প্রতি তাদের ব্যবহার ছিল ভদ্র, বৃটিশ অফিসাররা ছিলেন কিছুটা সহিষ্ণু ও অমায়িক। কিন্তু আমাদের ইসলামিক রাষ্ট্রে যে ব্যবহার আমার প্রতি করা হয়েছে, তা আমি আপনাদের কাছে এমন কি উল্লেখ করতেও পছন্দ করি না। যে জিনিসটা আমাকে সবচেয়ে পীড়া দিয়েছে, তা হলো এই যে, যে সহিষ্ণুতা ও সৌজন্য আমি সেই বিদেশীয় জাতির মধ্যে দেখেছি, তা আমি পাকিস্তানে আমার নিজের ভাইয়েদের মধ্যে, আমার আপনজনদের মধ্যে, দেখছি না।

ছ বছর আগে আমি এই সভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলাম যে, পাকিস্তান আমাদের দেশ, পাকিস্তানের দৃঢ়তা সাধন ও সংরক্ষণ আমাদের কর্তব্য এবং যে কোনও পার্টি পাকিস্থানে প্রগতি ও পুনর্গঠনের জন্যে যে কোনও কর্মসূচী আনবে, তা আমার পরিপূর্ণ সহযোগিতা পাবে। আমার সেই

কথাগুলি এমন কি আজও আমি আবার বলছি। কিন্তু তবু এমন অনেকে আছেন, যাঁরা আমার আনুগত্যে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে আমি বলব যে, যে সংগ্রামের ফলে পাকিস্তানের সৃষ্টি হতে পেরেছে, তাতেই আমি সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছি। আমরা যদি বৃটিশারদের বিতাড়িত না করতাম, তাদের এ দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য না করতাম, তবে পাকিস্থানের উদ্ভব কিভাবে হতো? তাই যে দেশের স্বাধীনতার জন্যে আমরা এতো দুঃখ ভোগ করেছি, এমন কি এতো মানুষে জীবন দিয়েছি, সেই দেশের বিরুদ্ধে আমরা কিভাবে বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে পারি? তাই আমি মনে করি, কেবল আনুগত্য বা দেশদ্রোহের প্রশ্নে নয়, চরসদ্দায় যে হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, নারী শিশু ও বৃদ্ধের লাঞ্ছনা হয়েছিল, জেলে আমাদের প্রতি যে নিপীড়নমূলক ব্যবহার করা হতো, তারও তদন্তের জন্য একটি ট্রাইবুন্যাল গঠন করা যুক্তিযুক্ত ছিল।

আমার বিশ্বাস, পাকিস্তানের দৃঢ়তার জন্যে প্রয়োজন যে, পাকিস্তানের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ পরস্পরকে বিশ্বাস করবে, পরস্পরের অধিকার, স্বার্থ ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে মর্যাদা দেবে। আপনাদের হয়তো মনে থাকতে পারে, ছ বছর আগে আমি এ প্রসঙ্গে বলেছিলাম যে, পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পরে মুসলিম লীগের আর কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। বাংলাদেশে সম্প্রতি যে নির্বাচন হয়েছে, তাতে আমার এই যুক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন হয়েছে। আপনাদের একথাও স্মরণ থাকতে পারে। আমি এই প্রস্তাব করেছিলাম যে, এখন থেকে দলগুলি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তিতে গঠিত হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয়, লোকে আমাদের সন্দেহের চক্ষে দেখতো, আমাদের এই অকপট প্রস্তাবকে অপরাধমূলক মনে করেছিল। এখনও আবার বলছি, সেই মতই আমি আজও পোষণ করি এবং আমি এ বিষয় স্থির মস্তিষ্কে আপনাদের চিন্তা করে দেখতে অনুরোধ করি।

আমি সর্বদাই বিশ্বাস করে এসেছি যে, ইংরেজরা আমাদের, পাখতুনদের, দুর্বল করবার জন্যে আমাদের কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে আমাদের অখণ্ডতা নষ্ট করে দিয়েছে। পাকিস্থানের দৃঢ়তা ও পাকিস্তানের অঙ্গীভূত সকলের মনে পারস্পারিক বিশ্বাস আনবার জন্যে প্রয়োজন, জাতীয়তা ও সংস্কৃতির দিক থেকে অনুরূপ মানুষরা, পাঠানরা, যেসব

অঞ্চলে বাস করছে, সেইসব অঞ্চলকে পাখতুনিস্থান নামে একটি ইউনিটে পরিণত করা। তার দ্বারা ইংরেজরা যে অস্বাভাবিক বিভেদ চাপিয়ে দিয়েছিল, তা দূর করা যাবে। সেইভাবে এই পাকিস্থানের ক্ষুদ্রতর ইউনিটগুলিকে পশ্চিম পাকিস্তানে তিন-চারিটি বৃহত্তর ইউনিটে পরিণত করা উচিত।

লোকে চায়, দেশের ভেতরের ও বাইরের ব্যাপারে আমি আমার মতামত প্রকাশ করি। কিন্তু আমি দীর্ঘ ছ বছর কারাগারে আটক থাকায় এ বিষয়ে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি কার্যত এখনও বন্দী। কারণ, পাঞ্জাব ভিন্ন পাকিস্তানের অন্ত কোথাও আমাকে যেতে দেওয়া হয় না। আমার খুদাই খিদমতগার সংস্থা যার উদ্দেশ্য হলো মানুষের সেবা করা, তা-ও নিষিদ্ধ রয়েছে। আমাদের জাতীয় পত্রিকা 'পাখতুন', তাকে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার দিন থেকে বন্ধ রাখতে বাধ্য করা হয়েছে। আমাদের বহু হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত দ্বিতল শিক্ষা-কেন্দ্রটি, যেখানে সেবাকার্যে খুদাই খিদমত-গারদের শিক্ষা দেওয়া হতো, তা-ও নিশ্চিহ্ন করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তবে কতকগুলি মূলনীতি আছে, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই। আপনারা জানেন, আমি সর্বদাই অহিংসায় বিশ্বাসী। আমি অহিংসাকে প্রেম ও হিংসাকে ঘৃণা মনে করি। আমি সর্বদাই নাগরিক রূপে আইন মেনে চলেছি; আমি তাই চাই, আমাদের স্বদেশ পাকিস্তানও একটি শান্তিপ্রিয় দেশ হবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ ভূমিকাই নেবে। আমি চাই যে, আমরা সর্বদা পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে, সে দেশ যে দলেই থাক না কেন, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করে চলব' এবং আমরা বিশেষভাবে আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখব। সেখানে যদি কোনও বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দেয়, তবে তা আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনা দ্বারা মীমাংসা করে নেব।

আমি সর্বশেষে বলতে চাই, আমি আশা করেছিলাম যে, পাকিস্তানের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করা হবে; কিন্তু দেখছি, আমার সে আশা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। ধনী আরও ধনী হয়েছে। দরিদ্র

হয়েছে দরিদ্রতর। শরণার্থীরা শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে। দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। নিরাপত্তা আইনে, সামরিক আইনে, মানুষকে জেলে আটক রাখা হচ্ছে। ফলে সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যবধান বাড়ছে। সময়মতো এদিকে দৃষ্টি না দিলে ভয়ংকর বিপদ অনিবার্য।

ভারত ও পাকিস্তান একসঙ্গেই স্বাধীনতা পেয়েছিল। ১৯৫০ সালে ভারতে নূতন সংবিধান চালু হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানের সংবিধান রচনার কাজ ১৯৫০ সালে মাত্র শুরু হয়েছিল। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লিয়াকত আলি খান্ সংবিধানের মূলনীতি সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। তাতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদর্শগত প্রকৃতি ও নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব করা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, পাকিস্তান একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হবে। তার গঠন হবে যুক্তরাষ্ট্রীয়; যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত অংশগুলিকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দেওয়া হবে। জিন্না ও লিয়াকত আলি খান্ মনে করতেন, যেহেতু পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র, এর রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।

লিয়াকত আলি খানের এই রিপোর্ট সম্পর্কে মুসলিম লীগের সদস্যদের মধ্যেই তীব্র মতবিরোধ ছিল। বিশেষ করে মুসলিম লীগের পাঞ্জাবী নেতারা, এই ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে তাঁদের বিপদ দেখলেন। মুসলিম লীগপন্থী সংসদ সদস্যদের মধ্যে প্রদেশগুলির আসনসংখ্যা, কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সম্পর্ক ও রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিবাদ চরমে উঠলো। সংবিধানের যে খসড়া রচিত হয়েছিল, তাতে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা সারা পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্থানকে আনুপাতিক আসন দেওয়া হয় নি। তাই পূর্ববঙ্গের বহু মুসলিম লীগ নেতা এই খসড়া সংবিধানের তীব্র সমালোচনা করলেন এবং এই সংবিধান পাঞ্জাবী জমিদার, শিল্পপতি ও ধনপতিদের স্বার্থেই করা হচ্ছে বললেন। রাষ্ট্রভাষার বিষয়েও পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যদের সঙ্গে বিরোধ বাধলো। পূর্ব পকিস্তানের মাতৃভাষা বাংলা, তাই পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের মাতৃভাষা বাংলা। অন্যপক্ষে, উর্দু পাকিস্তানের কোনও প্রদেশের মাতৃভাষা নয়। ১৯৫১ সালের আদম-সুমারি অনুসারে পাকিস্থানে শতকরা মাত্র চারজন উর্দু ভাষায় কথা বলে। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করে পাকিস্তানের শাসক-গোষ্ঠী পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের জাতীয় আন্দোলন দমন করতে, এবং পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম বাংলা থেকে সাংস্কৃতিক দিক্ থেকে

বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বিবাদ তীব্র হয়ে উঠলো। বাংলাভাষার দাবীতে পূর্ব পাকিস্তানে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিলো।

জিন্নার মৃত্যুর ছ বছর ও লিয়াকত আলির মৃত্যুর তিন বছর পরে ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মূলনীতি নির্ধারক কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি মাত্র ইউনিট করা হবে, না তাকে কতিপয় প্রশাসনিক বিভাগে ভাগ করা হবে, তা নিয়ে বিতর্ক বাধলো। শেষ পর্যন্ত বাঙ্গালী ও সিন্ধী সদস্যদের ভোটে এক ইউনিট প্রস্তাব বাতিল হলো। এখন স্থির হলো পশ্চিম পাকিস্তানকে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ, সিন্ধু, বাহাওলপুর, খৈরপুর ও বালুচিস্তান, এই ছয়টি প্রদেশে ভাগ করা হলো। এতে পাঞ্জাবী নেতারা বিপদ গণলেন। তাঁরা সমগ্র পাকিস্তানকে পাঞ্জাবী জমিদার ও বণিক গোষ্ঠীর উপনিবেশে পরিণত করবার যে চেষ্টা করছিলেন, তা বানচাল হতে চললো। মিঞা মহম্মদ মমতাজ খান্ দৌলতানা, মুস্তাক আমেদ গুরুমানি প্রভৃতি নেতারা এই ব্যবস্থাকে বিভেদপন্থী ও প্রাদেশিকতাবাদী ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করে পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি মাত্র ইউনিটে পরিণত করবার জন্যে দাবী জানাতে লাগলেন। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী চৌধুরী মহম্মদ আলিও এক ইউনিটের পক্ষে প্রচার চালালেন। তাঁরা এ বিষয়ে ডাঃ খান্ সাহেবের মতো লোককেও হাত করলেন। কিন্তু আবদুল গফর খান্ ও পূর্ববঙ্গের মওলানা ভাসানির মতো জনপ্রিয় নেতাদের কণ্ঠরোধ করা গেল না। তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযান শুরু করলেন। এই সংগ্রামে সংসদে এক-ইউনিটপন্থীদের সাফল্যের আশা নেই দেখে ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেল হঠাৎ ঘোষণা করলেন যে, পাকিস্তানের সাংবিধানিক যন্ত্র বিপর্যস্ত হয়েছে, সুতরাং সমগ্র পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা প্রবর্তিত হলো। মহম্মদ আলির নেতৃত্বে আটজন মন্ত্রী নিয়ে একটি নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হলো। এতে জেনারেল আয়ুব খান্ হলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। ডাঃ খান্ সাহেবও অন্যতম মন্ত্রীরূপে যোগ দিলেন।

২২শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলি একটি বেতার ভাষণে ঘোষণা করলেন যে, সমগ্র পশ্চিম পাকিস্থানকে একটি মাত্র ইউনিটে পরিণত করা হচ্ছে। সপ্তাহ কালের মধ্যে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও সিন্ধুর প্রাদেশিক আইনসভাগুলি এক-ইউনিট ব্যবস্থার সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করলো। মুস্তাক

আহ্‌মেদ গুরমানি এখন পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর হলেন। সুরাবর্দীকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আইন মন্ত্রী ক'রে নেওয়া হলো। ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের, গভর্নরদের ও মুখ্যমন্ত্রীদের একটি সম্মেলন হলো। তাতে স্থির হলো যে, পশ্চিম পাকিস্থানের শাসন এখন প্রদেশের মতোই হবে—একজন গভর্নর, একটি আইনসভা ও একটি মন্ত্রিসভা। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে মিঃ গুরমানি পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর হলেন এবং ডাঃ খান্ সাহেব হলেন পশ্চিম পাকিস্তানের মুখ্য মন্ত্রী।

২৫শে মার্চ তারিখে লাহোরে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে আবদুল গফর পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিটে পরিণত করবার তীব্র সমালোচনা করলেন। তিনি বললেন, "আমি বিশ্বাস করি, সাংস্কৃতিক ও ভাষাভিত্তিক অঞ্চলগুলির অস্তিত্ব ও উন্নতি কখনই জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী নয়। জাতীয় এই প্রশ্নটিতে জনসাধারণকে নিজ নিজ অভিমত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া একান্ত কর্তব্য। আমাদের প্রতিবেশী ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের শিক্ষা লাভ করা উচিত। সেখানে তেলেগুভাষী মানুষদের উচ্চাশা মেটাবার জন্যে মাদ্রাজকে বিভক্ত করতে হয়েছে।" তিনি বললেন, যদি মানুষের উপর এক-ইউনিট পরিকল্পনাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা প্রাদেশিকতা রোধ না করে বরং বৃদ্ধি করবে এবং শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকে দুর্বল করে দেবে। তিনি বললেন, যাতে এক-ইউনিট পরিকল্পনা জনসাধারণের মতামত না নিয়ে তাদের ওপর চাপিয়ে না দেওয়া হয়, সেজন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের অনেককেই বলেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কর্ণপাত করেন নি। সেই সঙ্গে তিনি একথাও ঘোষণা করলেন যে, যতোদিন এ বিষয়ে জনসাধারণের মতামত না নেওয়া হবে, ততোদিন তিনি এর বিরোধিতা করে যাবেন।

তিনি মার্চ মাসে রাওলপিণ্ডি থেকে একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন, সরকার এখনও তাঁর ওপর থেকে সীমান্তপ্রদেশে প্রবেশ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেননি। তিনি তো গত বৎসর জানুয়ারি মাসে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার সময় বলেছিলেন, তাঁর গতিবিধির ওপর এই ধরনের নিষেধাজ্ঞার চেয়ে তিনি জেলই বেশি পছন্দ করেন। তিনি বলেন, পনের মাস হলো তিনি মুক্তি পেয়েছেন, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তাঁর বা তাঁর দলের প্রতি সরকারের মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে বলে তিনি মনে করেন না। এখনও খুদাই খিদমতগার সংস্থা নিষিদ্ধ রয়েছে; এখনও তাঁকে পাঞ্জাবে অন্তরীণ রাখা হয়েছে। এমনকি

পাঞ্জবের গরীব-দুঃখী জনসাধারণের সঙ্গে তাঁকে মিশতে দেওয়া হয় না; এখনও তাঁর 'পাখতুন' কাগজকে প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয় নি।

সরকারের ইচ্ছা ছিল না আবদুল গফরকে মুক্তি দেওয়ার। কিন্তু ঘটনাচক্রে মুক্তি দিতে হলো। সীমান্তপ্রদেশে আবদুল কোয়াইয়ুম মন্ত্রিসভার পতন হয়েছিল এবং আবদুল রশিদ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি ১২ই জুলাই মুরিতে এক-ইউনিটের পক্ষে বক্তৃতাদান-কালে বললেন যে, এখন বেঙ্গল রেগুলেশন বা দেশরক্ষা অর্ডিন্যান্সে কেউ তাঁর প্রদেশে আটক নেই। সভায় একজন বাঙ্গালী এই উক্তির প্রতিবাদে আবদুল গফরের নাম উল্লেখ করলেন। তাতে আবদুল রশিদ বলে বসলেন, আবদুল গফরকে ক্রমাগত আটক রাখার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী; আবদুল গফর সীমান্তে ফিরে এলে আবদুল রশিদ তাঁকে স্বাগতই জানাবেন। এই উক্তি কেন্দ্রীয় সরকারকে খুবই বেকায়দায় ফেললো। ফলে পাকিস্তান সরকার আবদুল গফরের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন। তবে আবদুল রশিদের মন্ত্রিসভা-ও বেশিদিন রইল না।

এইভাবে ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে আবদুল গফর পুনরায় সীমান্তপ্রদেশে প্রবেশের সুযোগ পেলেন। আওয়ামী লীগ নেতা মাংকি শরিফের পীরসাহেব তাঁকে মোটর গাড়ির বিরাট মিছিল করে আটক ব্রীজ থেকে জাহাঙ্গীরাবাদ পর্যন্ত নিয়ে এলেন। পথিপার্শ্বে সমবেত অগণিত জনতা "বাদশা খান্ জিন্দাবাদ" ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করলো। স্থানে স্থানে তাঁকে মাল্যভূষিত করা হলো। ১৭ই জুলাই জাহাঙ্গীরাবাদে এক জনসভায় তিনি বললেন:

> তোমরা বিগত সাত বছরে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছ। একটা জাতির গঠনে এ রকম হয়। তোমরা যে এই দুর্দিনেও নিজেদের পতাকা উড্ডীন করে অগ্রসর হয়েছ, তাতে আমি আনন্দিত। তোমরা রাজনৈতিক দিক থেকে সজাগ মানুষ। তোমাদের অন্তর সুস্থ ও সবল। কিন্তু অসুবিধা এই যে, তোমরা যা লাভ করেছ, তাকে সংহত করতে পারনি। তোমরা ইংরেজদের বিতাড়িত করেছ, স্বাধীনতা লাভ করেছ। কিন্তু তোমাদের স্বার্থপরতার জন্য তোমাদের স্বাধীনতাকে দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করতে পার নি। এবং তার দ্বারা তোমরা তোমাদের দেশকে ক্ষুধা, আশঙ্কা, বস্ত্রাভাব ও অন্যান্য মূল প্রয়োজনগুলির অনটন প্রভৃতি নানা দুঃখ-দুর্দশার মুখে ঠেলে দিয়েছ। আমি তোমাদের বলেছিলাম, তোমরা নিজ নিজ গৃহকে গড়ে তোলো, সেবার মনোভাব অনুশীলন

করো, স্বার্থপরতা ত্যাগ করো, উপযুক্ত মানুষ হয়ে ওঠো। কিন্তু দুঃখের বিষয় তোমরা তাতে কর্ণপাত করো নি, দু পয়সার বিনিময়ে তোমরা নিজেদের বিবেককে বিক্রি করেছ।

পাকিস্তানী সরকার পশ্চিম পাকিস্তানে এক-ইউনিট প্রবর্তনে যতোই বদ্ধ-পরিকর হয়ে উঠলো, ততো তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও ঘনীভূত হয়ে উঠলো। এই প্রতিবাদ যাঁরা ধ্বনিত করলেন, তাঁদের পুরোভাগে রইলেন সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত আবদুল গফর।

আবদুল গফর নওশেরা ও পাব্বিতে জনসভায় ভাষণ দিলেন। তারপর গেলেন পেশোয়ার। পেশোয়ার থেকে গেলেন সরদরিয়াবে। এখানে তিনি তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ২০শে জুলাই ডাঃ খান্ সাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ডাঃ খান্ সাহেব আবদুল গফরকে এক ইউনিটের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান চালানো থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করলেন। কেবল তাই নয়, তিনি আবদুল গফরকে তাঁর স্বমতে আনতেও সচেষ্ট হলেন। কিন্তু আবদুল গফর তাতে স্বীকৃত হলেন না। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানালেন যে, পাঞ্জাবের জমিদার, শিল্পপতি ও ধনপতিদের স্বার্থেই এই ব্যবস্থা হচ্ছে; তারা সীমান্তপ্রদেশের বৈদ্যুতিক শক্তি, সিন্ধুর উর্বর ভূমি ও বালুচিস্থানের খনিজ সম্পদ্ নিজেদের স্বার্থে ব্যবস্থা করতে এবং ঐসব প্রদেশকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করতে চায়। তিনি এই ব্যবস্থায় কখনও সম্মত হতে পারেন না। আবদুল গফর বারবা গ্রামেও গেলেন। পাকিস্তানী ফৌজের মেসিনগানের গুলীতে নিহত খুদাই খিদমতগারদের জন্যে তিনি উপাসনা করলেন।

আবদুল গফর পশ্চিম পাকিস্তানকে এক-ইউনিটে পরিণত করবার প্রশ্নে জনমত জানবার উদ্দেশ্যে নির্বাচনের সম্মুখীন হওয়ার জন্যে আহ্বান জানালেন। জনসাধারণ যদি তা সমর্থন করে, তবে তিনি জনমতের রায় মাথা পেতে নেবেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এই এক-ইউনিট পরিকল্পনার ফলে পাঠানদের খুবই ক্ষতি হবে।

২৯শে জুলাই মাংকি শরিফে সীমান্ত আওয়ামী লীগ ও খুদাই খিদমতগারদের একটি মিলিত সম্মেলন হলো। এই সম্মেলন আবদুল গফর ও মাংকি শরিফের পীর সাহেবের উপর এক-ইউনিট প্রবর্তনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ভার দিলো। আবদুল গফর এক-ইউনিটের বিরুদ্ধে প্রচার-অভিযানে বেরুলেন। তিনি যেখানেই গেলেন, সেখানেই অভাবিত সমর্থন পেলেন। সরদরিয়াবে

তাঁর কর্মকেন্দ্রটিকে পুনর্গঠনের জন্যে মানুষ অকৃপণ হস্তে অর্থদান করলেন, অনেক মহিলা তাঁদের অলংকার পর্যন্ত দান করলেন। এক-ইউনিট পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আন্দোলনে কারাবরণের জন্যে বিশ হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবক এগিয়ে এলেন। পেশোয়ারের বাদশা খান্ সংবর্ধনা কমিটি তাঁকে যথাসম্ভব সত্বর পেশোয়ারে সফর করবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। এই আমন্ত্রণে বলা হলো, এই অনুরোধ রক্ষিত না হলে পেশোয়ারের আটশত গ্রামের সকল বয়স্ক অধিবাসীই মিছিল ক'রে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে সরদরিয়াবে যাবে।

আবদুল গফর ঝড়ের বেগে সমস্ত সীমান্ত প্রদেশ ঘুরে বেড়ালেন। সীমান্ত প্রদেশে এক-ইউনিটের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হয়ে উঠলো। এক-ইউনিট প্রবর্তনের ফলে পাখতুনরা যে কেবল তাদের প্রশাসনিক অধিকার হারাবে না, তাদের সংস্কৃতি, জাতীয়তা ও অর্থনীতিও ধ্বংস হবে, সে সম্পর্কে জনসাধারণের কোনও সংশয় রইলো না। ১৬ই সেপ্টেম্বর আবদুল গাফরের সীমান্ত সফর শেষ হলে তিনি পেশোয়ারে ঘোষণা করলেন যে, বালুচিস্থানের অবিসংবাদী জননেতা "পাখতুন সৌভ্রাত্রের" প্রতিষ্ঠাতা ও বালুচ গান্ধী নামে পরিচিত খান্ আবদুস সামাদ খান্ তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনি তাই এখন এক-ইউনিট পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য বালুচিস্থানে যাবেন।

ইতিমধ্যে বালুচিস্থানে তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে আদেশ জারী হয়েছিল। ১৭ই সেপ্টেম্বর তিনি দুইজন সহকর্মী সহ এই আদেশ অমান্য করে বালুচিস্থানে প্রবেশ করলে তাঁকে গ্রেফতার করা হলো। তাঁদের তিনজনকে মাচের সেণ্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে আটদিন আটক রেখে তাঁদের ২৬শে সেপ্টেম্বর ছেড়ে দেওয়া হলো।

এক-ইউনিট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আবদুল গফর অবিরামভাবে অভিযান চালালেন। তিনি পাঞ্জাবে, বাংলায় ও সীমান্তপ্রদেশে প্রচার-অভিযান করলেন। নভেম্বর মাসে একটি জনসভায় তিনি বললেন, "আমি নিজের জন্যে কিছুই চাই না। আমার সব কিছুই আছে। আমার দাদা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। পাখতুনদের কাছে দাদা পিতৃতুল্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তাঁর সঙ্গে ভিন্নমত হতে সাহস করেছি। কারণ, আমি এতে আমার দেশবাসীর ভয়ানক ক্ষতি হবে দেখছি।" পরে তিনি আরও বললেন, "ডাঃ খান্ সাহেব পাঞ্জাবীদের তোষণ করতে গিয়ে পাখতুনদের সর্বনাশ করছেন। যারা ক্ষমতার লোভে নিজ নিজ অভিসন্ধি সিদ্ধির জন্যে জনসাধারণকে সাধু বা অসাধু

আখ্যা দেয়, তাদের কখনও আমরা জাতির প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করতে পারি না।"

আবদুল গফর তাঁর প্রতিটি ভাষণে পাঞ্জাবী নেতাদের দুরভিসন্ধি জনসাধারণের কাছে তুলে ধরলেন। যেসব নেতা তাঁদের নিজ নিজ প্রদেশের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে সাময়িক ক্ষমতালাভের লোভে পাঞ্জাবী জমিদার, শিল্পপতি ও ধনপতিদের পায়ে আত্মবিক্রয় করছেন, তাঁদের স্বরূপও তিনি উদ্‌ঘাটন করে দেখালেন। তাঁর কার্যকলাপ শাসক-গোষ্ঠীর কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠলো। সুতরাং তারা আর স্থির থাকতে পারলো না। ১৯৫৬ সালেই ১৬ই জুলাই উটমনজাই থেকে আট মাইল দূরে শাহী বাগে তাঁকে গ্রেফতার করা হলো। এইভাবে আবদুল গফর মাত্র এগারো মাস সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবার পর আবার পাকিস্তানের কারান্তরালে গেলেন। কোয়েটায় খান্ আবদুস সামাদ খান্‌কেও গ্রেফতার করা হলো। পেশোয়ার জেলার এক-ইউনিট-বিরোধী নেতাদের সকলের গৃহ তল্লাস করা হলো। গ্রেফতার ক'রে আবদুল গফরকে পেশোয়ারে আনা হয়েছিল। তাঁকে হরিপুর জেলে আটক রাখা হলো।

পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টে ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬, আবদুল গফরের বিচার শুরু হলো। বিচারকক্ষ দর্শক-জনতায় পূর্ণ হলো। সরকার পক্ষের কৌঁসুলি আবদুল গফরের কিছু কিছু বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, আবদুল গফর তাঁর বক্তৃতায় বার বার বলেছেন যে, পাকিস্তানে পাঠানদের ওপর দুর্ব্যবহার করা হয়েছে, এর দ্বারা তিনি পাঠানদের রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য নাশের চেষ্টা করেছেন। কৌঁসুলি এমন পর্যন্ত অভিযোগ করলেন যে, আবদুল গফর পাঠানদের হিংসার আশ্রয় নিতেও প্ররোচিত করেছেন। তিনি পাখতুনিস্থানের দাবীতে এমনকি হত্যাও অন্যায় নয় বলেছেন। কৌঁসুলি অভিযোগ করলেন, আবদুল গফর তাঁর বক্তৃতাগুলিতে পাকিস্তানের জনগণের পরস্পরের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করে পাকিস্তানের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বকে বিঘ্নিত করেছেন।

আবদুল গফর এই অভিযোগের জবাবে আদালতে উর্দুতে ১৯ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি বিবৃতি দিলেন। তাতে তিনি তাঁর কর্মজীবন ও আদর্শের বিবরণ দিলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে তাঁদের সংগ্রামের কথা বললেন, তাঁর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতার কারণ কি ছিল তা ব্যাখ্যা করলেন, পাকিস্তানে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা কি ব্যবহার পেয়েছেন, তার বর্ণনা দিলেন এবং অবশেষে তিনি কেন এক-ইউনিট ব্যবস্থার বিরোধী, তা ব্যাখ্যা করে বোঝালেন। দীর্ঘ

কয়েক মাস ধরে বিচার চললো। অবশেষে ১৯৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারি বিচারপতি শাবির আহ্‌মেদ রায় দিলেন। তিনি আবদুল গফরকে আদালত ছুটি হওয়া পর্যন্ত কারাবাস ও চৌদ্দ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। আদেশ দিলেন, দণ্ডিত ব্যক্তি অর্থদণ্ড না দিলে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তা উসুল করা হবে।

আবদুল গফর এ যাত্রা মুক্তি পেলেন। তিনি এক-ইউনিট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান চালিয়ে যেতে লাগলেন। ইতিমধ্যে পাকিস্থানের ছটি বিরোধী দল নিয়ে পাকিস্থান ন্যাশন্যাল পার্টি গঠিত হয়েছিল। ১৯৫৭ সালের ২৭শে জানুয়ারি তিনি ঐ পার্টিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, দেশে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্যে অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন। তিনি অবিলম্বে নির্বাচনের দাবীতে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার সংকল্পও জানালেন। তিনি জনসাধারণকে প্রশ্ন করলেন, "যখন পশ্চিম পাকিস্তানকে এক করা হয়েছিল, তখন কি তোমাদর মতামত নেওয়া হয়েছিল ? হয় নি। জনসাধারণ যাতে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পায় এবং প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে যাতে জনমত গৃহীত হয়, সেজন্যে আমি সরকারকে বাধ্য করব। জনসাধারণকে দেশের প্রশাসনে অংশ গ্রহণের ন্যায্য সুযোগ দিলেই পাকিস্তানের রাজনীতি দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হবে।"

আবদুল গফরের এই শক্তিশালী অভিযান জনসাধারণকে উচ্চকিত জাগ্রত করে দিল। আবদুল গফর সমগ্র পাকিস্তানে ঘুরে বেড়ালেন। জনসাধারণ ন্যাশন্যাল পার্টির আহ্বানে বহু জনসভা, বিক্ষোভ প্রদর্শন, এমন কি হরতাল পর্যন্ত করলো। এই প্রচণ্ড অভিযানের ধাক্কা সামলাবার চেষ্টায় ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের সদস্যরা পশ্চিম পাকিস্তানের আইনসভায় বিপুল ভোটাধিক্যে পশ্চিম পাকিস্তানকে চার বা ততোধিক অংশে বিভক্ত করবার সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করলো।

প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জা এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে একটি বিবৃতি দিলেন। তাতে তিনি বললেন যে, তিনি প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দীর সঙ্গে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বর্তমান মুহূর্তে এক-ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল করা যাবে না এবং ১৯৫৮ সালে যে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা আছে, তা এই এক-ইউনিট ব্যবস্থা অনুসারেই হবে। প্রেসিডেণ্টের আদেশ অনুসারে পশ্চিম পাকিস্তান আইনসভা বন্ধ রইলো এবং পশ্চিম পাকিস্তানে প্রেসিডেণ্টের শাসন

চালু হলো। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রশাসনের দায়িত্ব নিলেন গভর্নর গুরমানি। কিছুদিন পূর্বেই ডাঃ খানসাহেবকে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছিল।

১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে ঢাকায় আবদুল গফর, মওলানা ভাসানি, জি. এম. সৈয়দ ও মিঞা ইফতিকারউদ্দিন জাতীয় আওয়ামী পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ এই পার্টি অল্পদিনের মধ্যেই সারা পাকিস্তানে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী হয়ে উঠলো। পাকিস্তানে মুসলিম লীগের আসন টলে গেল। ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে স্বরাবর্দী সরকারের পতন ঘটলো। মুসলিম লীগ রিপাবলিকান পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন করে পাকিস্তানে চুন্দ্রিগরের নেতৃত্বে একটি সরকার গঠন করলো। এই সরকার একমাসও স্থায়ী হলো না। এর পরে স্যার ফিরোজ খান্ নুন একটি সরকার গঠন করলেন। ১৯৫৮ সালের মে মাসে রিপাবলিকান পার্টির নেতা ডাঃ খান্ সাহেব আততায়ীর হস্তে নিহত হলেন। ফিরোজ খান্ নুন যে সরকার গঠন করেছিলেন, তা-ও একবছর মাত্র স্থায়ী হলো। পাকিস্তান এখন স্বার্থান্বেষী মুসলিম নেতাদের চক্রান্তের লীলাভূমি হয়ে উঠলো।

দাদার মৃত্যুর পরে আবদুল গফর ১৯শে মে লাহোরে যে জনসভায় প্রথম ভাষণ দিলেন, তাতে তিনি বললেন, যেসব লোকের জন্যে ডাঃ খান সাহেব তাঁর স্বজাতি, তাঁর পার্টি, তাঁর আদর্শ ও আত্মমর্যাদা, তাঁর গৌরবময় রাজনৈতিক জীবন, সবকিছুকে বিসর্জন দিয়েছিলেন, তারাই তাঁকে হত্যা করলো। তারা যে কিভাবে তাঁকে হত্যা করতে পারে, তা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। পুলিস ও সরকার এ বিষয়ে কি তদন্ত করে, তা তিনি ধৈর্য ধরে লক্ষ্য করবেন। তিনি বললেন, ডাঃ খান্ সাহেবের এই হত্যাকাণ্ড পাঠান ও পাঞ্জাবীদের মধ্যে সম্পর্ককে আরও তিক্ত করে তুলেছে। তিনি পাকিস্তানের সকল মানুষকে এই মনোভাব দূর করতে সচেষ্ট হতে আহ্বান জানালেন। বললেন, যদি এই মনোভাব চলতে থাকে, তবে পাঠান ও পাঞ্জাবীর মধ্যে এক রাস্তা দিয়ে হাঁটাও অসম্ভব হয়ে উঠবে।

১৯৫৮ সালে আবদুল গফর পাখ্‌তু ভাষায় একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে এক-ইউনিট ব্যবস্থার পেছনে যে শয়তানী চক্রান্ত রয়েছে, তা উদ্‌ঘাটন করে দেখালেন :

…প্রথমে কিছু লোক ভেবেছিল, পাকিস্তানী শাসকদের আক্রমণের

লক্ষ্য কেবল খুদাই খিদমতগার সংস্থা। কিন্তু শীঘ্রই তারা বুঝতে পারলো, সমস্ত পাখতুন সম্প্রদায়কে হীনতা স্বীকার করানোই পাকিস্তানী শাসকদের উদ্দেশ্য। যখন শাসকরা পাখতুনদের মনোবলকে ভাঙতে পারলো না, তখন তারা জাদুকরের মতো তাদের তূণ থেকে এই এক-ইউনিট পরিকল্পনাটি বের করলো। গোড়ায় তারা এই এক-ইউনিট-পরিকল্পনাকে সংসদীয় অনুমোদন দিতে চেষ্টা করেছিল এবং জিরগা ও অন্যান্যদের মারফত এ বিষয়ে আমার সাহায্যও চেয়েছিল। যখন এক-ইউনিট বিলটি সংসদে পাস করানো সম্ভব হলো না, তখন তারা আঞ্চলিক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে চাইলো। আবার তারা যখন হেরে গেল, তখন গভর্নর-জেনারেল গোলাম মহম্মদ সংসদ ভেঙে দিলেন এবং আট বছর ধরে বহুকষ্টে যে সংবিধানের খসড়া রচিত হয়েছিল, তা বাতিল করলেন। আশ্চর্য জিনিস হলো এই যে, পাকিস্তানে যখন কোনও সংবিধান ছিল না, তখন সংসদ ছিল, আর যখন সংবিধানের খসড়া তৈরি হলো তখনই সংসদ ভেঙে দেওয়া হলো। এখন শাসকদের মর্জিমতো যে নূতন সংবিধান রচিত হয়েছে, তা প্রথমেই এক-ইউনিটকে অনুমোদন দিয়েছে। সংসদের যা প্রধান কাজ, সংবিধান রচনা, তা সরিয়ে রাখা হয়েছে।

এত সবের উদ্দেশ্য কি, তা "এক-ইউনিট পরিকল্পনা" নামে গোপন দলিলটি পড়লেই বোঝা যায়। এই দলিলটির প্রণেতা হলেন গভর্নর-জেনারেল গোলাম মহম্মদ, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলি, মমতাজ দৌলতানা, গুরমানি ও অন্যান্য বিশিষ্ট পাঞ্জাবীরা। এই গোপন দলিলটির কিছু কিছু অংশ আমি পাখতুনদের হিতার্থে এখানে তুলে দিচ্ছি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সর্দার আবদুল রশিদ খান্ এটি সংসদে তুলেছিলেন এবং এই ভয়ানক চক্রান্ত সম্পর্কে পাখতুন সম্প্রদায়কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সেজন্য তাঁর কাছে আমরা ঋণী। মুসলিম লীগপন্থীরা প্রায়ই ঐক্য ও অখণ্ডতার কথা বলে থাকে। কিন্তু গোপন দলিল থেকে এই উদ্ধৃতিগুলি দিলে দেখা যাবে, তাতে তারা কতোখানি বিশ্বাস করে।

'কেন এক-ইউনিট' শীর্ষক অংশে, গোপন দলিলটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে : 'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যোগাযোগ রাখার

ক্ষেত্রে ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক অসুবিধা প্রচুর। পাকিস্তান পূর্ব ও পশ্চিম খণ্ডে বিরাট ব্যবধানে বিভক্ত থাকায় দুর্লঙ্ঘ্য অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে হাজার মাইল ব্যবধান রয়েছে, হিন্দুরা। তাছাড়া, ঐ দুই অংশ বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। পূর্ব অংশের অধিবাসীর সংখ্যা বেশি, কিন্তু আয়ের উৎস কম। দুই অংশের জন্যে চাই দুই ধরনের শাসনব্যবস্থা। এই দুরূহ সমস্যাগুলি বক্তৃতার দ্বারা সমাধান করা যাবে না। অসুবিধাগুলি মৌলিক ও বাস্তবিক। এই অবস্থায় দুই অংশ পরস্পরকে সন্দেহ করবে এবং কিছুই করা সম্ভব হবে না।'

তাদের যুক্তি অনুসারে, যদি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে একত্র করা না যায়, তবে আমি জানতে চাই, পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ-গুলিকে যেখানে লোক বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, তাদের একত্র করায় অসুবিধা আছে, না নেই।

গোপন দলিলের ৪ ও ৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'পাখতুনদের বৈদ্যুতিক শক্তি আছে, বালুচিস্থানের খনিজ সম্পদ্ আছে, সিন্ধুর আছে বিশাল কৃষিভূমি। এটা প্রয়োজন যে, পাঞ্জাব সীমান্ত প্রদেশের বৈদ্যুতিক শক্তির সুযোগ নেবে। বালুচিস্থান ও উপজাতীয় এলাকার খনিজ সম্পদের ব্যবহার সাধারণের জীবনে সমতা আনবে। উপজাতীয়দের সিন্ধুর ও বাহাওলপুরের কৃষিভূমিতে বসানো যাবে, এবং ইতিমধ্যে তা করাও হচ্ছে। অবশ্য, এতে অসুবিধাও আছে, তা করতে যথেষ্ট সময় লাগবে। সুসংগঠিতভাবে এটা করা দরকার। যদি প্রদেশগুলিকে তুলে দেওয়া না হয়, তবে তা করা সম্ভব নয়।...'

এই উদ্ধৃতি থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, পরিকল্পনাটি সীমান্তপ্রদেশের বৈদ্যুতিক শক্তি, বালুচিস্থানের খনিজ সম্পদ্ ও সিন্ধুর ভূমি ব্যবহারের জন্যেই করা হয়েছে।

৭ম পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে: 'বর্তমান অবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতা রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, যাতে বাংলার প্রাধান্যমূলক অংশ রয়েছে। অন্যপক্ষে, আমাদের সামান্য অংশই আছে। একটি ইউনিট হলে ক্ষমতা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত হবে। এই ভাবেই পশ্চিম পাকিস্তান সর্বপ্রথম প্রচুর কর্তৃত্ব পাবে। বর্তমানে, বাংলাদেশ

কেন্দ্রকে যা দেয়, তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা নিচ্ছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানে এক-ইউনিট হলে বাংলার জন্যে ব্যয়ের ভার অনেক পরিমাণে হালকা হয়ে যাবে।'

৯ পৃষ্ঠায় 'কিভাবে এক-ইউনিট গঠিত হবে' শীর্ষক অংশে বলা হয়েছে : 'প্রথমে আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের জন্য চেষ্টা করব, এবং সেজন্য আমরা সকল বিরোধিতার উচ্ছেদ ঘটাবো, তাতে আমাদের পথের সব অন্তরায় অপসারিত হবে। আমরা এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করব, যাতে লোকে কেবল আমাদের কথাই শুনবে, এবং তা সম্ভব হবে যদি আমরা আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা নির্মমভাবে ব্যবহার করি। এবং আমরা যদি আমাদের বিরোধীদের স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ না করি, এবং বিরোধীদের স্তব্ধ করে দিয়েই যদি আমরা আমাদের রাজনৈতিক অবস্থাকে শক্তিশালী করে না তুলি, তবে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের কাজ শুরু করা বিপজ্জনক হবে। কোন দ্বিধা বা শূন্যগর্ভ ভীতিপ্রদর্শন প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের পথে অন্তরায় হবে।...

১৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে : এক-ইউনিটে পাঞ্জাবের জনসংখ্যা হবে শতকরা ৫২ ও অবশিষ্ট অংশের শতকরা ৪৮।

এইভাবে ভূরি ভূরি উদ্ধৃতি দিয়ে আবদুল গফর তাঁর পুস্তিকায় পাঞ্জাবী নেতাদের এই চক্রান্তের কথা পাখতুনদের কাছে প্রকাশ করলেন। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও নিষ্কলঙ্ক সততা চক্রান্তকারীদের আরও ভীত করে তুললো। তাঁকে এইভাবে প্রচার করবার সুযোগ দিলে এক-ইউনিট ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে, এবং পাকিস্থানের জনসাধারণ এইসব স্বার্থান্বেষী ক্ষমতালিপ্সু নেতাদের বিতাড়িত করবে, তাতে কোনও সংশয় ছিল না। তাই পাকিস্তান সরকার তাঁর বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করলো। ১৯৫৮ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর কোয়েটায় তাঁকে বালুচিস্থানে প্রবেশ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হলো। পরদিন তাঁকে পশ্চিম পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী পেশোয়ারে এনে ছেড়ে দেওয়ার হুকুম দিলেন।

১৯৫৮ সালের অক্টোরর মাসে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল আয়ুব খান্ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা অধিকার করলেন। সারা পাকিস্তানে সামরিক আইন জারী

হলো। অক্টোবর মাসেই চরসদ্দার কাছে একটি গ্রামে তাঁর পুত্র গনির বাসভবনে আবদুল গফর গ্রেফতার হলেন। পূর্বপাকিস্থানের মওলানা ভাসানি সহ আটজন বিশিষ্ট নেতাও গ্রেফতার হলেন। আবদুল গফর ও ওঁদের সকলকে পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনেই গ্রেফতার করা হলো। বালুচ গান্ধী খান্ আবদুস সামাদ খান্‌ও গ্রেফতার হলেন। তাঁকে চৌদ্দ বছরের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

২৭শে অক্টোবর আজব কাণ্ড ঘটলো। সকালে জেনারেল আয়ুব খান্ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিরূপে প্রেসিডেণ্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার কাছে আনুগত্যের শপথ নিলেন। সন্ধ্যায় প্রেসিডেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রী একত্র টেলিভিসনে দর্শন দিলেন, হাসিঠাট্টা করলেন। কিন্তু দুঘণ্টা বাদেই জেনারেল আয়ুব খান্ প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জাকে পিস্তল উঁচিয়ে পদত্যাগ করতে বললেন। ইস্কান্দার মির্জাকে সস্ত্রীক কোয়েটায় একটি বাংলোতে অন্তরীণ করে রাখা হলো। জেনারেল আয়ুব খান্ পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট হলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ তুলে দিলেন। তিনি নিজেকে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীরও সর্বাধিনায়ক বলে ঘোষণা করলেন। এইভাবে আয়ুব খান্ পাকিস্তানের একাধিনায়ক হয়ে উঠলেন। পাকিস্তানে প্রকৃত গণতন্ত্র বলে কিছুই কখনো ছিল না। যেটুকু বাইরের মুখোস ছিল, আয়ুব খান্ সঙ্গিনের গুঁতোয় তা-ও ছিঁড়ে ফেলে দিলেন।

১৯৫৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল আবদুল গফরকে আটক অবস্থা থেকে "পাকিস্তানের কোনও স্থানে" মুক্ত করে দেওয়া হলো। তাঁকে মুক্তি দেওয়ার কারণ হিসাবে বলা হলো তাঁর বয়স ও ভগ্নস্বাস্থ্য ; তাছাড়া, এ-ও বলা হলো যে, সরকার বিশ্বাস করেন যে, তিনি আর পাকিস্তানের দৃঢ়তা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, এমন কাজে লিপ্ত থাকবেন না।

আবদুল গফর রাজদ্রোহের অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। তাঁকে প্রথমে হরিপুর জেলে আটক রাখা হয়েছিল। তিনি তাঁর দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করলে তাঁকে কড়া পুলিস পাহারায় লাহোরে আনা হয়েছিল। হাইকোর্টে তাঁহার আপীল অগ্রাহ্য করে দণ্ডাদেশ বহাল রাখা হয়েছিল।

আবদুল গফর কারামুক্ত হয়ে উটমনজাইয়ে তাঁর স্বগৃহে ফিরে এলেন।

ইতিমধ্যে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান্ পাবলিক অফিসেস্ ডিস্‌কোঅলিফিকেশন অর্ডার ও ইলেক্‌টিভ বডিজ ডিস্‌কোঅলিফিকেশন্ অর্ডার পাস করে বিশিষ্ট

রাজনৈতিক নেতারা যাতে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারেন, তার ব্যবস্থা করেছিলেন। অধিকাংশ বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ছিলেন প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ। তাঁদের অনেকেই ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত হয় মারা যাবেন, নয় রাজনীতি থেকে অবসর নেবেন, এইরকম আশা করা হয়েছিল।

'অবাঞ্ছিত' রাজনৈতিক নেতাদের এই দুই আদেশ বলে রাজনীতি থেকে বিতাড়িত করবার জন্তে একটি ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয়েছিল। ট্রাইব্যুন্যালটি এখন আবদুল গফরের উপরও নোটিশ জারী করলো। যেহেতু বিভিন্ন সময়ে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে কারারুদ্ধ হয়েছেন, তাঁর উপর ঐ আদেশ কেন প্রযোজ্য হবে না, তার কারণ দর্শাতে বলা হলো। আবদুল গফর এই নোটিশের কোনও জবাব দিলেন না। ফলে তাঁকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত কোনও নির্বাচন-মূলক সংস্থার সদস্য হওয়ার পক্ষে অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হলো।

আবদুল গফর কিন্তু তাতে দমলেন না। তিনি সীমান্ত প্রদেশে সফর শুরু করলেন এবং সরকার আরোপিত কঠোর বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে নগরে গ্রামে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। জেনারেল আয়ুব খান্ ছিলেন পাঠান। গোড়ার দিকে পাকিস্তানে এই পাঠানের একনায়কত্ব পাখতুনের মধ্যে কিছুটা মোহ সৃষ্টি করাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু শীঘ্রই মোহভঙ্গ ঘটলো। সত্তর বছরের বৃদ্ধ আবদুল গফরের প্রতি সরকারও গোড়ার দিকে কিছুটা ঔদাসীন্য ও ক্ষমার ভাব দেখালেও ক্রমেই তা কঠোর হয়ে উঠলো। আবদুল গফর দু বছর বাইরে থাকার পর ১৯৬২ সালের ১২ই এপ্রিল ডেরা ইসমাইল খাঁতে গ্রেফতার হলেন। তখন তাঁর বয়স বাহাত্তর। তাঁকে গ্রেফার করা হলো গণশৃঙ্খলা রক্ষা অর্ডিন্যান্সে। সেই পুরাতন অভিযোগ। তিনি রাষ্ট্রদ্রোহমূলক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত আছেন, তিনি সরকারের প্রতি অনানুগত্যের ভাব সৃষ্টি করছেন, তিনি জন মানসে নৈরাশ্য ও শঙ্কা ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পরস্পর ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব জাগাচ্ছেন। প্রথমে তাঁকে পানিআলা জেলে রাখা হয়েছিল। পরে তাঁকে সিন্ধুর হায়দরাবাদ জেলে স্থানান্তরিত করা হলো।

তাঁর গ্রেফতারের পরেই তাঁর কয়েক শত সহকর্মীকেও গ্রেকতার করা হলো। রাওলপিণ্ডিতে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে আয়ুব খান্ বললেন যে, আবদুল গফর খান্ সীমান্ত প্রদেশকে ভারতীয় অঞ্চলে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তাতে ব্যর্থ হয়ে তিনি পাকিস্তানে একটি পৃথক রাজ্য চাইলেন, যেখানে তিনিই হবেন রাজা। পরে তিনি এই সীমান্ত অঞ্চলকে আফগানিস্থানের

অংশে পরিণত করতে চাইছেন। এঁদের মতো লোক, যাঁদের দাবী যুক্তিহীন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে।

বৃদ্ধ ও ভগ্নস্বাস্থ্য আবদুল গফরকে মুক্তিদানের জন্যে চারদিক থেকে দাবী উঠতে লাগলো। 'এম্‌নেস্টি ইন্‌টারন্যাশন্যাল' বা আন্তর্জাতিক মার্জনা সংস্থা আবদুল গফরকে ১৯৬২ সালে "ঐ বৎসরের বন্দী" ঘোষণা করে তাঁর মুক্তিদানের জন্যে আবেদন করলেন। কিন্তু আয়ুব খান্ তাতে কর্ণপাত করলেন না। আবদুল গফর জেলে পচতে লাগলেন। তাঁর সহকর্মী, কর্মী ও অনুরাগীদের উপরও সরকারের নির্মম খড়্গ বার বার নেমে এলো। ১৯৬৩ সালের মে মাসে তাঁর পুত্র ওয়ালি জানালেন যে, তাঁর পিতার প্রায় তিনহাজার অনুরাগী ও অনুচর পাকিস্তানের জেলে আটক রয়েছে এবং সরকার তাঁদের প্রায় বিয়াল্লিশ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে।

১৯৬২ সালে লাহোর জেলে আবদুল গফরের অসুস্থ থাকবার কথা পাকিস্থান জাতীয় পরিষদে উত্থাপিত হলো। স্পীকার এ সম্পর্কে আলোচনার দাবী অগ্রাহ্য করলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একটি মেডিক্যাল রিপোর্ট পড়ে শোনালেন। তাতে বলা হয়েছে, আবদুল গফর সুস্থ আছেন, তিনি নিয়মিত আহার করছেন। তবে তাঁর পায়ে বহুদিনের পুরাতন একটি ব্যাধি আছে। সে বিষয়ে তাঁর উপযুক্ত চিকিৎসা চলছে। পক্ষকাল পরে সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হলো যে, কিছুদিন যাবৎ আবদুল গফর সংকটজনক রোগে ভুগছিলেন, এখন তাঁকে তাঁর অনুরোধমতো তাঁর নির্বাচিত একজন চিকিৎসক সহ মুলতান জেলে পাঠানো হচ্ছে। তিনি তাঁর নির্বাচিত চিকিৎসক ছাড়া অন্য কারও চিকিৎসাধীন থাকতে নারাজ এবং এজন্য তিনদিন অনশনও করেছিলেন, তাও সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হলো।

১৯৬৩ সালের মে মাসে ওয়ালি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে এই অভিযোগ করলেন যে, তাঁর পিতাকে লাহোর জেলে একটি নির্জন কক্ষে রাখা হয়েছে; তাঁকে নিজের খাবার নিজেকে রান্না করে খেতে হয়। কিছুদিন থেকে তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটছে। তাতেও সরকার কর্ণপাত করলো না। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে আবদুল গফরের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেল। তাঁর জীবন-সংশয়ও দেখা দিল। জেলে আবদুল গফরের মৃত্যু হলে পাকিস্তান সরকারের দুর্নাম হবে ভেবে পাকিস্তান সরকার ৩০শে জানুয়ারি হরিপুর জেল থেকে তাঁকে মুক্তি দিলো। তবে তাঁকে স্বগৃহে অন্তরীণ করে রাখলো।

তাঁকে এমন কি তাঁর স্বগ্রামের লোকদের সঙ্গেও দেখা করতে দেওয়া হলো না। তাঁর কোনপ্রকার প্রকাশ্য বিবৃতি দেওয়াও নিষিদ্ধ রইলো। ১৯৬৪ সালের ২৭শে মে জওহরলাল নেহ্‌রুর মৃত্যু হলো। আবদুল গফর ইন্দিরা গান্ধীকে তাঁর পিতার মৃত্যুতে সান্ত্বনা দিয়ে একটি শোকবার্তা পাঠালেন।

৭৪ বৎসরের বৃদ্ধ খান্ আবদুল গফর খান্ তাঁর গ্রামে স্বগৃহে কাটাতে লাগলেন। ক্রমাগত তিনি রোগে ভুগছিলেন। ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সরকার তাঁকে চিকিৎসার জন্যে ইংলণ্ডে যেতে অনুমতি দিলো।

আবদুল গফরের ইংলণ্ড যাওয়ার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা করা হলো। আবদুল গফর পাকিস্তানের বিশাল কারাগার থেকে বাইরে এসে যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এখানে তাঁর পূর্বকালের বৈরী সীমান্ত প্রদেশের প্রাক্তন গভর্নর স্যার ওলাফ ক্যারো তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। স্যার ওলাফ ভারতের এই বীর সন্তানের প্রতি অনেক কঠোর ও হৃদয়হীন ব্যবহার করলেও মনেপ্রাণে যে তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, তা আবদুল গফরের প্রতি সৌজন্যে ও আবদুল গফরের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগে প্রকাশ পেলো। তিনি আবদুল গফরকে পূর্ণ বিশ্রামের জন্যে স্বগৃহে নিয়ে গেলেন। আবদুল গফর বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হলেন।

লণ্ডনে এই সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি বন্ধুকন্যাকে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরেন। অতীতের সংগ্রামের কতো স্মৃতিই না তাঁর মনে পড়ে। ভারতীয় সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি কোনও যোগাযোগ রাখতেন না। তাঁদের স্মৃতি আবার তাঁর মনে জেগে ওঠে, জেগে ওঠে যৌবনের সেই দিনগুলি। তিনি গান্ধীজীর প্রাক্তন সেক্রেটারি ও তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু পিয়ারেলালকে একটি পত্র লেখেন: "হয়তো আপনারা আমাদের ভুলে গেছেন, কিন্তু আমরা আপনাদের ভুলিনি। সুখের দিনে মানুষ তার বন্ধুদের ভুলে যায়, কিন্তু যারা দুঃখে দিন কাটায় তারা ভোলে না। আমাদের দুঃখের দিনে আপনাদের কথা ভাবি। যদি মহাত্মাজী আজ জীবিত থাকতেন, তিনি নিশ্চয় আমাদের কথা ভাবতেন এবং আমাদের সাহায্যে আসতেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, তিনি আজ নেই। আর অন্যরা সবাই আমাদের ভুলে গেছে।"

তিনি এই পত্রে আরও জানালেন যে, ইংলণ্ডে এসে তিনি কিছুটা ভালো আছেন। তবে এখানে শীত পড়ছে। ডাক্তার তাঁকে শীতের সময় অন্য কোথাও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে যেতে বলেছেন। তিনি আমেরিকা যেতে চান। সেজন্যে হাই কমিশনারের কাছে পাসপোর্টের জন্যে আবেদনও করেছেন।

কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাঁর আমেরিকা যাওয়া পছন্দ করলো না। আমেরিকাও এ বিষয়ে উৎসাহ দেখালো না। পাকিস্তান তাঁকে বেইরুট, কাইরো, তেহেরান বা ভারত ও আফগানিস্থান ছাড়া অন্য কোথাও যেতে পরামর্শ দিলো। কিন্তু আবদুল গফর শেষ পর্যন্ত আফগানিস্থানে যাওয়াই স্থির করলেন। আফগান সরকারও তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলো।

আবদুল গফর ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কাবুলে এসে পৌছলেন। আফগানিস্থান তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অভ্যর্থনা জানালো। তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্যে আফগানিস্থানের প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। আর উপস্থিত ছিলেন হাজার হাজার নরনারী বালক বৃদ্ধ। তিনি যখন বিমান থেকে নেমে আফগানিস্থানের মাটিতে পা দিলেন, তখন হাজার হাজার কণ্ঠে 'ফখ্‌র্‌-এ-আফগান জিন্দাবাদ', 'পাখতুনিস্থান জিন্দাবাদ' ধ্বনিত হলো।

আবদুল গফর চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্যেই আফগানিস্থানে এসেছিলেন। কিন্তু আফগানিস্থানই তাঁর কর্মকেন্দ্র হলো। তিনি এখান থেকেই তাঁর সাধের পাখতুনিস্থানের জন্যে আমৃত্যু সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন স্থির করলেন। এইভাবে আবদুল গফর স্বেচ্ছায় আফগানিস্থানে নির্বাসিত করলেন আপনাকে। আফগানিস্থানও তাঁকে স্নেহ, শ্রদ্ধা ও আতিথেয়তার বন্ধনে বাঁধলো। আফগানিস্থানের বর্তমান রাজার পিতা নাদির শাহ্‌কে সিংহাসন অধিকারে আবদুল গফর ও ভারতীয় পাখতুনরা কম সাহায্য করেন নি। সে ঋণ রাজা ভোলেন নি। আফগানিস্থানের মুক্ত আকাশ পাকিস্তানের বিশাল কারাগারের তুলনায় স্বর্গ মনে হলো।

আফগানিস্থান আবদুল গফরের সুচিকিৎসা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করলো। আফগানিস্থানে পৌছবার পর থেকেই পাকিস্তানী সরকার তাঁকে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেশে ফিরিয়ে আনতে চাইলো। কিন্তু আবদুল গফর এই প্রলোভনের ফাঁদে পা দিলেন না। তিনি আফগানিস্থানে থেকেই তাঁর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সংকল্প করলেন। ১৯৬৫ সালের ৩১শে আগস্ট কাবুলের পাখতুনিস্থান স্কোয়ারে পাখতুনিস্থান দিবস উদ্‌যাপিত হলো। কাবুলের মেয়র মহম্মদ আশগর এই অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করে বললেন, "প্রতি বৎসর আফগান সরকার পাখতুনিস্থান দিবস উদ্‌যাপন করেন এবং পাখতুন ভাইয়েরা যতোদিন না তাদের স্বাধীনতা লাভ করে, ততোদিন তাদের সাহায্য করে যাবেন। এই অনুষ্ঠানে

আফগান সরকারের সকল মন্ত্রী ও আবদুল গফর উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার পর মেয়র পাখতুনিস্থানের পতাকা উড্ডীন করলেন। তারপর সকলে গাজী স্টেডিয়ামে গেলেন। সেখানে এখন আফগানিস্থানের রাজা আবদুল গফরকে সমবেত সকলের কাছে এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা এবং সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শত্রু বলে পরিচিত করলেন। এখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের এক সভায় আবদুল গফর ভাষণ দিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে আফগানিস্থান সরকার পাখতুনদের সংগ্রামে যে সমর্থন ও সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন, সেজন্য তিনি রাজা, অমাত্যবর্গ ও আফগানিস্থানের জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানালেন। তিনি পাখতুনদের প্রতি আবেগপূর্ণ একটি আবেদনে বললেন, পাখতুনরা যদি নিজেদের বিবাদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে পাকিস্তান তাদের অধিকার তাদের দিতে বাধ্য হবে। পাকিস্তান প্রচার করছে যে, পাকিস্তান একটি ইসলামিক রাষ্ট্র এবং তার প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান্ একজন পাঠান। তবে মুসলিম পাঠানদের ক্ষোভের কারণ কি? কিন্তু ইসলাম সাম্যের ও সমান অধিকারের উপর গুরুত্ব দেয়। পাখতুনরা কেবল তাদের স্বগৃহ নির্মাণ করিতে চায়।

আবদুল গফর ১৯৬৪ সাল থেকেই আফগানিস্থানে আছেন। তিনি আফগানিস্থানের সম্মানিত রাষ্ট্রীয় অতিথি। কিন্তু তাঁর হৃদয় রয়েছে পাকিস্তানে যেখানে অহরহ অগণিত মানুষ স্বৈরশাসনের পদতলে পিষ্ট হচ্ছে, যেখানে মানুষ দুঃখ দৈন্য ও রোগ-শোকে দিন কাটাচ্ছে। আজও তাই তিনি সংগ্রাম করে চলেছেন, তাঁর চোখে আজও পাখতুনিস্থানের, পাখতুনদের ন্যায্য অধিকারলাভের, স্বপ্ন উজ্জ্বল হয়ে আছে। সীমান্ত প্রদেশের মানুষরা আজও ধ্রুবতারার মতো তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি কার্যত নির্বাসিত হলেও আজও তিনি তাদের মুকুটহীন সম্রাট, তাদের বাদশা খান্, তাদের বাদশা।